কখনো কোনো মানুষ

জয়কান্তন



কখনো কোনো মানুষ

আদান-প্রদান

কখনো কোনো মানুষ

জয়কান্তন

অনুবাদ

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

Original Title : Sila Nerangalil Manithargal *(Tamil)*
Bengali Translation : Kakhono Kono Manush

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত।

1

বাইরে তখন বৃষ্টি। বাসটা যখনই মোড় ফেরে, লোকগুলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে একে অন্যের গায়ে। আমার গা ঘেঁষে যে লোকটি দাঁড়িয়ে, সে ইচ্ছে করেই বেশ চাপ দিয়ে হেলে পড়ে আমার ওপর। বেশ বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত। কিন্তু কি আর করা? মেয়ে হয়ে জন্মেছি, পুরুষের সমান হয়ে লেখাপড়া ও চাকরি-বাকরির জন্য বাইরে বেরোতে গেলে এ সমস্ত সহ্য করতেই হবে। মেয়েদের জন্য মাত্র চারটি সিট। কবে কোন্ যুগে দু'একটি মেয়ে যখন বাইরে বেরুতো, তখনকার হিসেবমতো চারটি সিটই তো যথেষ্ট। আজকাল 'কেবল মহিলাদের জন্য' বাসের ব্যবস্থা করা একান্তই দরকার। আহা, ছোটো ছোটো মেয়েরা এই বদমাস বেটাছেলেগুলির সঙ্গে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করে পয়সা দিয়ে কী দুর্গতিই না ভোগ করছে! কেন এই দুর্গতি? আলাদা সিটের ব্যবস্থায় মেয়েদের যদি অপমান না হয়ে থাকে, আলাদা বাসের ব্যবস্থা করলেই কি হবে? ভেরি গুড আইডিয়া··· আই অ্যাম গোইং টু রাইট এ লেটার টু দ্য লেটার্স টু দ্য এডিটর।

বাইরে বেশ বৃষ্টি। জানালায় ঝোলানো ক্যান্‌ভাসের ওপর পটপট্ করে বৃষ্টির জলের আঘাত। বাসের ভেতরটা জলে ও কাদায় একাকার। তার ওপর ভীড়, গরম ও দুর্গন্ধ। বেটাছেলেদের গায়ের গন্ধ। মাথার ওপরের হাতলগুলো যে কতলোকই ধরেছে! চামড়ার দুর্গন্ধ! আচ্ছা, ইলেকট্রিক ট্রেনের মতো বাসের হাতলগুলো 'মেটাল্'-এর তৈরী হলে কেমন হয়? এ বিষয়েও কিছু লিখতে হবে। এখন আর বাসটা মোড় ঘুরছে না। সোজা একনাগাড়ে চলছে। কিন্তু আমার পিছনে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা একটু একটু করে সরে এসে ইচ্ছে করেই আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। কী সাহস লোকটার!

সেদিন আমার বান্ধবী কলা বলছিল, বাসের মধ্যে একটা লোক এই ধরনের মিস্‌বিহেভ্ করল বলে কলা তক্ষুনি পায়ের স্লিপার খুলে লোকটাকে মারতে থাকে। বাসের মধ্যে সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। ও তা করতেও পারে। তবে আমার মনে হয় ও ঠিক মারে নি, মারবার কথা ভাবছিল, এই যেমন এখন আমি ভাবছি। কিন্তু মেয়েরা যা ভাবে তাই কি করতে পারে? আচ্ছা, এমন তো

হতে পারে, লোকটি না জেনেই আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ! বয়স্ক লোক নাকি ! ফিরে যে দেখব তারও উপায় নেই। কিন্তু না, বয়স্ক লোক নয়। ও ইচ্ছে করেই গায়ের ওপর এসে পড়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি। এ হঠাৎ এসে পড়া নয়। একটু একটু করে চেপে ধরা। আমার সারাটা শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। আজ বৃষ্টির দিন, ভাবছিলাম ঠাণ্ডার দিনে আর স্নান করব না। কিন্তু এখন দেখছি বাড়ী ফিরেই বেশ ভালো করে নাইতে হবে। আচ্ছা, এই লোকগুলোর লজ্জা করে না ভীড়ের সুযোগ নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতে ? এই কি পুরুষত্ব ? এদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কেউ যদি এরকম ব্যবহার করে··· সে কথাটা কি ভাবে না ? হ্যাঁ, বাড়ীর কথা ভাবতে বসেছে ! যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলোর হাত ধরে টানাটানি করে, তারাও এদের চেয়ে ভালো। শতগুণে ভালো। মেয়েগুলো ইচ্ছে করলে হাত ধরে ডেকে নিয়ে যেতে পারে, ইচ্ছে না হলে 'মাপ করো বাপু' বলে হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু এ সব কী ? ভীড়ের সুযোগ নিয়ে মেয়েদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক ভয় ও সঙ্কোচ আছে, তারই সুযোগ নিয়ে জোরজবরদস্তি করে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়ানো ? হোপলেস্ !

সেই লেটার্স টু দ্য এডিটরে এ নিয়েও লেখা দরকার। 'কেবল মহিলাদের জন্য' বাস-এর পরিকল্পনায় এই পয়েন্টটা খুবই রেলিভ্যান্ট্। তামিল পত্রিকায় লিখে কাজ নেই। লিখতে হবে ইংরেজী পত্রিকায়, তাতে খুব রেসপন্‌স পাওয়া যাবে। চার লাইন লিখলেও বিউটিফুল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে হবে। তার জন্য যদি দুটো দিনও লাগে, লাগুক।

'মেয়েরা বাসে উঠলেই পুরুষদের উচিত সিট ছেড়ে দেওয়া।' (সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা গদগদ ভঙ্গীতে বলবে— থ্যাঙ্কস্। পুরুষেরা বলে উঠবে— ডোণ্ট্ মেনশান্। কী সব স্টুপিডিটি !) আমি ওসব লিখব না। আমাকে কেউ সিট ছেড়ে দিলেও আমি তাতে বসি না। আমার কি হাত-পা নেই ? আমি কি খোঁড়া নাকি ? নাকি বুড়ো মানুষ ? ওভাবে কেউ আমার বয়সের সম্মান দেয় না, আর কী-ই বা আমার বয়স ? এখনও তিরিশ পার হয় নি। আর-সব মেয়ের মতো আমি স্টাইল করে চলি না। তবু তো লোক গায়ের উপর এসে পড়ে। স্টাইল করলে তো আর কথাই নেই। আচ্ছা, আমার মধ্যে ওরা কী দেখে যে আমার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় ? আমি বেশ সতর্ক হয়ে চলি, যাতে আমার দিকে কারও দৃষ্টি না পড়ে। এইভাবে চলি বলেই কি ওদের এই মতিবুদ্ধি ? যত পুরুষ দেখি, সব বেটাই এই রকম ! হ্যাঁ, সব বেটাই, একজনও ব্যতিক্রম নেই। বাবাকে দেখি নি। দাদা ? হ্যাঁ, খুব চতুর লোক। ভাই-বোনের সম্পর্ক, বলতে বাধে। নইলে ঐ সমস্ত কথা শোনাতে পারে ? একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার বললে কিনা— 'না, তুই আমার বোন নোস্, তুই আমার কিসের বোন ?'

এইভাবে বাসে যাতায়াতে দাদাকেও দেখেছি বাসের মধ্যে। এই যে লোকটা পিছন থেকে আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে, কেমন চালাক! সহোদর ভাইয়েরও হাবভাব এর চেয়ে কিছু কম কদর্য নয়। সে আমাকে কী ভাবে? কী চোখে দেখে? কত কী কথা বানিয়ে বানিয়ে বৌদির কাছে গিয়ে লাগায়। বৌদিটিও হয়েছে তেমনি। এক কথাকে দশ কথা ক'রে— ওদের বাড়ীর সমস্ত ভাড়াটেদের কাছে গালগল্প করে।

লোকটা কী রে? একেবারে চেপে ধরেছে যে! অন্য লোকে ভাবতে পারে যে আমাদের মধ্যে কিছু একটা ঘনিষ্ঠতা আছে। দাদার কথাই ধরা যাক। সেও কি অন্য কিছু মনে করবে? না। তার ধারণা, সে ছাড়া সকলেই আমার বন্ধু। লোকটার মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। ফিরে তাকিয়ে যে দেখব, সে সাহসও নেই। লোকটা কালো না ফর্সা? বুড়ো না যুবক? যে-ই হোক, আমার কী? বদমাস লোক যে-ই হোক না, ভীড়ের মধ্যে পড়ে গেলেই হ'ল। এমনভাবে দাঁড়াবে, এমন ভাব দেখাবে যেন কত আপনজন! আমার দাদা যদি আমাকে এই অবস্থায় দেখে আমি বেশ বুঝতে পারি সে ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখবে। সে ভাববে যে পিছনে দাঁড়ানো ঐ লোকটা আর আমার মধ্যে মাঝে মাঝেই দেখাসাক্ষাৎ ঘটে। তারপরে মনে করবে যে লোকটা আমার আপিসেই চাকরি করে। বাসে যাতায়াতের সময়ে এই লোকটাই আমার টিকিট কেটে দেয়। আমি ইচ্ছে করেই দাদাকে অপমানিত করবার জন্য তার চোখের সামনেই এই লোকটার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করছি।··· দাদা এই সব ভাবে ভাবুক। আমি গ্রাহ্য করি না। কে কী বলবে আমায়? আমি নিজে লেখাপড়া শিখে, নিজেই নিজের চাকরি খুঁজে নিয়ে দাদার চেয়ে ভালো পজিশনে আছি। দাদা ভাববে, লোকটার সঙ্গে আমার যে সম্পর্কই থাক, এভাবে প্রকাশ্যে মাখামাখির ফলে বাসসুদ্ধ প্যাসেঞ্জার আমায় থু থু দেবে। আর তাতে দাদার মাথা একেবারে হেঁট হয়ে যাবে এবং এ সমস্ত অনাছিষ্টি সহ্য করতে না পেরে সে হয়তো পরের স্টপেই নেমে যাবে।···

দাদা গিয়ে বলবে বৌদির কাছে, তারপরে বৌদি বলবে তার পাড়া-প্রতিবেশীকে। বৌদির কথা শুনে কেউ হয়তো বলবে— 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও একটা লোককে দেখেছি গঙ্গার সঙ্গে। সেই লোকটাই হবে বা!' আর একজন হয়তো বলে উঠবে— 'সেই লোকটাই কি? না অন্য কেউ?'

তারপরে বৌদি বলবে— 'আমাদের কী বলুন। গঙ্গাটা গোল্লায় গেছে, ওকে আমরা ধর্মের নামে উচ্ছুগ্‌গু করে দিয়েছি। কিন্তু দাদা তো, শত হলেও মায়ের পেটের ভাই, সে কি চুপ করে থাকতে পারে? লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়। শাশুড়ী ঠাকরুন এমন একটা মানুষের মা, তাঁর পেটেই কি না জন্মাল ঐ রকমের একটা মেয়ে?' এইভাবে বৌদি দাদাকে একটু মাথায় তুলে ধরবে।

দাদার বলা কথাগুলো বৌদি পাড়াপড়শীকে শুনিয়ে তাদের মতামত

যোগাড় করে এনে আবার দাদার কাছেই বলবে : 'আমাদের কী— একথা বললেও মন কি মানে? তার টাকা চাই না, পয়সা চাই না, বাড়ী-ঘর চাই না। আমরা তো আলাদা হয়েই আছি। সে যদি বেশ ভালো হয়ে সৎ ভাবে থাকে, তাতে আমাদের গৌরব কিছু বাড়বে না। আর যদি কুপথে গিয়ে এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করে, সকলেই বলবে— অমুকের বোন। ওইটুকু মেয়ে, কী কাণ্ডটাই না করে এল। তাতে দাদা হয়ে একটু বকাবকি করেছ এই যা। অন্য লোক হলে অমন বোনকে দা দিয়ে কেটে দু'ভাগ করে ফেলত। তোমার মা-ই বা কেমন লোক! 'বকলেই বা কী, মারলেই বা কী? দাদা তো।' তিনি কি এই বলে মিটিয়ে দিতে পারতেন না? তা নয়, মেয়েটাকে বাইরে যেতে বলে সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে তিনিও বেরিয়ে গেলেন। ওভাবে বেরিয়ে না গেলে কি নিজের বাড়ী, এমন আরামে থাকা— এসব কি আর জুটতো? নইলে তো এই তিরিশ টাকার ভাড়া বাড়ীতে ছারপোকা মেরে আমার দুষ্টু ছেলেগুলোর সঙ্গেই থাকতে হ'ত। কী তাঁর সৌভাগ্য! সব যেন আগে থেকেই প্ল্যান্ করা। তোমার বোন করে এল ওই কম্ম, তার জন্যে তুমি কি একটু মারধোর করে বললে বেরিয়ে যেতে, আর তক্ষুনি কিনা তোমার মা বলতে লাগলেন— 'খুবই ভরসা ছিল ছেলেটার ওপর। খুব লেখাপড়া শিখে মস্ত বড় চাকরি করবে। তা আমি আশা করলেই কি হল? ম্যাট্রিকেই গেল তিন-তিনটে বছর। তারপরে এই মেয়ে। দ্যাখো না কেনে, সারা দেশের মধ্যে একেবারে ফার্স্ট, চাই কি একদিন কালেক্টারও হতে পারবে। ভগবান ওকে বাঁচিয়ে রাখুন।' এমনি ধারা কত না কথা! যাক, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হল। মেয়ে তাঁর অনেক লেখাপড়া শিখে, বড় চাকরি করে। অনেক টাকা-পয়সা রোজগার করে। এখন যদি সে কারো সঙ্গে কোথাও একটু বেড়িয়ে বেড়ায় তাতে শাশুড়ী ঠাকরুনের আর কী? কিন্তু লোকে যখন বলে অমুকের বোন, তখন লজ্জায় মাথা কাটা যায় তো আমাদেরই। তুমি তো মাঝে মাঝেই যাও তোমার মাতৃদেবীর সঙ্গে দেখা করতে। একটা কথা শুনিয়ে এসো তাঁকে। এই পঞ্চবটীর পাশেই একটা পার্ক আছে না, সেখানে রাত সাতটার পরেও নাকি মাঝে মাঝে এসে দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর গুণধর মেয়ে। কেবল লেখাপড়া করলেই হয় নাকি? চাকরি করলেই সব দোষ ধুয়ে গেল?' বৌদি কথা বলতে শুরু করলে দাদা স্রেফ চুপটি করে বসে থাকে। বৌদি না থামা পর্যন্ত একটি কথাও বলে না। যেন মৌন হয়ে মন্ত্রপাঠ শোনে।

অবশেষে দাদা চেঁচিয়ে ওঠে— 'বেশ বেশ। ঢের হয়েছে। তা আমাকে কী করতে বলো? আমি গিয়ে বললেই কি গঙ্গা আমার কথা শুনবে নাকি?'

'শুনলে শুনবে, না শুনলে না শুনবে। আমাদের কানে নানা কথা আসে, আমরা বলে খালাস। তারপরে আছেন তোমার মা আর তাঁর মেয়ে। তাদের পরিবারে জন্মেছ, এই দোষে যে তোমার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যায়, তাই বলা।

নইলে আমার কী ?'…

কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে এমনিভাবে 'কিরিচ' শব্দ করে বাসটা কেঁপে কেঁপে থেমে গেল। আমার পেছনের লোকটা বেশ খুশী হয়েই এসে ধাক্কা মারল আমার গায়ে। খুব তৃপ্তি হয়েছে বুঝি লোকটার। এবারে অবশ্য লোকটাকে দায়ী করা যায় না।

লেটারস্ টু দ্য এডিটরে— কী লেখা যায় সেই কথাই ভাবছিলাম। কত বিষয় নিয়ে লিখব বলে কত সময়ে যে ভাবি! ঐ ভাবনা মাত্রই সার। তারপরে বিষয়টা পুরোনো হয়ে যায়। তখন মনে হয়— আর লিখলেই বা কী হবে ? সেই প্রসঙ্গটার সেখানেই সমাপ্তি।

কখনও কখনও দেখা যায়, চিঠিপত্রের কলমে বেশ মজার মজার চিঠি ছাপা হয়। সত্যি বলতে কী, দৈনিক পত্রিকায় আমার পড়বার প্রধান আইটেম হল 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগ। তারপরে… তারপরে হল মেট্রিমোনিয়াল্ কলম মানে 'পাত্র-পাত্রী' বিভাগ। বেশ আগ্রহ নিয়েই পড়ি। না, না, কোনোটার উত্তর-টুত্তর দেওয়া নয়। এমনই আর কি! দ্যাট ইজ্ রিয়েলি ইণ্টারেস্টিং! আমার তো আর বিয়ে-টিয়ে হবে না। হবে না যে তা আমি অনেক দিন আগেই ঠিক করে ফেলেছি। তাই বোধহয় বিয়ের ব্যাপারে আমার কেমন এক ইণ্টারেস্ট জন্মে গেছে। আর তাতে দোষটাই বা কী ?

এগ্মোর স্টেশনে এসে বুঝি বাস্টা দাঁড়াল। সমস্ত জানালা বন্ধ বলে বোঝাই যায় না কোথায়-না-কোথায় এলাম। টপ্ টপ্ করে অনেকগুলো লোক নেমে গেল। বাইরে তখনও বৃষ্টি। কন্ডাকটার হাঁকছে— 'এগমোর স্টেশনের প্যাসেঞ্জার সব নেমে যান।' ইতিমধ্যে ঠেলাঠেলি করে উঠেও পড়ে কতগুলো লোক। লেডিস্ সিট কয়েকটা খালি। টপ্ করে বসে পড়লাম। এখনও তিনটে স্টপ বাকী। সে যাই হোক, ওই গোঁয়ার-গোবিন্দটার হাত থেকে তো বাঁচা গেল। এখন দেখলাম লোকটাকে। মুখটা দ্যাখো না কেন! হাসছে আবার! মানসম্ভ্রমহীন রাস্কেল কোথাকার। কপালের ওপর চুলগুলো টানা… বাসের মধ্যে প্রেম করবার যত সব ফন্দী! আমি যে দেখছি, সেদিকে যেন খেয়ালই নেই এমন ভাব! হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে এ সপ্তাহের 'অ৷… ' পত্রিকাখানি তুলে মুখের সামনে খুলে নিলাম। তারপরে আর লোকটার দিকে ভ্রূক্ষেপ করি নি।

দুপুরবেলা লাঞ্চ টাইমে দুটো পৃষ্ঠা পড়েছিলাম, সেই গল্পটাই বার করলাম। র. কু. ব.'-র লেখা গল্প। যেন আমারই লাইফের একটা ইন্সিডেণ্ট নিয়ে লেখা। এই লেখকের গল্প পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। কেন জানি না, আমার মনে হয় র. কু. ব. আদ্যক্ষর দিয়ে যিনি লেখেন তিনি নিশ্চয়ই কোনো মহিলা। একটা কারণ বোধ করি এই যে, এঁর সমস্ত গল্পের 'থীম' হল একালের মেয়েদের জীবনের নানা সমস্যা।

র. কু. ব.'-র লিখিত গল্প নিয়ে আমাদের অফিসে খুব কনট্রোভারসি। আমি এইসব তর্ক-বিতর্ক নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই না। সকলেই যখন না বুঝেশুনে বোকার মতো বক্‌বক্‌ করে, আমার শুনে হাসি পায়, কখনো-সখনো রাগও হয়। ওরা ভাবে আমার বুঝি সাহিত্যে কোনো টেস্ট নেই। ওদের কথাবার্তা শুনে ওদের সম্পর্কে আমারও তো সেই কথাই মনে হয়! আমার টেস্ট আমার কাছে! হোয়াই শুড্‌ আই শেয়ার ইট্‌ উইদ্‌ আদারস্‌?...

যাক সে কথা। এখন গল্পটা পড়া যাক, র. কু. ব. -লিখিত গল্প :

"মেয়েটিকে দেখলেই মনে পড়বে একটি সদ্য ফোটা ফুলের কথা— যে ফুলের রূপের তুলনা কোথাও নেই। পৃথিবীর মহামূল্য জিনিসের মধ্যেও না। পা ও পায়ের পাতা দুটি হাতির দাঁতের মতো মসৃণ। বৃষ্টিতে ভিজে, ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে সেই রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠা সাদা পা দুখানিও যেন নীল হয়ে আসছে। গায়ের সঙ্গে লেপটে যাওয়া ভেজা জামা-কাপড়ে শীতে সঙ্কুচিত সেই দেবী প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখলে মনে হবে যে অনায়াসেই একে হাতে করে তুলে নেওয়া চলে।" সত্যিই এরকম লেখা লিখতে পারেন কেবল র. কু. ব.। বাক্যগুলি দীর্ঘ হলেও মনে হবে যেন মোটেই দীর্ঘ নয়। এমনভাবে লেখা যেন মনের মধ্যে ভেসে আসছে এক-একখানা ছবি...।

বারো বছর— এক দুই নয়— বারো বছর আগে এমনি এক বর্ষার দিনে আমিও এই মেয়েটির মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম... মায়ের পুরোনো শাড়ী সেলাই করে নিয়ে, তাই পরেই যেতে হত কলেজে। আমিও তখন দেখতে ছিলাম একটি ছোট্ট দেবী প্রতিমার মতো... এ গল্প কি আমারই জীবনের গল্প? আবার পড়তে শুরু করলাম :

"সেই বড় রাস্তার নির্জন পরিবেশে কেবল সেই মেয়েটিই একা দাঁড়িয়ে। আর তার সঙ্গীরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বুড়ো ষাঁড়টা। দূরে কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে কচিৎ কখনো দু'একটি লোক হেঁটে আসছে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন যবনিকা পড়ার মতো অন্ধকার নেমে এল। আর সেইসঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় ডালগুলো থেকে টপ্‌টপ্‌ করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগল। মেয়েটি সরে গিয়ে গাছের সঙ্গে লেগে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ থেমে-থাকা বৃষ্টি প্রবলভাবে শুরু হয়ে যায়। মেয়েটি কলেজের মধ্যে ছুটে যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হতে গিয়ে যখন ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখছে, এমন সময়ে সেই বিরাট গাড়ীখানা মুহূর্তের মধ্যে এসে তার গা ঘেঁষে চট্‌ করে থেমে গিয়ে বেশ দুলতে লাগল।

মেয়েটি সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল সেই চমৎকার গাড়ীখানাকে আর ড্রাইভারের সিটে বসে থাকা লোকটিকে। লোকটি সুন্দর হাসি হেসে বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে পিছনের সিটের দরজা খুলে দিল।

'প্লীজ গেট ইন... আই ক্যান ড্রাইভ ইউ অ্যাট ইওর প্লেস' এই কথা বলে

লোকটি তার বড়ো বড়ো চোখ দুটো দিয়ে বিস্মিতভাবে মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

লোকটার মুখের দিকে চেয়ে মেয়েটির কান ও নাকের ডগা লাল হয়ে উঠল। "নো, থ্যাঙ্কস্। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি থেমে গেলে আমি বাসেই যেতে পারব।"

"ও! ইট ইজ অল রাইট··· গেট ইন্" লোকটা এমন ব্যস্ত হয়ে উঠল যে সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে একটা দ্বিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে হাত দিয়ে স্পর্শ না করেও একরকম জোর করে গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি একবার পিছন ফিরে দেখল। সে যেখানে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল, সে জায়গাটা এখন ওই বুড়ো ষাঁড় দখল করে ফেলেছে।

মেয়েটি তখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আর তার সামনে খোলা রয়েছে গাড়ীর দরজাটা। খোলা দরজা দিয়ে বাইরের জল ভিতরে ছড়িয়ে পড়ছে দেখে মেয়েটি দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করতেই তার হাতের উপর দ্রুত অথচ আলগোছে এসে পড়ল সেই লোকটির হাত। ভীরু মেয়েটি হাতটা সরিয়ে নিয়ে লোকটির দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে একটু সুন্দর করে হাসবার চেষ্টা করল। তারপরে গাড়ীর মধ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়াল।

"হুঁ··· গেট ইন"

এবারে আর মেয়েটি ওই ডাক প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। ভিতরে ঢুকতেই যেন তাকে বন্দী করার মহা আনন্দে যুবকটি দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপরে যেন ঢেউয়ের ওপর চলমান গাড়ীখানি অতি দ্রুত মিলিয়ে গেল।

মেয়েটির চোখদুটি কেবল গাড়ীর মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে। নীল রঙের নরম আলোয় মনে হয় এ যেন এক স্বপ্নের রাজ্য। কতক্ষণ ধরে বৃষ্টির জলে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার পরে এখন এই গাড়ীর ভিতরকার উষ্ণতাটুকু বড় মনোরম বোধ হচ্ছে। মনেই হয় না যে গাড়ীখানা মাটির উপর দিয়ে ছুটছে, মনে হয় যেন সাঁতার কেটে চলেছে পৃথিবীর এক ফুট উঁচু দিয়ে।

'সিটগুলো কী চওড়া! একটা লোক অনায়াসে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারে এখানে'— এই কথাটা মনে হতেই মেয়েটির বোধ হল সে একটা গেঁয়ো মানুষের মতো বুকের সঙ্গে এক রাশ বই এঁটে এক কোণে সসঙ্কোচে বসে আছে। বইগুলো এবং সেই ছোট্ট টিফিন বক্সটা সিটের ওপর একপাশে রেখে দিয়ে এবার সে ভালো করে নড়েচড়ে গম্ভীর হয়ে বসল।

'গাড়ীখানা যেন একটা গোটা বাড়ী! এইরকম একটা গাড়ী থাকলে আর বাড়ী-ঘরের দরকার কী? এর— না, না— এঁর একটা বাড়ীও আছে, নয় কি? গাড়ীটাই যদি এরকম হয়, তবে বাড়ীটা না জানি কেমন হবে! নিশ্চয়ই খুব বড়ো— রাজপ্রাসাদের মতো। সেখানে কে কে থাকে? ইনি কে তা জানি না··· ও মা! এটা

আবার কী মাঝখানে? দুটো সিটের মাঝখানে টান দিলে টেবিলের মতো কী একটা বেরিয়ে আসে। এর ওপর বই রেখে বেশ পড়া যায়, লেখা যায়··· না হয় তো এদিকে একজন, ওদিকে একজন মাথা রেখে দিব্যি আরামে শুতে পারে! এই ছোট্ট আলোটা কী সুন্দর— পদ্মের কলির মতো, উঁহু কুমুদের কলির মতো। একবার জ্বেলে দেখব? ছি! উনি বোধকরি রাগ করবেন!'

'সুইচ ওর নীচেই রয়েছে দ্যাখো···' গাড়ী চালাতে চালাতে যুবকটি সামনেকার ছোট আয়নায় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে বলে উঠল।

মেয়েটি সেই সুইচটায় টিপ দিতেই আলো জ্বলে উঠল এবং মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেই আলোর দিকে। তারপরেই মনে হল পাওয়ার ওয়েস্ট করতে নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দিল আলোটা।

একবার নিজের ভেজা শরীরটার দিকে তাকিয়ে মাথা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া জল দু'হাত দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলতে লাগল। 'ইস! আজকের দিনেই কিনা পরে এলাম এই নোংরা জামা-কাপড়!' মনে মনে খুব বিরক্ত হয়ে যখন সে শাড়ীর আঁচলটা নিংড়োবার উদ্যোগ করছে, 'হুট' করে শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখল যুবকটি বাঁ হাত দিয়ে স্টীয়ারিং-এর পাশে একটি বাক্সের মতো খোপের দরজা খুলে— দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে একটা আলো জ্বলে উঠলো— একখানা ছোট মতো টার্কিস্ তোয়ালে বার করে পিছনে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিল।

'থ্যাঙ্ক্স্!' সেই তোয়ালে দিয়ে মাথা ও হাত মুছে ফেলে যখন মুখ মুছতে যাবে, তখন মেয়েটি তৃপ্তির সঙ্গে মুখখানা তোয়ালের মধ্যে চেপে রেখে মনে মনে বলে উঠল— 'আঃ! কী সুগন্ধ!'

একটা মোড়ে এসে গাড়ীটা বাঁক নিতেই মেয়েটি 'মা' বলে একদিকে ঝুঁকে পড়ল। সীটের ওপর রাখা বইগুলো ও সেই গোলাকার ছোট্ট এভারসিলভার টিফিন বক্সটি উপর থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল।

'সরি!' হাসতে হাসতে একবার মেয়েটিকে দেখে নিয়ে যুবকটি গাড়ীর গতিটা একটু কমিয়ে দিল। মেয়েটি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল তার জন্য সে নিজেই সলজ্জ হাসি হেসে ছড়িয়ে-পড়া বইগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গুছিয়ে রাখল।

জানালার কাচের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকাতে গিয়ে চোখে কিছুই স্পষ্ট ক'রে দেখা গেল না। কাচের উপর ধোঁয়ার মতো লেগে থাকা জলবিন্দুগুলোকে মেয়েটি তার আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

সারা রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। আলোয় সাজানো দোকানগুলো বৃষ্টির জলে প্রতিফলিত হয়ে চোখের বিভ্রম ঘটাচ্ছে। বোধহচ্ছে যেন এই পৃথিবীর নীচে আরও একটা জগৎ রয়েছে বুঝি···

'এ কী? গাড়ী এ রাস্তায় যাচ্ছে কেন? আমাদের বাড়ী তো ওদিকে—'

বিড়বিড় করতে গিয়ে মেয়েটির ঠোঁট দুটি আস্তে আস্তে নড়ে উঠল।

যুবকটিও প্রত্যুত্তরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল—'হোক-না ওদিকে। কে বলছে ওদিকে নয়?'

'এ সব কী কথা?' মেয়েটি তার হাত দুখানি কচলাতে থাকলেও যুবকটির তৃপ্তির জন্যই বোধ করি মুখে একটু মৃদু হাসি ফোটাল।

গাড়ী চলেছে।

শহরের কোলাহলপূর্ণ প্রধান বাজার অতিক্রম ক'রে বড়ো বড়ো দালানে সাজানো প্রশস্ত রাস্তাগুলো পার হয়ে সুন্দর বাংলো ও ফুলের বাগিচায় ভরা এভিনিউগুলো ছাড়িয়ে কী একটা ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে— গাড়ী চলেছে। শহরের সমস্ত কোলাহল এখানে শান্ত।

'টি. বি. হসপিটাল··· টি. বি. হসপিটাল!' কণ্ডাক্টর আমার জন্য দু'বার ক'রে বলল, দ্বিতীয়বার আওয়াজটা একটু উঁচু ক'রেই শোনালো। বাইরে খুব ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে। সকালবেলা অফিসে বেরুবার সময়ে বেশ খটখটে রোদ ছিল বলে ছাতাটা নিয়ে আসি নি। এখন এখানে নামলে বাস স্টপের ওই ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তার চেয়ে বরং গল্পটা পড়তে পড়তে মাম্বলম্ টার্মিনাস্ পর্যন্ত গিয়ে এই বাসেই ফিরে এলে মন্দ কী?

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। মাম্বলম্ পর্যন্ত একখানি টিকিট কিনে আবার ব'সে পড়লাম। সেই গায়ে-হেলে-পড়া জানোয়ারটা সামনের সিটে ব'সে বারবার পিছন ফিরে ফিরে আমার দিকে তাকাতে লাগল। হা ভগবান! লোকটার বুঝি ধারণা আমি ওরই পেছনে ধাওয়া করব বলে মাম্বলমের টিকিট কিনেছি!···

বাস ছেড়ে দিল।

আমি আবার গল্পে মন দিলাম।

এ যেন আমারই জীবনকথা! গল্পের পরিণতিটা কেমন? আমারই জীবনের মতো কি? কেন জানি না আমার চোখ ছাপিয়ে জল আসছে!···

হঠাৎ কোথাও ভীষণ গর্জনে বজ্রপাত হল :··

আমার জীবনে সেদিনও তো এমনিভাবেই বজ্রপাত হয়েছিল।

র. কু.'-র লেখা গল্পটির একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে এইভাবে এই কথাগুলি দিয়ে।

"বাইরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। বারে বারে চমকাচ্ছে লকলকে বিদ্যুৎ। আর সেইসঙ্গে ফেটে পড়ল প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি। হায়! বাজটা কাছাকাছি কোথাও পড়ে থাকবে।"

আর কোথাও না— সেদিনকার বজ্রপাত হয়েছিল আমারই মাথার ওপরে।

2

সকাল দশটার সময়ে গঙ্গা অফিসে চলে যেতেই তার মা কনক সদর দরজায় খিল দিয়ে বড় ঘরের খালি মেজের ওপর পড়ে পড়ে বিকেল চারটে পর্যন্ত কেবল চোখের জল ফেলে। গত এক সপ্তাহ ধরে এই-ই সে করে আসছে।

বিকেল চারটের সময়ে গোয়ালা এসে দরজায় কড়া নাড়লে কনক উঠে চোখমুখ ধুয়ে আবার [illegible] রান্নাঘরের কাজকর্ম শুরু করে, তখনো থেকে থেকে তার চোখের জলের বিরাম নেই।

এক সপ্তাহ আগে একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল— সেই যেদিন গঙ্গা অফিস থেকে বাড়ী ফিরতে অনেক দেরী করে ফেলেছিল। সেদিনকার মুষলধার বর্ষণে বিনা ছাতায় মেয়ে বোধকরি বাস স্টপেই দাঁড়িয়ে আছে ভেবে কনক ঘরে তালা লাগিয়ে ছাতি হাতে নিয়ে এক ঘণ্টারও বেশি বাসস্ট্যাণ্ডে মেয়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল···

অবশেষে রাত আটটার পরে বৃষ্টি থেমে গেলে গঙ্গা অফিসের আসার উল্টো দিক থেকে একটা বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করেছিল। কনক তার মেয়ের নাম ধরে ডাকার সাহস না পেয়ে তাড়াতাড়ি করে রাস্তাটা পার হয়ে ছুটেছিল। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে শেষকালে বাড়ীর কাছাকাছি এসে গঙ্গাকে ধরে ফেলল···

বাড়ীর দরজায় তালা ঝুলছে দেখে মেয়ে হকচকিয়ে যায় এই ভয়ে কনক তাড়াতাড়ি বলে উঠল— "এই যে আমি এসে গেছি গঙ্গা। সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি পড়ছে, ছাতাও নিয়ে যাস নি, ভাবলাম একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসি মেয়েটা বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছেছে কি না।···ছি! ছি! কী যা-তা বৃষ্টি! আলোও নেই রাস্তায়···পাথরে একটা হোঁচট খেলাম···বাস স্টপে দেখলাম তোকে···আমি কি অত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি নাকি! খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এলাম।" কথাগুলি যদিও মেয়ের উদ্দেশে বলা, কিন্তু মা একবারও মেয়ের মুখের দিকে না তাকিয়ে যেন অন্য কাউকে বলছে এইভাবে দরজাটা খুলে ফেলল। গঙ্গার জন্য সে যে এত কষ্ট স্বীকার করেছে তার বদলে মেয়ে কি একবারও তার দিকে হাসিমুখে ফিরে তাকাবে না?— এই আশা নিয়ে গঙ্গার মুখের দিকে তাকাতেই মা দেখতে পেল যে তার একটা কথাও যেন মেয়ের কানে পৌঁছচ্ছে না, যেন এইসব তুচ্ছ কথায় মনোযোগ দেবার মতো সময়ই তার নেই। গভীর চিন্তাজালে জড়িত বড়োরা যেমন নিশ্চিন্ত ক্রীড়ারত শিশুর দিকে তাকায়, গঙ্গাও তেমনি তার ঠোঁটের কোণে একটু তিক্ত হাসি ফুটিয়ে এমনভাবে মায়ের দিকে তাকাল যেন সে বিষম একটা অপরাধ করে ফেলেছে। মায়ের মুখে আর কথা নেই।

"যাও, পড়ে দেখো গিয়ে এটা..." এই সামান্য কথাটা অসামান্য ক্রোধে

বলে ফেলে গঙ্গা তার মায়ের প্রসারিত হাতে দেওয়ার মতো সম্মানটুকুও দেখিয়ে সেই পত্রিকাটা দরজার কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে দুয়ার বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। খাওয়ার প্রবৃত্তি তার রইল না।

সেদিন সারা রাত আর বড়ো ঘরের আলো নেভানো হয় নি। গঙ্গার ছুঁড়ে দেওয়া পত্রিকাখানি হাতে নিয়ে কনক বার বার সেই গল্পটা পড়ে পড়ে কেবল চোখের জল ফেলতে লাগল।...

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই একটা সপ্তাহ মায়ের মনে কত কী ভাবনা। ভাবনারও যেমন শেষ নেই, চোখের জলেরও তেমনি বিরাম নেই। মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। মায়ের কান্না গঙ্গার চোখে পড়ে না, চোখে পড়লেও তা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। অনেকদিন আগেই তো সে বুঝে নিয়েছে অশ্রু মানেই হল কতগুলো নোংরা চোখের জল। গঙ্গা কখনো কাঁদে না। সে জানে কান্নার কোনো অর্থ হয় না। মা-ও জানে মেয়ের মনের কথা। মায়ের কান্নায় মেয়ের মনে যে কোনো পরিবর্তন দেখা দেবে না, কোনো শান্তি আসবে না একথা জানে বলেই সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে।

আজ বারো বছর ধরে— যে দুটো বছর মেয়েটা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছে সেই সময়টা বাদ দিলে আজ দশ বছর ধরে একটি দিনের জন্যও মায়ে ও মেয়েতে ছাড়াছাড়ি হয় নি। প্রত্যেকদিন দুইবেলা একসঙ্গে খাওয়া, রাতে ঘুমোতে গিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ বোজা, আবার ভোরে ঘুম ভাঙার সময়ে একে অন্যের মুখ দেখে জেগে ওঠা— এইভাবে অন্য কারো সহায়-সম্বল ছাড়া স্বতন্ত্র জীবন যাপন করলেও মা ও মেয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা দুস্তর ফাঁক গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর কাছ থেকে, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে যেমন তারা পৃথক হয়ে বসবাস করছে, গঙ্গাও বুঝি তেমনি দিনে দিনে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে সরে যাচ্ছে।

আজ কত দিন হল— বোধ করি বারো বছরই বা হবে— গঙ্গা কখনো তার মাকে 'মা' বলে একবার ডাক দেয় নি!

চল্লিশ বছর পার হয়ে গত দশ বছর ধরে কনক অবশ্য সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবন যাপন করছে, সন্দেহ নেই। দশ বছর আগে লোকের দুয়ারে চেয়ে-চিন্তে খাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু এই দশ বছরে কারও কাছে গিয়ে তাকে বলতে হয় নি— 'দিদি, এক চামচ কফি দেবে?' গঙ্গা তার মাকে সুখেই রেখেছে বলতে হবে। ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার সময়ে মায়ের গলায় কাশির শব্দ শোনা গেলে ঠিক ন'টার সময়ে ডাক্তার এসে হাজির হবে। কখনো কোনোদিন মা শাড়ী সেলাই করছে দেখা গেলে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে এসে নতুন শাড়ী দেখা দেবে। মাসের শেষ তারিখে গঙ্গা মায়ের হাতে দুশো টাকা দিয়ে কখনো তার হিসাব চায় না। এই দশ বছরে এমন একটা মাসও যায় নি যে মাসে কনক নতুন

নতুন এভার-সিলভার থালা-বাসন না কিনেছে। একদিন যাকে পরের কাছে গিয়ে একটু কফি, একটু চিনি, খানিকটা অড়হর ডালের জন্য হাত পাততে হত, আজ সে অঢেল পরিমাণে বিলোচ্ছে অপরকে। বিলোবার শক্তি আছে, স্বাধীনতা আছে তার। পঞ্চাশ বছরের বিধবা নারীর জীবনে আর কী চাই?

কখনো কখনো ছেলে গণেশ আসে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। গণেশের ছটি ছেলে-মেয়ে। মাইনে তার তিনশো টাকা। তিরিশ টাকার ভাড়া বাড়ীতে বাস করার নানা দুঃখের কথা শুনিয়ে যায় মাকে। কিন্তু সে এমন প্রত্যাশা নিয়ে আসে না যে বোনের টাকা থেকে মা তাকে সাহায্য করুক। মা যদি টাকা দেয়, সে টাকা ছুঁড়ে ফেলার মতো আত্মসম্মান জ্ঞান তার আছে। সে পাঁচ জনের কাছে ধারকর্জ করার জন্য ঘুরে বেড়ায়। মায়ের কাছে কি সে টাকা চাইতে পারে না? গণেশও চায় না, মা-ও যেচে কিছু দিতে সাহস করে না। গণেশ যে এখানে যাতায়াত করে তা টাকার জন্য নয়।

সে বড়ো ঘরে বসে বসে গঙ্গার বিরুদ্ধে মায়ের কাছে কত কী কথা বলে। মা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করলে মায়ে-পোয়ে ঝগড়া হয়ে যায়। দাদা চলে না যাওয়া পর্যন্ত গঙ্গা তার ঘর থেকে বাইরে আসে না। কনক যে তার নাতিদের জামাকাপড় তৈরী করে দেবে, ভালোমন্দ খাবার পাঠিয়ে দেবে, পালা-পার্বণ উপলক্ষে এখানে তাদের ডেকে আনবে— এ বিষয়ে গঙ্গা একেবারে নির্বিকার।

কনকেরও একমাত্র চিন্তা গঙ্গার মনকে সন্তুষ্ট রাখা। মায়ের সমস্ত কাজকর্ম কেবল মেয়েরই জন্য। মনে মনে সে কেবল দুঃখ পায়, তার মেয়ের জীবনটা কি এইভাবেই চলবে— নারীজীবনের সাধ-আহ্লাদ বিহীন একটা শূন্য জীবন হয়েই থাকবে? একটা দুঃস্বপ্ন ভুলে যেতে মানুষ যেমন চেষ্টা করে, মা-ও তেমনি প্রায়ই তার মেয়ের জীবনকথা ভাবে, ভেবে দুঃখ পায় আবার সেই দুঃখটা ভুলতেও চেষ্টা করে।

এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত, সেই যেদিন গল্পটা পড়ে দেখবার জন্য গঙ্গা পত্রিকা-খানা ছুঁড়ে ফেলে দিল তার আগে পর্যন্ত, কনকের কোনো ধারণাই ছিল না যে বারো বছর আগেকার ঘটনা সম্পর্কে গঙ্গার মনে ক্রোধ, হিংস্রতা ও প্রতিশোধ-বৃত্তি কত গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে।

রোজকার মতো যথাসময়ে কনক রান্নাঘরের কাজগুলো শেষ করে সদর দরজাটা খুলে একবার বাইরের দিকে তাকায়। প্রায় সেই সময়েই রাস্তার আলোগুলি জ্বলতে আরম্ভ করে। সদর দরজার আলোটার সুইচটা জেলে দিয়ে ভিতরে গিয়ে পূজার ঘরের আলোটা জেলে দেয়। তারপরে হাতে একটা পত্রিকা নিয়ে সদর দরজার চাতালে এসে বসে। দৃষ্টি তার কখনো পত্রিকার পৃষ্ঠায়, কখনো রাস্তার দিকে। এ সমস্তই হল তার বাইরের কথা, কিন্তু তার মনের কথা হল একটি মাত্র— মেয়ে গঙ্গা এখনও যে অফিস থেকে ফিরে এল না। মেয়ে বাইরে

বেরুলে তার ফিরে না আসা পর্যন্ত মায়ের মন কি উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে? কনক বুদ্ধি দিয়ে বোঝে, এ প্রশ্নের কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু তবু যে সে কেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে কথা জানে কেবল তার মন।

গঙ্গা যে কখন বাড়ী ফিরবে তার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। কোনো কোনো দিন পাঁচটা/সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এসে পড়ে। আবার কোনো কোনো দিন সন্ধ্যা ছ'টা, সাতটা, এমন-কি আটটা পর্যন্ত হয়ে যায়। কে তাকে এই নিয়ে প্রশ্ন করবে?

'কেনই বা প্রশ্ন করবে? আমার মেয়ে কখনও ভুল পথে যাওয়ার মেয়ে নয়... বলতে গেলে ব্রহ্মচারিণীর মতোই সে বড়ো হয়ে উঠেছে, সেই ভাবেই জীবন যাপন করে...লোকে সিনেমা, থিয়েটার, জলসা— কত জায়গায় যায়। আমার মেয়ে সম্পর্কে সে কথা বলা যাবে না। যেখানে ভিড়-ভাড়, মেয়ে আমার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। মানুষের চোখের সামনে ও হেঁট মুখ হয়ে থাকে। তাই আমার দিকেও বড় একটা চোখ তুলে তাকায় না। এই তো আমি রাস্তার দিকে চোখ মেলে বসে আছি। ওই যে সামনের বাড়িতেও একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সদর দরজায় এসে দাঁড়ায় না এমন মেয়ে কি কোথাও আছে নাকি? আছে। আমার গঙ্গা। গৃহস্থ পাড়ার রাস্তায় মেয়েরা এসে দাঁড়ালে কেউ তাতে দোষ ধরে না। অফিস-ফেরতা স্বামী বা পুত্রের জন্যে অনেকেই এসে দাঁড়ায়। উনোনে লোহার চাটু চাপিয়ে দু'পয়সার সরষে আনার জন্যে ঝিকে পাঠিয়ে দিয়ে ঝি এলো কিনা দেখার জন্যেও কেউ কেউ এসে দাঁড়ায়। ইস্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা সময়মতো এসে নিশ্চয়ই পৌঁছবে। তবু তাদের বাড়ী আসার মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে সেটুকু দেখার জন্যেও অনেকে বাইরে আসে। এ দৃশ্য সর্বত্র। কেবল এই বাড়ীতেই ও সবের বালাই নেই।

'আমার গঙ্গা রাস্তায় কোনো ব্যাপার-স্যাপার দেখার জন্য ভুলে এসেও একবার পা দেবে না। রাস্তা দিয়ে ঠাকুর যাচ্ছে, বিয়ের বরযাত্রী যাচ্ছে, আরও কত কী? ওদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। আর আমার তো বাচ্চা মেয়ের মতো 'ডুম্‌ডুম্' শব্দ শুনলেই হল, উনোনের কাজকর্ম ফেলে ছুটে দরজায় এসে দাঁড়াই। আর গঙ্গা? ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে লিখবে, নয় পড়বে, নয় তো চুপচাপ বিছানায় আরামে গা ছড়িয়ে বুকের ওপর হাত দু'খানি রেখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকবে···

'সেই ঘরের দরজায় টোকা দিতেও আমার ভয় হয়। আমার পেটের মেয়ে, এখন তার ওপর সমস্ত অধিকার হারিয়ে তারই ভয়ে জড়সড়।

'বেশ তো, গঙ্গা যদি এইভাবেই থাকে তো ক্ষতি কী?

'আর কী ভাবেই বা সে থাকতে পারে?

'যে-কোনো বিষয়ে হোক, গঙ্গা যদি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করে তবেই

আমি কথা বলতে পারি। কিন্তু কথা বলার আছেই বা কী? সে তার মনে অফিসে যায়, অফিস থেকে আসে। আর আমার যত দিন আয়ু, ততদিন আমার কপালে আছে—রান্না-বান্না করে সদর দরজায় তার আসার অপেক্ষায় বসে থাকা। এই তো আমার জীবন! হায়রে কপাল! সকাল আটটা বাজলেই শুরু হয় তেঁতুল গোলার কাজ। এমন একটা দিনও কি আছে যে হাতটাকে বিশ্রাম দিতে পারি? তেঁতুল গুলতে গুলতে আমার জীবনটাও গুলিয়ে গেল। আমি আর ক'টা দিন? তারপরে? আমার জায়গায় আর একটা রাঁধুনী কি ও পাবে না? কিন্তু গঙ্গা চিরটাকাল এইভাবেই থাকবে!

'এ হেন মেয়ের বিষয়ে কী বলার আছে পাড়ার লোকের? ছেলে গণেশ এসেছিল গেল মাসে। গঙ্গা তখন তার ঘরের মধ্যেই ছিল। গঙ্গা যে বাড়ীতে আছে সে কথা জেনেই হোক, কি না জেনেই হোক গণেশ নানা কথা বলতে লাগল। গঙ্গা কি সেগুলো কানে তোলে নাকি? তার ভাবখানা যেন এই: 'কে এসে কার কাছে আমার বিষয়ে কী-না-কী বলছে তাতে আমার কী?' এই সামান্য পাড়া-পড়শীগুলোর যদি কিছুমাত্র মান-সম্মান জ্ঞান থাকত, তবে কি তার বিষয়ে কথা বলতে পারত? গঙ্গা যেমনই হোক-না, তার বিষয়ে কথা বলার রাইট এদের কোথা থেকে এল?

'আমাদের গঙ্গা যা করে ঠিকই করে। সে কখনো জানালার পাশ দিয়ে, দরজার ফাঁক দিয়ে সতীনারীর মতো ভান করে দাঁড়ায় না। উঁকি মারে না। পরের গোপন কথায় আড়ি পাতে না। দেখতে হলে, যে-ই হোক-না-কেন, সামনাসামনি এসে গঙ্গা সোজা উপরে মুখ তুলে তাকায়। জিজ্ঞেস করবার থাকলে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে। অনাবশ্যকভাবে অন্য কারো দিকে তাকাবে না বা কারো সঙ্গে কথা বলবে না। সে আছে আর আছে তার কাজ...

'আজ পর্যন্ত একটি মেয়েকেও বাড়ীতে ডেকে এনে আমায় বলে নি—মা, এই আমার বন্ধু। ওর কি বন্ধু-টন্ধু আছে? কারো সঙ্গে কখনো কি ও হেসে কথা বলে? অফিসেও কি ও এইরকমই থাকে? ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়...

'এমন মেয়েও দেখা যায় যারা পঞ্চাশ টাকা মাইনের কর্মচারীকে বিয়ে করে, মুখ ভর্তি পাউডার মেখে, চোখ ছেড়ে কান পর্যন্ত কাজল টেনে কত রকম ফ্যাসন দেখায়। আচ্ছা, আমাদের গঙ্গা কত মাইনে পায়? তা-ও পর্যন্ত আমি জানি না। গণেশ বলল—সাতশো/সাড়ে-সাতশো। অথচ কী সাদাসিধাভাবে থাকে মেয়েটা। একটু সাবান দিয়ে মুখখানা ধুয়ে-মুছে ফেলে··· ব্যস ওইটুকুই··· কপালে তিলক পর্যন্ত পরে না।

'প্রতিবেশীরা বলাবলি করে—গঙ্গা মর্নিং ওয়াক্ করে। গণেশ সেই কথাই বলতে এসেছে আমায়। যারা থাকে ট্রিপ্লিকেনের নোংরা গলিতে কোনোমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই নিয়ে, তাদের বেড়াবার সুযোগ কই? সেখান থেকে বীচ

রোড পর্যন্ত যাওয়া মানে তো অগস্ত্য যাত্রা।... গঙ্গা বেড়াতে যায়··· তার যা ভালো লাগে করে।

'ওর কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই। বেড়াতে যাওয়ার মতো কোনো বাড়ী নেই। মন্দিরেও তো যেতে পারে। তা-ও সে যায় না। মন্দির দূরস্থান, ঘরে যে ঠাকুর-দেবতা আছেন তাঁদেরই নমস্কার করে না। আমি অভ্যাসমতো ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বালি।

'কী মনে করে খানিকটা দূর বেরিয়ে আসে। সকালবেলায় যায়, সন্ধ্যা-কালেও যায়। সকালবেলা বেড়িয়ে এসে স্নান করে। সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে এসে চানটা সেরে তবে বেড়াতে বেরোয়। এটা এমন কী মহাকাজ! অথচ এই জন্যই গণেশ ছুটে এসেছে মাথা ভর্তি চিন্তা নিয়ে। পুতুলে যেমন দম দেওয়া হয়, তেমনি গণেশকে দম দিয়ে পাঠিয়েছে তার বউ। ও এখানে এসে হম্বিতম্বি করে।

'সেদিন গঙ্গা এসে আমার মুখের ওপর প্রায় ছুঁড়ে মারার মতো পত্রিকাটা ফেলে দিয়ে বলল— 'পড়ে দ্যাখো'। সেই গল্পের বৃষ্টির মতো বারো বছর আগে-কার সেদিনেও খুব বৃষ্টি হচ্ছিল— একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি। আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে ওকে মেরেছিলাম, একবারও ভেবে দেখি নি যে ও আমার পেটের সন্তান। মাথাটা ধরে দুম দুম করে ঠুকেছিলাম। ঠোঁট মুখ সব ফুলে উঠেছিল। তারপরে জ্বর এসে যায়, গায়ে আগুনের মতো তাপ। এরই মধ্যে গণেশটা এসে গঙ্গাকে বলল— 'আর এক মিনিটও এ বাড়ীতে তোর জায়গা হবে না, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা'— এই বলে ঘাড় ধরে ঘর থেকে রাস্তায় বের করে দিল মেয়েটাকে।

'গেটের বাইরে রাস্তার ওপর মড়ার মতো পড়ে রইল গঙ্গা। পেটে তো ধরেছিলাম, কী করে সহ্য করি? ছুটে গিয়ে ওকে তুলে ধরলাম। গনেশটা তখন বলল কিনা— 'ওকেই যদি তোমার প্রয়োজন, তবে তুমিও বাইরে থাকো' এই বলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভিতরে চলে গেল। তখন মেয়েটাকে তুলে এনে বারান্দায় শুইয়ে দিই। চারিদিকের প্রতিবেশীরা খবর পেয়ে মজা দেখার জন্য আসতে থাকে···

'আমি কী পাপী। তখনো সেই নিঃসাড় মেয়েটাকে জোরে জোরে মারতে মারতে বললাম কিনা— 'মরে যা, মরে যা তুই।' তারপরে নিজেই নিজের পেটে ও মুখে আঘাত করতে লাগলাম। আশেপাশের লোকেরা এসে সান্ত্বনা দিতে থাকে। আমাদের দুজনকেই বারান্দায় বসিয়ে কফি এনে দেয়, খাবার এনে দেয়। তাতেই তাদের তৃপ্তি। একদিকে অনুকম্পা আর-একদিকে নিজেদের মধ্যে এই কেলেঙ্কারির কথা নিয়ে বলাবলি ও হাসাহাসি করা। গঙ্গা তার হেঁট মাথাটা আর তোলে নি, বন্ধ করা চোখ দুটো বন্ধই রইল। ঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সেই বয়স্থা মেয়েটাকে নিয়ে নিরাশ্রয়ের মতো দুটো দিন বারান্দায় কাটালাম। গঙ্গার এই দুরবস্থার কথা শুনে ছেলে-ছোকরাগুলো সেখানেই ঘুরঘুর করতে থাকে। আমি ওকে

আগলে রাখি। রাগ হলে ওকে বকাবকি করি, মারধোর করি, তারপরে নিজে-নিজেই চোখের জল ফেলি। ভাবি, ওকে নিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিই, তারপরে আমিও ডুবে মরি। অবশেষে··· দিন-দুই পরে··· আমার চিঠি পেয়ে তাঞ্জোর থেকে আমার দাদা এসে আমাদের দুজনকে দেশের বাড়ীতে নিয়ে যায়। দাদার পুণ্যেই মেয়েটা লেখাপড়া শেখে। কলেজে ভর্তি করা, হোস্টেলে রাখা, বইপত্র কিনে দেওয়া, মাইনে জোগানো—সবই দাদার পুণ্যবল। দাদাও যেমন করেছে, মেয়েটাও তার মুখ রেখেছে। যেমন ওর মাথা, তেমনি পড়াশোনা। পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে! সারা তামিলনাডে ফার্স্ট! এখন চাকরি ক'রে বেশ রোজগার করে···

'আমাকে আর আমার মেয়েকে তখন কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়েছে! হে ভগবান, আমার পরম শত্রুর মেয়েও যেন সেরকম কষ্ট ভোগ না করে।

কী-ই বা বয়স তখন! সেই অল্প বয়সে না বুঝে একটা অন্যায় করে ফেলেছে, আজ তার ফলে ওর জীবনটা মাটি হয়ে গেল! এতদিন পরে গঙ্গা যেন আমাকে বোঝাতে চায়, ওর জীবনটা নষ্ট হওয়ার জন্য আমিই দায়ী। ও মুখে আর কী বলবে? গেল সপ্তাহে আমার প্রায় মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা সেই গল্পটা পড়ার পরেই আমার মনটা বড় খচখচ করছে। আজ বুঝতে পারছি—আমিই দায়ী, আমিই ওর সর্বনাশের জন্য দায়ী।

'আমার কিন্তু মনেই হয় নি আমার মেয়েটার জীবন এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। তখন আমার কী আক্রোশ, মা হয়েও মেয়ের ওপর কী ভীষণ আক্রোশ! সেই আক্রোশের ফলে আগুনটা না নিভিয়ে বরং তার ছড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থা করেছি। যেটা লুকোনো উচিত ছিল সেটাকে লুকোবার কথা মনেই জাগে নি। গঙ্গার দেওয়া ওই গল্পটা পড়েই বুঝতে পারলাম যে এরকম একটা ভালো উপায়ও ছিল। অনেকেই সেই উপায় গ্রহণ করে, সেই পথে চলে। এ রকম একটা সঙ্কটের সময়ে মায়ের যে কীভাবে চলা উচিত তার কিছুই আমার বুদ্ধিতে কুলোয় নি বলে আমার মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল। যারা ভুক্তভোগী তারাই বুঝতে পারবে এই গল্পটার মূল্য। আমি তো বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখন আর বুঝে লাভ কী? বোঝার মতো বয়স আমার এতকাল পরে এল! সেদিন গঙ্গা ছিল সতেরো বছরের শিশু আর আমি ছিলাম সাঁইত্রিশ বছরের শিশু।

'কে একটা লোক ওকে গোপনে কোথায় নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে দিল। আর সেই কথাটা রাষ্ট্র করে আমি ওর জীবনটা নষ্ট করে দিলাম। সেদিন ওর চেহারা দেখে আমার বুকে আগুন জ্বলে উঠেছিল। আর সেই রোষে আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি সব ঘুলিয়ে যায় গো!···

'ওই যে গল্পটা, ওতেও দেখলাম মেয়েটা আমার মেয়ের মতোই কী একটা বিশ্রী কাণ্ড করে ঘরে এসে দাঁড়াল। মেয়েটার মা তো রেগে আগুন। গোড়াতে

সেই মা-বেটীও মেয়েটাকে মারধোর করে। বেদম মার। শব্দ শুনে সে বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটেরা ছুটে আসে। মেয়েটা মাটির উপর পড়ে, আর মা তার কাছেই রণরঙ্গিনী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে— এই দৃশ্য দেখে সকলেই জিজ্ঞেস করতে থাকে— 'কী? কী ব্যাপার? কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস তো করবেই। মানুষগুলো, বিশেষ ক'রে দুষ্ট মানুষগুলোর কাজই তো এই।

'গল্পের মা সকলের মুখ বন্ধ করার জন্য বলে উঠল— 'কী আর হবে? এই মুষলধারা বৃষ্টি, এর মধ্যেই ভিজেপুড়ে বাড়ী ফিরছে। যদি একটা অসুখ-বিসুখ হয়?' মা-বেটীর কী বুদ্ধি? কী কৌশলে আসল ব্যাপারটা লুকিয়ে ফেলল!

'হায়! হায়! আমার কেন সেদিন এমন বুদ্ধি হল না? সেদিন যদি অমন একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারতাম, তবে কি আমার মেয়ের জীবনে এত সমস্ত ঘটত? ঘটত না। সেদিন আমিও তো সকলের সঙ্গে মিলে মেয়েটার হেনস্থা করেছি। 'আমিও তো সকলের সঙ্গে' না বলে বলা উচিত, আমিই ওর জীবনটা ব্যর্থ করেছি।

'আহা! গল্পটা যখন পড়লাম, মায়ের ব্যবহার দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। প্রথম তো খুব একচোট মারল মেয়েটাকে। তারপরে কাঁদল কতক্ষণ ধরে। তারপরে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে মাথায় জল ঢেলে স্নান করিয়ে গা-হাত-পা ও মাথা মুছিয়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অনেক উপদেশ দিল। যখন ভাবি, আমি কেন অমন মায়ের মতো মা হতে পারলাম না, তখন বুকটা ফেটে যায়।

'সেই গল্পের এক জায়গায় মা বলছে মেয়েকে :

"কেউ যেন জানতে না পারে, বাছা! যদি কেউ টের পায় আমাদের গোটা পরিবারটা ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রতিবেশীরা মোটেই এ কথা ভাববে না যে, তাদের ঘরেও মেয়ে আছে এবং এমন একটা দুর্ঘটনা তাদের ঘরেও হতে পারে।"

এদিকে গঙ্গার মা কনক মেয়ের বাড়ী ফেরার অপেক্ষায় সদর দরজায় বসে এই বলে বারবার অপেক্ষা করছে— প্রতিবেশীরা আমাদের সর্বনাশ করেছে, ওরাই আমাদের সর্বনাশের জন্য দায়ী।

এমনসময়ে হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। কী একটা অজ্ঞাত ভয়ে কনক উঠে পড়ল। কী ভাগ্য! হাতে একটা ছোট্ট সুটকেস নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল তার বেঙ্গু দাদা।

"দাদা!— এমন অসময়ে যে!" ক্ষুদ্র কম্পাউণ্ডের কাঠের গেটটা খুলতে খুলতে তার দাদাকে অভ্যর্থনা জানাল।

"সকালবেলাতেই এসেছি··· ট্রেনটা লেট ছিল বলে তোদের এখানে না এসে সোজা কোর্টে চলে গেলাম। তারপরে কোর্টের কাজ সেরে এর-ওর-তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।··· গঙ্গাকে দেখছি না যে?" বলতে বলতে বেঙ্গু দাদা বড় ঘরে এসে তার কালো কোটটা একটা চেয়ারের উপর ঝুলিয়ে

ইজিচেয়ারে বসল।

"ও এখনও অফিস থেকে ফেরে নি।"

"রাত আটটা বাজতে চলল।... এদিক-ওদিক খুব ঘুরে বেড়ায় বুঝি? তুই কিছুই বলিস না?" দাদার কণ্ঠস্বরে কেবল কর্তৃত্বই নয়, একটু যেন ক্রোধও মেশানো ছিল।

3

সকলেই জানে বেঙ্গুমামা আদালতের সওয়াল জবাবে বাঘের মতোই ভয়ংকর। আসামীকে জেরা করার ভঙ্গীতে সে একহাতে ওই পত্রিকাখানি নিয়ে আর-একহাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলতে লাগল। মা দাঁড়িয়ে ছিল একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে। আমি রাস্তা থেকে গেট খুলে সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে আসার উদ্যোগ করতেই মায়ের চোখে পড়ে গেলাম।

আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি মামা কী বিষয়ে এত চিৎকার করে কথা বলছে। কিন্তু তার হাতে ওই পত্রিকাখানি এবং তার বিপরীত দিকে দাঁড়ানো মায়ের মুখের ভাব দেখেই বুঝতে আর বাকী রইল না ব্যাপারটা কী। বেশ বোঝা গেল আমার আসার আগে থেকেই এই একই বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করছিল। সেই গল্পলেখক র. কু. ব. সম্পর্কেই একটা অধিবেশন শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

"এর মতো লেখকদের প্রসিক্যুট করা দরকার। এর মধ্যে কী এমন মর‍্যাল্ আছে যে গঙ্গা তোকেও এনে পড়তে দিয়েছে? মেয়ের মাথায় জল ঢেলে দিলেই বুঝি সব শুদ্ধ হয়ে যায়? এরপরে ওই মেয়েটা এক-একবার ওই কর্ম করে আসবে, আর মা এক-একবার ওর মাথায় জল ঢেলে দেবে। আরে, বেশ্যাগুলোও তো রোজ একবার করে স্নান করে, নাকি? তা বলে তো তাদেরকে আর পবিত্র বলা যায় না। পাপকে পাপ, ভুলকে ভুল বলেই স্বীকার ক'রে নিতে হবে। একটা অন্যায় ক'রে এসে সেটাকে ন্যায় বলে চালানো যায় না। এই গল্পে যা লিখেছে, সকলেই যদি এইরকম করতে আরম্ভ করে, তবে কে কাকে বিশ্বাস করতে পারে? তবে তো বিবাহের মতো একটা পবিত্র অনুষ্ঠান একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়ে। গঙ্গা কী ভেবে এরকম একটা বিশ্রী গল্প তোকে পড়তে দিয়েছে শুনি। তোরও বুঝি উচিত ছিল ওর দুষ্কর্মটাকে ওইভাবে গোপন করে রাখা? তুই বললি কিনা তোর মনে একটা গ্লানি জন্মেছে। কেন তোর এই কথা মনে হল? আমি বলছি শোন্, এমন একটা ব্যাপার চেপে রাখা গৃহস্থলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তোর মেয়ের ওপর তোর যতই স্নেহ থাক্, সেদিন তো তোর মনে হয় নি ব্যাপারটা গোপন করার

কথা ? কেন মনে হয় নি ? কারণ ওরকম গোপন করার শিক্ষা তোর নেই।··· তুই মনে করিস লেখক একটি মেয়ের গল্প বলেছে। আমি মনে করি একজন মায়ের গল্প। এই-সমস্ত বিষয় লুকোলেও লুকোনো যেতে পারে— এ কথা ভাবাও মহা-পাপ। তাহলে তো আর ন্যায়-নীতি বলে কিছুই থাকবে না। যে যার খুশিমতো কাজ করে লুকিয়ে ফেলবে। তুমি যে ওই গল্পের মায়ের মতো কাজ করো নি তার জন্য তোমার গর্ববোধ করাই উচিত। তুমি গোপন করো নি বলেই যে তোমার মেয়ের জীবন নষ্ট হয়েছে তা নয়। আর যদি তুমি গোপন করতে তাহলে তোমার পাপ হ'ত— তোমার বংশমর্যাদা নষ্ট করার পাপ, শাস্ত্রীয় বিবাহ কলুষিত করার পাপ। ছোঁয়াচে রোগ হলে সন্তানকেও আলাদা ক'রে রাখতে হয়। গঙ্গার ব্যাপারে তোমার কি মন খারাপ করা সাজে ?···”

আমি সেই থেকে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। এখনো মামা আমাকে দেখতে পায় নি, মায়ের সঙ্গে সে সমানে কথা বলে চলেছে। কেবল তার বাজখাঁই আওয়াজটাই কানে আসছে, একটা শব্দও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এখান থেকে। সদর দরজায় পা দিতেই তার কথার তাৎপর্য মোটামোটি বোঝা গেলেও এখন যে সে কী বলছে কিছু বুঝতে পারছি না। এত চিৎকার ক'রে কথা বলছে কেন ? আদালতে গলাবাজি করতে করতে ওটাই তার অভ্যাস হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে কথা বললেই সে যে ক্রুদ্ধ হয়েছে এ কথা বলা যায় না। ক্রুদ্ধ হলে বরং তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। তার বড়ো সাক্ষী আমার অমুজম্ মামী। কিন্তু মামীকে কিছু জিজ্ঞেস করলেও তিনি মুখ খোলেন না। তবু আজও যখন তার কথা মনে পড়ে, কেমন যেন মনে হয়— আহা বেচারা ! মনে হয় যেন বড়ো গাছের ছায়ায় বেড়ে-ওঠা একটা চারাগাছ। তেমনি বিবর্ণ, তেমনি শুকনো। মামীকে কেউ মাথা উঁচু করতে দেখে নি। হেঁটমুখে সারাদিন কেবল কাজ ক'রে যান। কাজ করতে করতে শরীরটা তাঁর শীর্ণ হয়ে গেছে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দেখলে মনে হয় যেন কবেকার কোন্ অভিশপ্ত দেবী মুখ বুজে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তিরূপে শাপমুক্তির আশায় দিন গুনছেন। কিন্তু আমি তো জানি মৃত্যুর আগে মামীর কখনো শাপমুক্তি হবে না। সেই কথা ভেবেই বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে।

মামার বয়স যখন সত্তর তখন মামীর বয়স ষাটের কাছাকাছিই হবে। কিন্তু এখনো তিনি ছোটো ছেলেপিলেদের সামনে মাথা উঁচু ক'রে কথা বলতে পারেন না। চাকর-বাকরের কাছে কিছু বলতে হলেও তিনি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে কথা বলেন। বাপের বাড়ীর দিকে তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। নিজেরও কোনো ছেলেপিলে হয় নি। মামা নাকি অনেকদিন আগে সন্তান লাভের আশায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিল। কিন্তু সে মামী বিয়ের বছর দু-একের মধ্যে কী একটা মানসিক রোগে মারা যান। তারপরে মামা আর বিয়ে করে নি।

আমার দাদা যেদিন আমাকে ঘর থেকে বের ক'রে দিল, সেদিন আমি ও

আমার মা আশ্রয় পেয়েছিলাম মামারবাড়ীতে। তখন কিন্তু অম্বুজম্ মামী সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল অন্যরূপ। মা তো আজও মামীকে দেখতে পারে না। বলে কিনা— মামী হল জ্যান্ত সাপ। তাঞ্জোরে বেঙ্গুমামার বাড়ীর বাগানে মাঝে মাঝে একটা জাতসাপ দেখা যেত। কেউ তাকে মারত না বলে অনেকদিন সেটা বাগানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করত। লোকে বলত 'গৃহসর্প'। মায়ের কাছে অম্বুজম্ মামীও তেমনি একটি গৃহসর্প। দেখতে-শুনতে ভিজে বেড়ালটি হলে হবে কি, মামী নাকি মহা নচ্ছার মেয়েমানুষ। এক বেঙ্গুমামার মতো লোকই নাকি তাকে শায়েস্তা করতে জানে। মামী নাকি ডাইনী। ছোটো মামী যে অকালে মারা গেলেন তার জন্যও দায়ী নাকি অম্বুজম্ মামী। ছোটো মামীর ওপর সে নাকি কী সব তুকতাক করেছিল। মামার টাকা-পয়সার লোভে যাতে কোনো আত্মীয়-স্বজন তার কাছে এগোতে না পারে অম্বুজম্ মামী সেইজন্য নাকি যক্ষিণীর মতো তাকে আগলে রাখে।

এতসমস্ত কথা আমার মায়ের কাছেই শোনা। এইভাবে বার বার সাবধান ক'রে দিয়ে মা আমাকে তাঞ্জোরে মামার বাড়ীতে রেখে দিন-দুই পরে ফিরে গেল। তখন তো মামীকে আমার ভীষণ ভয়। তিনি যেখানে থাকতেন সে'দিকে কখনো পা বাড়াতাম না। তিনিও তার পিছনের বারান্দা ছেড়ে বড় একটা বাইরে আসতেন না। আমিও তাই ভয়ে ভয়ে মামীকে এড়িয়ে মামার সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম। তখন কি আর জানতাম যে আমি বাঘের পিঠে সোয়ারী হয়ে বসেছি? কথাটা একদিন টের পেলাম অম্বুজম্ মামীর কল্যাণে। সেদিনই প্রথম বুঝতে পারলাম আমাদের বেঙ্গুমামা ক্রুদ্ধ হলে 'ব্যাঘ্র মামা'-র মতোই ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কী ক'রে হ'ল কবে হ'ল, আমি কিছুই জানতাম না। একদিন— মামা তখন বাড়ীতে নেই— আমি বসে আছি বড়ো ঘরের মেঝেতে। হঠাৎ দেখি পিছনের বারান্দা থেকে অম্বুজম্ মামী আমাকে 'খুকী' 'খুকী' বলে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসছেন। আমার চমক ভাঙতেই মনে হ'ল সদর দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যাই। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম, হাতের তালু দিয়ে দেয়ালটা ধ'রে একলাফে ছুটে যাবার জন্য তৈরি।

আমাকে তিনি 'খুকী' বলে ডাকছেন, অথচ এত বয়সেও তিনি নিজে কাঁদছেন একটি শিশুর মতো, মামীর সেই মুখখানার দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তেই আমার এতদিনকার ভয় মুছে গিয়ে করুণার ভাব দেখা দিল। সত্যিই তো, আমি কি ভয় পাওয়ার মতো শিশু নাকি? তা ছাড়া কী কাজ ক'রে কিসের জন্য আমাকে এসে মামাবাড়ীতে আশ্রয় নিতে হয়েছে, সেই কথাটা মনে পড়তেই ভয়ের জন্য আমার হাসি পেয়ে গেল। ভয়টা কিসের? আমার মা ও দাদা আমার ওপর যে অন্যায়টা করেছে, কোনো ডাইনী নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে না, এই ভেবে আমি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলাম— "মামী, কিছু বলবেন?" তিনি

কাঁদতে কাঁদতে, চোখের জল মুছতে মুছতে, চোরের মতো চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন : 'এখানে দাঁড়াতে আমার ভয় করছে ভাগ্নী। তুমি আমার পেছনের বারান্দায় এসো' এই বলেই তিনি দ্রুত চলে গেলেন। আমি দেখে-শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও সাহসে ভর দিয়ে গেলাম। তারপরেই জানতে পেলাম মামী বেচারীর দুঃখের কাহিনী। অতঃপর এমন হ'ল যে মামা বাড়ীতে না থাকলে আমি সর্বদা মামীর কাছে গিয়েই কথাবার্তা বলতাম। কোনোদিন কারও কাছে যে-সব কথা তিনি বলতে সাহস পান নি, সেই-সব গোপন কথা আমাকে শোনাতেন। মামার এ-সব কথা আর কেউ জানে না, বললেও লোকে বিশ্বাস করবে না, এমন-কি তার পরমশত্রুরাও বলবে 'ছি ছি ! এ-সব কী মিথ্যা কলঙ্ক !' মামার সেই গোপন কথা, তার প্রকৃতির বিকৃতিগুলো আমি জানলাম। তারপর থেকে মামাকে দেখেই আমার মনে হতে লাগল— এ মানুষ নয়, বাঘ। মামা-বাড়ীটাকে মনে হতে লাগল যেন বাঘের গুহা।···

ওই তো মামা ঘরের মধ্যে। আমি তার দিকে তাকিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। দেয়ারে ওই তার কালো কোট। ইজি চেয়ারে ঝুলে আছে তার শার্ট। গায়ে শুধু গেঞ্জি, কোমরে সেই ভয়ংকর বেল্ট। সে যে কত ভয়ংকর, জানেন কেবল অম্বুজম্ মামী।

একদিন মামী আমাকে দেখিয়েছিলেন তার পিঠে, বুকে, উরুতে, কাঁধে, ঘাড়ে— সমস্ত শরীরে এই বেল্টের প্রহারের চিহ্ন ফুটে রয়েছে। বাঘ যেমন নখ আঁচড়ায়, তেমনি। ক্রুদ্ধ হলেও 'ব্যাঘ্র মামা' বেছে বেছে এমন জায়গায় আঘাত করে যাতে তার দাগগুলো বাইরের লোকের নজরে না পড়ে। 'এই দেখো রক্ত চোয়াচ্ছে, কালকের মার। গেল সপ্তাহে মেরেছিল, এই দ্যাখো নীল দাগ হয়ে আছে। তার আগেকার দাগগুলো কালো হয়ে গেছে···।'

মামী সতর্ক করে দিলেন— 'কাউকে বোলো না কিন্তু ভাগ্নী। আমি ভাবছিলাম কেউ যেন না জানে। একদিন যখন আমায় চিতায় ওঠাবে, সেদিন আমার নতুন কাপড়টা সরিয়ে ফেলার সময়ে কেবল শ্মশানের মুদ্দোফরাসের চোখেই পড়বে, আর কারো নয়— এই কথাই ভেবে আসছি এতদিন। আজ কী জানি তোমার কাছে বলে ফেললাম। তুমি কিন্তু কাউকে বোলো না, আমার কাছে দিব্যি করো।'

সেদিন মামীর কাছে দিব্যি করেছিলাম, আমি কারো কাছে বলব না, বলা সম্ভব নয়, বলা উচিতও নয়। শুধু মামীর কাছে দিব্যি করেছি বলেই নয়, আরও কারণ আছে। মামা আমাকে যে সাহায্য করেছে, আমার আশ্রয়হীন অবস্থায় স্বেচ্ছায় গিয়ে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে যে উপকার করেছে, আমার লেখাপড়ার জন্য মুক্তহস্তে যে অর্থ ব্যয় করেছে, কলেজ হোস্টেলে থাকার সময়ে, তারপরে এই চাকরীজীবনে মাঝে মাঝে এসে যে স্নেহ-ভালোবাসা দেখিয়েছে— এই-সমস্ত ভেবে দেখতে গেলে মামার গোপন দুর্বলতাগুলো লোকসমক্ষে প্রচার করা আমার পক্ষে

মহাপাপ। আমি তা করতে পারি না, করা উচিত নয়।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে আমার এই মামা একটা বাঘের তুল্য ভয়ংকর ব্যক্তি। এই বাঘের কাছে সাবধানে থাকতে হবে। মামী আমাকে এই কথাই শিখিয়েছেন।

আমি যে সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি, মামা এখনো তা দেখতে পায় নি। এই তো কিছুক্ষণ হ'ল আমি এলাম। তার চিৎকার ক'রে বলে ওঠা ওই একটি বাক্য শেষ হওয়ার মধ্যেই পুরোনো দিনের এতগুলো কথা আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল।

হাতের পত্রিকাটা মামা এমনভাবে উঠাচ্ছে-নামাচ্ছে যেন সেই গল্পটা এবং সেই গল্প-লেখকের যুক্তি-তর্ক... প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়ে খণ্ডন করার কাজেই সে ব্যস্ত। এমনসময়ে কোমরের বেল্টটা খুলতে গিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকাতেই আমাকে দেখে ফেলল।

মামার মুখখানা ঠিক বাঘের মতো। হটো কানের ওপর তারের মতো মোচড়ানো লম্বা লম্বা লোম, ভুরু দুটোতেও ঘন বর্ধিত দীর্ঘ রোমরাজি গিজগিজ করছে। তার চোখের দৃষ্টিও বাঘের মতো ভয়ংকর। বাঘটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমিও হাসলাম। কিন্তু আমি জানি এই বাঘের কবল থেকে আমার আত্মরক্ষা করাও দরকার। গত দশ বছর ধরে এই সার্কাস চলে আসছে। বাঘকে পোষ মানানোই সার্কাস নয়, বাঘকে দিয়ে খেলা করাও সার্কাস।

মামা এতক্ষণ ধরে যে গলায় কথা বলছিল, আমাকে দেখেই তার সেই 'টোন' নরম হয়ে এল।

'এসো... এসো...' বলে যেন কোনো হামাগুড়ি দিয়ে চলা শিশুকে ডাকছে এইভাবে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার মা যখন শিশু, তখন এই মামা ছেলেপেলের বাবা হলেও হতে পারত। মামার বয়স দিয়ে তাকে বিচার করা ঠিক হবে না। তার বয়সটা হ'ল প্রতারণার কৌশল, একটা আড়াল মাত্র। সে নিজেই নিজের স্ক্রীন্। বাইরে থেকে কিছুটি বোঝার উপায় নেই। তার চেহারা, বক্তৃতা, সদালাপ, শাস্ত্রজ্ঞান, সংস্কারে বিশ্বাস— এই-সমস্ত দেখে-শুনে সঙ্গে সঙ্গেই বহুলোক তার চরণাশ্রিত হয়ে পড়ে। এ-সমস্ত সত্য, কিছুই মিথ্যা নয়। আমি নিজের কানেই শুনেছি চর্দাস্তু তেবনমার সম্প্রদায়ের লোকগুলো যখন নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়, তখন মীমাংসার জন্য তারা বলে— 'চলো যাই বেঙ্কট্ রামৈয়র-এর কাছে।' মামার বাগ্মিতার গুণে হত্যাকারী নির্দোষ বলে সাব্যস্ত হয় এবং নির্দোষ ব্যক্তি প্রমাণিত হয় হত্যাকারী রূপে। তার ইংরেজিতে জজরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যায়। তাঞ্জোরের 'সরস্বতী মহালে' যে-সব সংস্কৃত পণ্ডিতের পদধূলি পড়ে, তারা সব আশ্রয় নেন বেঙ্কুমামার গৃহে। তাদের সঙ্গে মামার কথাবার্তা চলে সংস্কৃত ভাষায়। এ-সমস্ত আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা তাকে জানে, এসব কথা তাদের অবিদিত নেই।

কিন্তু তার সত্তর বয়সের আড়ালে যে কী ধরনের একটা লোক লুকিয়ে আছে তা বোঝা শক্ত। আমার প্রতি তার আচার-আচরণ দেখে বাইরের লোক মনে করবে, ঠাকুরদা তার নাতনীকে আদর করছে। কিন্তু সেই বাৎসল্যের আড়ালে যে কত বড়ো একটা দুর্বৃত্ত রয়েছে কে বুঝতে পারে? বাসের মধ্যে যে শয়তানটা বার বার আমার গায়ে এসে পড়েছে, তার চেয়েও বড়ো শয়তান। গাড়ীতে আমায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল যে লোকটা তার চেয়েও বড়ো উওম্যান হাণ্টার। এ-সব কথা অবশ্য আমার প্রকাশ্যে বলা সাজে না। বললে আমার গর্ভধারিণীও আমায় বিশ্বাস করবে না! কিন্তু আমি তো জানি এই ব্যাঘ্রমামার প্রতি যেমনি আমার কৃতজ্ঞতা, তেমনি রয়েছে ভীতি।

জীবনে একটা ভুল ক'রে ফেলেছি, সেই গল্পের মুখপোড়া বেড়ালের মতো একবারই করেছি। দ্বিতীয়বার আর কি করি? একজনের ছলনার জালে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম, প্রতারিত হয়েছিলাম, কিন্তু সত্যই কি তাই? আমার নিজের কি কোনো দোষ ছিল না? জোর-জবরদস্তি ক'রে সম্মত করলেও, ঘটনাচক্রে হোক, দায়ে পড়ে হোক সম্মতি তো দিয়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা হওয়ার পর থেকে যে-কোনো পুরুষ মানুষকে দেখলেই আমি না ভেবে পারি না যে লোকটা আস্ত একটা শয়তান।

কিন্তু সেই দুর্দিনে নিরুপায় হয়ে মামার বাড়ীতে গিয়েই আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখনই তার ব্যাপার-স্যাপার দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে পুরুষদের সম্পর্কে আমার ধারণাটা কিছুমাত্র ভুল নয়।

ভাগ্যিস! অনুজম মামী আগে থেকেই আমাকে বলে দিয়েছিল 'সাবধান, বাঘের হাত থেকে সাবধান।' মামী যদি সতর্ক ক'রে না দিতেন, তাহলে? তাহলে কী হ'ত? সারা দেহে আর-একবার কাদা মাখামাখি হয়ে যেত। আমার যাই ঘটুক-না-কেন, একবার নিতান্ত বোকার মতো মায়ের কাছে বলে মুশকিলে পড়েছিলাম, আর একবার সেই কাজ? কখনো নয়।

কাজেই মামাকে একটা জ্যান্ত বাঘ বলে মনে হলেও সে কথা আর মায়ের কাছে বলি নি। সে-রকম কোনো বোকামির চিন্তা মাথায় এলেই আমার মনে পড়ে যায় পুরোনো দিনের কথা। মানুষ যেমন ভগবানের কাছে পাপ স্বীকার ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তেমনি কত বিশ্বাস ও ভরসায় আপন ভেবে সেদিনকার ঘটনা বলেছিলাম। সেই কথা সারা পাড়ায় রটিয়ে মা আমার সেই বিশ্বাসকে কী ভাবে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে।

বলার পর-মুহূর্তেই মনে হ'ল 'না বললেই ভালো হ'ত'। সেইদিন সেই-মুহূর্ত থেকেই 'আমরা মা ও মেয়ে' এই নামমাত্র সম্পর্ক ছাড়া স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি সবকিছু ধুয়ে মুছে গেছে। তারপর থেকে আর মায়ের সঙ্গে কথাই বলি নি। আজ কি মামা-চরিত্রের রহস্য প্রকাশের জন্য মায়ের সঙ্গে আপস করব?

এইসমস্ত ব্যাপারে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না। যার যার বুদ্ধিই এখানে পরম সহায়ক। সেদিনকার সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় এই বাঘের সাহায্য সহানুভূতি আমার খুবই দরকার ছিল। কারণ, আমি সেদিন মরতে চাই নি। মনে হয়েছিল মরাটা অন্যায়। দাদা, রাস্তায় বের ক'রে দিল, মা সমুদ্র-তীরে নিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দিতে বলল— তখন মামাই এসে বলল— ওকে তিরুচি-তে নিয়ে কলেজে ভর্তি ক'রে দেব।

সেদিন আমার মনে হয়েছিল— এই বাঘের শিকার না হয়ে কী ভাবে এর সঙ্গে চলাফেরা করতে হয় তাই শিখতে হবে। মেলামেশা না ক'রে চলবে না, কিন্তু ঠকাও চলবে না। ব্যাঘ্রমামাকে ভালোই বলতে হবে। পিঠে হাত বুলিয়ে, পোষ মানিয়ে, মিলেমিশে এই বাঘের পিঠে চড়ে সওয়ারি হয়ে বসতে হবে। তার শিকার হলে চলবে না। কোনো কোনো সময়ে এই মামা বাঘের মূর্তি ধারণ করে, তখন তাকে খাঁচার পুরে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেওয়া দরকার। কোনো কোনো মানুষ কখনো কখনো অমনই হয়। যখন হয় তখন তারা নিজেদের দুষ্কর্মের কৈফিয়তও খুঁজে বার করে। ঠিক সেইভাবে মেয়েদেরও উচিত ওদেরই মতো একটা বাহানা করে, আসল রূপ লুকিয়ে ছদ্মবেশ নিয়ে সেই সেই সময়ে সেই সেই মানুষের কবল থেকে বেরিয়ে যাওয়া। এই বারো বছর ধরে— আমিও তেমনি মামার হাত এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছি।

এবার বুঝি বাঘের খপ্পরে পড়ে গেলাম।

'এসো এসো' বলে মামাই এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল— 'হোয়াই আর ইউ সো লেট্? অফিস থেকেই সোজা বাড়ি আস তো? অন্য কোথাও যাবে না। পাঁচটা বাজলো কি ফাইল-টাইল রেখে বেরিয়ে পড়বে। ইউ মাস্ট হ্যাভ ডেফিনিট আওয়ারস ফর এভরিথিং, কেমন? এত ঘণ্টা অফিসে থাকবে, এতটার সময়ে বাড়িতে ফিরবে। একসঙ্গে তাড়াহুড়ো ক'রে অত কাজ করার দরকার নেই। শরীরটা টিকবে কী ক'রে? দশটার সময়ে বাড়ী থেকে খেয়ে যাও। দুপুর বেলায় কী খাও?' এই কথা বলতে বলতে মামা যেন আমাকেই গিলে খাবার জন্য সমস্ত পিঠটার ওপর দলাই-মলাই করতে লাগল। কাঁধ ও বাহু দুটোও বাদ গেল না। আমি যথাসম্ভব দেহটাকে মুচড়ে-মুচড়ে তাকে উত্তর দিলাম—

'দুপুরবেলার টিফিন ঘোলভাত।'

মামা এমনভাবে হো হো করে হেসে উঠল যেন আমি একটা ভীষণ হাস্যকর কথা বলে ফেলেছি। 'বেশ বুঝলাম! ঘোলভাত নিয়েই বাড়ি থেকে যাও। তোমার মা তোমার জন্য আর কীই-বা তৈরি করে দেবে? কিন্তু তুমি এখন বড়ো অফিসার! এখন কী পোস্ট? সেকশান অফিসার? তোমার লজ্জা করে না টেবিলের উপর রেখে ঘোলভাত খেতে? তা বলে আমি বলছি না যে অফিসের বেটাছেলে-

গুলোর সঙ্গে গিয়ে তুমি ক্যানটিনে দাঁড়াবে। ইউ ক্যান সেণ্ড ইওর পিওন। আজ বিকেলে কফি-টফি কিছু খেয়েছ ?'

এই বুড়ো লোকটা কিসের জন্য এভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে মোচড়াচ্ছে ? আমি রাগে জ্বলে উঠলাম।

যখন নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিলাম, এই বৃদ্ধ স্নেহ-ভালোবাসা দেখিয়ে লেখা-পড়ার ব্যবস্থা ক'রে···

আমার কান্না আসছে। কোনোমতে সামলে নিয়ে তার উত্তরে শুধু 'না' বলে তার হাত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলুম না। এবারে আমার গাল দুটো ধরে ডলতে আরম্ভ করে— 'এককাপ কফিও খাও নি ? এ ভাবে টাকা বাঁচিয়ে কী করবে ?'

'উঃ, ছাড়ুন··· লাগছে, মামা···' এই বলে চিৎকার করে উঠি। আমার চোখে জল এসে যায়।

এইসমস্ত কাণ্ড দেখে মা যে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট তা মনে হয় না।

'কনক, গঙ্গা ও আমার জন্য ভালো দেখে দু'কাপ কফি তৈরি করে দে তো।'

'ছাড়ুন মামা, আমিও গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ ক'রে আসি।' এই বলে তার কবল থেকে ছাড়া পেয়ে গেলাম।

'এই গঙ্গা শোন্··· কপাট বন্ধ করিস নে··· আমিও আসছি তোর ঘরে।'

'যান মামা···', আমি সলজ্জভাবে ছুটে গেলাম।

ঘরের মধ্যে এসে কপাট বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বেহায়া দুর্বৃত্তের কথা ভাবতে ভাবতে আমার চোখে জল এসে গেল। চোখের জল— সে তো মানুষের অশুদ্ধ অপবিত্র জল !

4

পরদিন ভোরে মামা ও আমি বেরিয়েছি মর্নিং ওয়াকে। আমার এই ভ্রমণের অভ্যাস পেয়েছি মামার কাছ থেকেই।

তাঞ্জোরে থাকার সময়ে মামার জন্যই বেড়াতে বেরোতাম। তখন খুবই বোরিং লাগত। ভোর পাঁচটার সময়ে মামা উঠে আসত। ঢিলে-ঢালা জামা ইজার পরে আমি যেখানে ঘুমিয়ে থাকতাম, সেখানে এসে ওয়াকিং স্টিক দিয়ে একটু একটু মৃদু আঘাতে আমাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করত— 'এই গঙ্গা ওঠো, ওঠো। মেয়েমানুষের এত ঘুম।'

মামার আওয়াজ কানে যেতেই আমি ধড়মড় ক'রে উঠে পড়তাম।

তাড়াতাড়ি ক'রে হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে এসে দেখতাম, মামা ছড়ি হাতে নিয়ে সামনের উঠোনে পায়চারি করছে। প্রথম প্রথম আমার খুব গর্ব হ'ত এই-ভেবে যে, এত বড়ো একটা লোক আমাকে তার সঙ্গী মনে করে আমার জন্য এতক্ষণ এইভাবে অপেক্ষা করছে। আমি না থাকলে মামা একা একাই বেড়াতে যেত ভেবে আমার একটু দুঃখও হ'ত। আবার এও মনে করতাম যে তার নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য আমি সঙ্গী হিসেবে এসে পড়ার ফলে মামার মনে বেশ একটু আনন্দও দেখা যাচ্ছে। তারপরে ধীরে ধীরে সেই ব্যাপারটাই আমার কাছে খুব বিরক্তিকর বলে বোধ হতে লাগল।

মামাদের বাড়ীটা পশ্চিম সড়কের এককোণে। সেখান থেকে রওনা হয়ে কেল্লার পাশ দিয়ে মোড় ঘুরে হসপিট্যাল রোড ধরে বড়ো মন্দিরের রাস্তা দিয়ে নদীর নতুন পুল পর্যন্ত যেতাম। ফেরার সময়ে আসতাম শিবগঙ্গা পার্কের রাস্তা ধরে। কোনো কোনো দিন এইদিক দিয়ে ফিরে চেপ্পন্না লেক ঘুরে আসতাম। মর্নিং ওয়াকের সময় এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন রুটে যাতায়াত করতাম। সান্ধ্যভ্রমণের সময়ে বড়ো মন্দিরে গিয়ে, মন্দির প্রদক্ষিণ করে, শিবগঙ্গা পার্কে এসে পার্কটার কোণের গাছটা পর্যন্ত যেতাম। ওখান থেকে নীচের দিকে তাকালে শিবগঙ্গা দীঘিটা চোখে পড়ত। বটগাছটার চারিদিকে বাঁধানো বেদীতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে কাটাতাম। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সেখানেই কাটাতাম।

এইসমস্ত সময়টা মামা যত কথা বলত, যত প্রশ্ন করত, যত গল্প করত, কেবলই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিত সেদিনকার সেই লোকটার কথা যে আমাকে তার গাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। পথচারীদের মনে হ'ত এরা বুঝি দুই দাদু-নাতনী বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। মামা যে কথা দিয়েই আরম্ভ করুক-না-কেন, শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছত সেই বিষয়টিতে।

'তোমাকে ডাকা মাত্রই তুমি হ্যাঁ বলে গাড়ীতে উঠে বসলে?'

'উঁহু, প্রথমে আমি মোটেই রাজী হই নি। স্পষ্ট 'না' বলে দিয়েছিলাম।'

'সত্যি সত্যি বলেছিলে, না একটু মুখের কথামাত্র?'

'আমার ভয় হচ্ছিল বলে সত্যি সত্যি 'না' করেছিলাম।'

'তারপরে তোমার ভয়টা কী করে দূর হয়ে গেল।'

'শেষপর্যন্ত সেই ভয়ের ফলেই গাড়ীতে উঠলাম।'

'তাকে খুব ভালো লাগছিল তোমার, না?'

'সে-রকম কিছুই নয়, মামা?'

'তাহ'লে ভয়ের জন্য কেন উঠতে গেলে?'

'বৃষ্টি হচ্ছিল যে।'

'খুব ভালো বৃষ্টি, না? ভিজে একেবারে জুবজুবে, কী বল খুব ঠাণ্ডাও লাগছিল তখন। সেই ঠাণ্ডায় যদি কেউ এসে (এই কথাটা বলার সময় মামার

গলাটা গোপন কিছু বলার জন্য ফিসফিস করছিল। মুখে তার হাসি। চোখটাও একটু টিপল। আমার কাঁধের ওপর রাখা হাতটা বেশ জোরে চেপে ধরল। আমার কান্না পাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও) সেই ঠাণ্ডায় যদি কেউ এসে জাপটে ধরে তাও মন্দ হয় না, এইরকম লাগছিল, না ?'

আমার মুখে কোনো উত্তর যোগাতো না। বুকটা যেন শুকিয়ে যেত, গলাটা ধরা-ধরা লাগত। মামা আমার কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলত— 'কী, কথা বলছ না কেন ? তোমার বেশ ভালোই লাগছিল তখন, অ্যাঁ ?'

'না মোটেই ভালো লাগে নি।'

'মিথ্যে কথা বোলো না। তোমার ভালো না লাগলে ও রকম হতে পারে না।' তখন আমি ভাবতে শুরু করলাম। ভাবতে গিয়ে মামার ওপর আর শ্রদ্ধা-ভক্তি রইল না। প্রকাশ্যে যাকে 'আপনি আজও বলি' মনে মনে তাকে 'তুই-তোকারি ক'রে ডাকা শুরু করি। 'এই যে এতক্ষণ ধরে তুই যা বলছিস, যা করছিস এ-সব আমার কিছুমাত্র ভালো লাগছে না আমাকে তুই টেনে টেনে জড়িয়ে, গাল দুটো দলে-মলে, উরুটা চটকে চটকে··· ইচ্ছে করে, হার্টফেল ক'রে এখনই মরে যাই। তবু তো সহ্য ক'রে আছি, একটা বুদ্ধিশুদ্ধিহীন হাবাগোবার মতো চলাফেরা করছি, বেড়াচ্ছি, দাঁত বের ক'রে কৃত্রিম হাসি হাসছি, 'মামা মামা' বলে আদর ক'রে ডাকছি··· এর চেয়ে তা অনেক ভালো ছিল।··· তোর যদি এই বুড়ো বয়সেও মনে হয় যে একটা ঘাটের মড়ার উপর আমার টান জন্মাবে তাহ'লে সেই যুবক ছেলেটির মনে কি সেই আকাঙ্ক্ষা জন্মাতে পারে না ? তোকে আমার পছন্দ হতে পারে এই বিশ্বাসই যদি মনের কোণে জাগে, তবে তো এ কথাও ভাবা উচিত যে সেই যুবক ছেলেটিকে আমার পছন্দ হবে না কেন। তাকে আমার ভালো লাগলেও তোকে আমার একটুও ভালো না, লাগতে পারে না। বুড়ো পিশাচ সরিয়ে নে তোর হাত আমার কাঁধের ওপর থেকে।' ইচ্ছে করে, একটি একটি ক'রে কাটা কাটা কথাগুলো শুনিয়ে দিই। কিন্তু আমার সমস্ত কথাই হজম করতে হ'ল, একটিও বলা হল না। গলাটা তাই ধরা-ধরা লাগছে, বুকটা যেন শুকিয়ে গেছে।

কোনো কোনো সময়ে মামা উপদেশের ভঙ্গীতে কথা বলত। বলত, এই যে আমাদের শাস্ত্রসমূহ, আমাদের জীবনচর্যার ধর্মসমূহ, এগুলির ভিত্তি হ'ল নারী-জীবনের সদাচার। স্বাভাবিকভাবেই নাকি ওই সমস্ত বিষয়ে নর-নারীর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পুরুষ তার নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী এক পত্নী নিয়েও থাকতে পারে আবার বহু বিবাহও করতে পারে। কিন্তু রমণী কেবল এক-জনের পাণিগৃহীতা হয়ে তার প্রতিই একনিষ্ঠ হয়ে থাকবে, এ ছাড়া নাকি অন্য পথ নেই। এর অর্থ এই নয় যে মেয়েরা পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট, মেয়েরা উন্নত গৌরবের অধিকারিণী বলেই তো তাদের অমন সতীসাধ্বী হয়ে থাকা প্রয়োজন।

এইসমস্ত কথা বলার সময়ে মামা মনুসংহিতা, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে নানা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করত।

মাঝে মাঝে তার কথা শুনতে বেশ ভালো লাগত। তার যুক্তিতর্ক সমস্ত লজিক্যাল। তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করার ইচ্ছাও মনে যে জাগত না তা নয়। কিন্তু আমি কখনও জিজ্ঞাসা করি নি।

তার চিন্তা-ভাবনার কথা আমি ভালো করেই জানতাম। জানতাম তার বাক্‌চাতুরী। কাজেই যে-সমস্ত প্রশ্ন আমার মনে উঠেছিল অথচ সেগুলো আর জিজ্ঞাসা করা হয় নি, সেই প্রশ্নগুলো যদি করতামও, তবে সে যে তার উত্তর দিত, সেই উত্তরগুলোও আমার প্রশ্নগুলোর মতোই আমার মনে জেগেছিল। কাজেই তাকে আর জিজ্ঞাসা করা হয় নি। তার প্রয়োজনও ছিল না।

তবে একবার তাকে প্রশ্ন করেছিলাম। কারণ আমার মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, তার উত্তর আমি খুঁজে পাই নি। ভেবেছিলাম এ প্রশ্নের জবাব দিতে সে পারবে না। 'আপনি বলেছেন না, মেয়েদের কাজ হ'ল এক পুরুষের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া ? মহাভারতে যে দ্রৌপদী পঞ্চপুরুষের স্ত্রী ছিল, সে কথাটা আমাদের শাস্ত্র কী ভাবে মেনে নিল ?'

'আমাদের শাস্ত্রে দ্রৌপদীর ব্যাপারটাকে মেনে নেওয়া হয় নি। হয় নি বলেই ব্যাপারটা বদ্‌লে গেছে। তুমি আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ ? এই কনটেক্সট-এ কুন্তীদেবীর কথা মনে ওঠে নি কেন ? বলছি শোনো। যাদের পুত্র-লাভের সৌভাগ্য হয় নি, তারা ওভাবে পুত্রলাভের অধিকারিণী। এই হ'ল প্রকৃত তাৎপর্য। এ নয় যে কুন্তী অত লোকের পত্নী ছিল। আরও আগে দেখো, পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র তো ভগবান ব্যাসেরই দান। ইতিহাস থেকে আমাদের নিতে হবে আসলটুকু, কতগুলো ঘটনা নিয়ে লাভ নেই।' এইসমস্ত বিষয়ে মামা কথা বলতে আরম্ভ করলে আমার মনে হত, কেন তাকে ও কথা জিজ্ঞেস করতে গেলাম। ওই কারণেই তাকে আমি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম না।

মামা যে ব্যাখ্যা করত তা কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও। পশু, পাখী গাছপালা সকলেই যেন তার সমর্থনে এসে সারি সারি দাঁড়িয়ে যেত। মামা বলত, যেখানে দশটা মুরগীর বাস, সেখানে একটা মোরগই যথেষ্ট। মোটকথা, তার বক্তব্য হ'ল— পুরুষের পক্ষে এক ধরনের নীতি এবং মেয়েদের পক্ষে অন্য ধরনের— এটা খুব যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই।

কোনো কোনো সময়ে মামা আমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করত। কিছুমাত্র দয়া, অনুকম্পা বা সৌজন্যের বালাই না রেখে এইভাবে কথা আরম্ভ করত— 'এই ধর, তোমার মতো নষ্ট হয়ে যাওয়া মেয়েদের পক্ষে···।' তার এইভাবে কথা বলাটা যেন কিছুমাত্র অন্যায় নয় ভেবে আমিও মাথা নিচু করে সব শুনে যেতাম। কিন্তু তার একটা কথা— ওই একটা কথাই— আমি জীবনকে মন্ত্রের মতো ক'রে গ্রহণ

করেছি ; 'গঙ্গা তুমি যদি এবারে নিজেকে আর নষ্ট না ক'রে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে চাও তবে আর বিয়ের আশা কোরো না, এই আকাঙ্ক্ষা রেখো না যে আর একটি লোক এসে তোমার পাণিগ্রহণ করবে। বরং তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো।' মামা আরও বলছিল : 'মুর্খেরা বলে কী জানো ? তোমাকে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া দরকার, নয় তো আগুনের সেঁকা দেওয়া। বেঁচে থাকার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একটা কথা। কুমারী মেয়েরূপে বাঁচবার অধিকার নেই। আমাদের শাস্ত্র ও ধর্ম অনুসারে সংসারজীবনেও তোমার কোনো অধিকার নেই।'

অবশেষে তার কথাবার্তা পুনরায় সেই বহু পুরাতন বিষয়ে এসে পৌঁছল। মামা যখন সেই বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করে, মনে হয় সেদিনকার সেই ব্যাপারটা যেন কল্পনায় সে তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। দেখতে দেখতে তাতেই যেন লীন হয়ে যাচ্ছে। যেন সেদিনকার মতোই সে আমার বস্ত্রহরণ ক'রে নিচ্ছে ভেবে আমার সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে আসছে। সেদিনকার সেই যুবকটির স্থানে নিজেকে বসিয়ে মামা যে আনন্দ পাচ্ছে তার জন্যই মাঝে মাঝে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করার বিরাম নেই। তাতেই তার পরম সুখ এবং সেই সুখের নেশায় তার চোখ দুটি নিমীলিত হয়ে আসে।

'ছেলেটা কে তা তুমি জানতে না ?'

'উঁহু···।'

হঠাৎ সেই ছেলেটার ওপর ঈর্ষা এবং আমার ওপর ক্রোধ জন্মাবার ফলে মামার মুখের চেহারাটা বদলে গেল। 'বুঝতে পারছ কি স্বভাবের দিক থেকে তুমি কত ছোট ? কেন বলছি জানো ? একটা অজানা লোকের কাছে তুমি কী-ভাবে অত সহজে সম্মতি দিলে ?' এইভাবে যখন সে আমায় জেরা করছিল, তখন আমার মনে হ'ল, যে দাদা ঘাড় ধরে আমায় ঘরের বার ক'রে দিয়েছিল এবং যে মা সমুদ্রতীরে নিয়ে আমায় ফেলে দিতে চেয়েছিল, সেই দাদা ও মা মামার চেয়ে অন্তত ভালো. অনেক ভালো।

'ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখলে সেই নাম-না-জানা লোকটাই তোমার স্বামী। তোমার বিবাহ, পারিবারিক জীবন প্রভৃতি সেই গাড়ীর মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। তোমার যদি আবার বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন গড়ে ওঠে, তবে ওই লোকটার সঙ্গেই হবে। সেইরকম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সে কি তোমায় বিশ্বাস করবে ? সে কি তোমার সম্পর্কে এইকথাই ভাববে না যে যেন কেউ এসে গাড়ী থামিয়ে তোমার হাত ধরে টান দিলেই তুমি তার সঙ্গে চলে যাবে ? সে যদি সে-রকম মনে করে তবে তার মনে করাটা যে ভুল একথা বলার মতো যুক্তি তোমার আমার কী আছে ? বলো দেখি। কাজেই বিয়ে-টিয়ে তোমার জীবনে আর হবে না। ও সমস্ত আশা তুমি ত্যাগ করো।'

মামার সঙ্গে বেড়াবার সময় সে যে কত কথা বলে, তার সমস্ত কথাই বাজে ও বিরক্তিকর। যাই হোক, আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার কথা সে বলেছে তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সে যে মনোভাব নিয়েই বলুক-না-কেন, তার কথা থেকে আমি নিজেকে বুঝতে পারি, এই পৃথিবীকে ও সংসারকে এমন কি মামাকেও বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে সে খুব খোলাখুলি ভাবেই বলে— 'তুমি কোনো ব্যক্তির উপপত্নী হয়ে থাকতে পারো, কিন্তু কারও পত্নী হতে পার না।' কথাটা একটু মার্জিত ইংরাজিতেই বলে— 'ইউ ক্যান বি এ কনক্যুবাইন টু সাম ওয়ান বাট নট এ ওয়াইফ টু এনি ওয়ান। তুমি যদি এইভাবে সমাজজীবন থেকে আলাদা হয়ে বসো, তাতে তুমি নষ্ট হয়ে গেলেও আমাদের শাস্ত্র ও ধর্ম নষ্ট হবে না। এইটুকুই তোমার পুণ্য।'

এই কথাটার আসল অভিপ্রায় কী তা আমি জানি। 'হোয়াই নট ইউ বি মাই কনক্যুবাইন?' মামাকে ভালো লোকই বলতে হবে, কারণ এ পর্যন্ত সে আমাকে সোজাসুজি কথাটা বলে নি। যে-কোনো মুহূর্তে সে এইরকম একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে বলে আমি সর্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি। ও রকম কোনো প্রশ্ন-ট্রশ্ন না করেই আমার কোনো আত্মমর্যাদার বালাই না রেখেই সে যদি আমার ওপর বলাৎকারের চেষ্টা করে?

তা সে করতে পারে। এই ব্যাঘ্রমামার ক্ষুধা ও রুচি দুটিই সেই ধরনের। সে রকম একটা অবস্থা যদি মামা কখনো তৈরি করে তবে তার থেকে নিষ্কৃতি লাভের কৌশলও আমার জানা আছে। আমি সেই কৌশল শিখেছি মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা থেকে। নারীজাতির উদ্দেশ্যে তার বক্তৃতার শেষ কয়েকটি লাইন লাল কালিতে আণ্ডারলাইন করে, আমি সেটা মামার টেবিলে এনে রেখে দিয়েছিলাম। গান্ধীজীর কথাগুলি এই: 'আমি মেয়েদের উদ্দেশ্যে এই কথাটি বলতে চাই— যদি কেহ কখনো বলপ্রয়োগ ক'রে তোমার সতীত্বের মর্যাদা নষ্ট করতে উদ্যত হয় আমি তোমাকে অহিংসার উপদেশ শোনাব না। তখন তুমি যে-কোনো অস্ত্র ব্যবহার করতে পারো। আর যদি তখন তোমার হাতে কোনো অস্ত্র না থাকে প্রকৃতিদত্ত নখ ও দাঁত তো তোমার আছে। এই অবস্থায় তুমি যদি দুর্জনকে হত্যা করতে পারো তাতে কোনো পাপ নেই, হত্যা করা সম্ভব না হ'লে দুর্জনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদি আত্মহত্যা করো তাতেও কোনো পাপ নেই।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বেড়াবার সময়ে এই নিয়ে মামা বেশ শান্তভাবে বলল: 'তুমি এই বইখানা পড়লে বটে, কিন্তু বড় দেরি করে পড়েছ। কথাগুলো এক অর্থে ঠিকই তোমার ওপর যে বলপ্রয়োগ করবে কথাগুলো তার সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিন্তু সেই লোকটা কি তোমার ওপর জবরদস্তি করেছে বলতে চাও? তোমার মতো মেয়ের ওপর কেউ জবরদস্তি করতে পারে না।'

মামার কথাগুলো সত্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সে নিজেই নিজের কথায় বিশ্বাস করে কি না সন্দেহ। কাজেই এই মুহূর্ত পর্যন্ত সে আমার ওপর কোনো বল-প্রয়োগের চেষ্টা করে নি। যদি করত, আমি কিন্তু গান্ধীজীর উপদেশমতে.. না পারতাম হত্যা করতে, না পারতাম আত্মহত্যা করতে। কোনো একসময়ে কী একটা ভয়ের আশঙ্কা করে আমি মহাত্মার ঐ লাইনগুলির নীচে লাল দাগ টেনে আজ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা ক'রে আসছি।

তাঞ্জোরে বেড়াবার যে অভ্যাসটা হয়েছে তিরুচি হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার সময়ে, এমন-কি এখানে আসার পরেও একা একাই সেটা বজায় রেখেছি। মামা যখনই মাদ্রাজ শহরে আসে, সেও আগের দিনের মতো আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোয়।

পঞ্চবটী এলাকায় এই বাড়ীটাতে আসার পরে স্পার্টাং রোডে বেড়াতে বেশ ভালো লাগে। ওই ক্যানেলের পাড়ে পাড়ে হ্যারিংটন রোডের লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত হেঁটে যাই। সন্ধ্যাবেলায় একটা বড়ো চক্কর লাগাই। এদিকে খাজা মেজর রোডে গিয়ে প্যান্থিয়ন রোডকে কাট করে কলেজ রোড ধরে চলবার সময়ে··· বারো বছর আগে যেখানে এসে গাড়ীটা থেমেছিল··· সেখানে সেই বাসস্টপে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি··· তারপরে সেখান থেকে ভিলেজ রোড দিয়ে সেই ব্রিজটা পেরিয়ে আবার স্পার্টাং রোডে ফিরে আসি।

বেড়াবার সময়ে প্রায়ই দেখি, একটি কুকুর নিয়ে একজন শ্বেতাঙ্গ রমণী— ফ্রেন্চ্ অথবা রাশিয়ান জানি না··· ওখানে কী একটা কনসুলেত আছে··· ইয়েস··· ওটা বেলজিয়াম কনসুলেত অফিস··· সেই রমণীটি উল্টো দিক থেকে আসে। সে যে হেঁটে আসে এ কথা বলা যায় না। কুকুরটা তাকে টানতে টানতে হাঁটিয়ে নিয়ে আসে। সেই কুকুরের টানে টানে এত দ্রুত তাকে হাঁটতে হয় যে ও একটা চমৎকার এক্সারসাইজের মতোই মনে হয়। আমাকে দেখামাত্রই সে একটু মৃদু হাসি হাসে, কখনো কখনো 'উইশ' করে। আমিও 'উইশ' করি। তার নাম কী জানি না, তবে আমি মনে মনে তার একটা নামকরণ করেছি— লেডি উইথ এ ডগ।

চেকভ অথবা তুর্গেনিভ, ঠিক মনে পড়ছে না, এই শিরোনামে একটা গল্প লিখেছে। শ্বেতাঙ্গ রমণীটিকে দেখলেই আমার সেই গল্পটার কথা মনে পড়ে। তুর্গেনিভের কথা মনে আসে, মনে আসে চেকভের কথা।

বিদেশিনীর ধারণা আমি বুঝি তার কুকুরটাকে খুব পছন্দ করি। কিন্তু সে জানে না যে, বিড়াল কুকুর ইত্যাদি পোষা আমার মোটেই পছন্দ নয়। কেন যে মানুষ বিড়াল কুকুর পুষে টাকা নষ্ট করে বুঝি না। আমার তো মনে হয় এ এক-রকমের 'পারভারশান'। 'পারভারশান' একদিকে থেকে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। শিশুদেরও নাকি 'পারভারশান' দেখা যায়। বেঙ্গুমামাও একজন 'পারভার্ট', বলা

যায় স্যাডিস্ট্। তা না হ'লে অমুকম্ মামীকে অমন ক'রে মারতে পারে? অথবা অমন ক'রে ঘাড় ধরে চাপ দিতে পারে যাতে ব্যথায় আমার প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়? মাঝে মাঝে মামা এমনভাবে চিমটি কাটে যে জায়গাটা লাল দাগে চিহ্নিত হয়ে যায়। দেহ স্পর্শ না ক'রে কি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা যায় না?

এখনো রোদ ওঠে নি। এখনো ছ'টা বাজে নি। ফুরফুর ক'রে হাওয়া আসছে। মামা ও আমি ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছি। এক হাত আমার কাঁধের ওপর, আরেক হাতে ওয়াকিং স্টিক। দেখলে মনে হবে আমরা দুই দাদু-নাতনী বেড়াতে বেরিয়েছি।

মামা তার অভ্যাসমতো শুরু ক'রে দেয়— 'তোমাদের ওই র. কু. ব. লিখিত গল্পটা আমিও পড়লাম। ওটা পড়ে তোমার মা নাকি কেঁদে ফেলেছে। তুমি নাকি তোমার মাকে ওটা পড়তে দিয়েছিলে। হোয়াট ডীড ইউ মীন?' এদিকে সে আমার কাঁধের ওপর চাপ দিচ্ছে আর আমিও সরে সরে যাচ্ছি।

ঐ যে! সেই শ্বেতাঙ্গ রমণী কুকুর নিয়ে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। আমি একটি বাঘ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কাছাকাছি এলে কুকুরটা মামাকে দেখে গজরাতে থাকে। মামাও সেই শ্বেতাঙ্গ রমণীর দিকে অলস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এই রমণীর নাম রেখেছি— লেডি উইথ এ ডগ। সে কি আমার নাম রাখবে— লেডি উইথ এ টাইগার? বিদেশিনীর স্থানে আমি হ'লে তাই কিন্তু ভাবতাম। এখনো তাই ভাবছি। আমাকে বলা হোক-না— লেডি উইথ এ টাইগার।

5

ক্রিমিনাল লইয়ার বেঙ্কটরাময়্য তার যুক্তির শাণিত অস্ত্রে র. কু. ব. লিখিত সেই গল্পটাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলেও গল্পটা বার বার এসে তার মনের মধ্যে জরাসন্ধের মতো জোড়া লেগে যায়। গঙ্গার জীবনটাকে ঊষর করে দিয়েছে দুটি লোক— গঙ্গার মা ও তার বেঙ্গু দাদা। বেঙ্গুর যুক্তি হ'ল, আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা, সদাচার, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি। আর গঙ্গার মায়ের অপরাধ হ'ল, সে নিজের মেয়ের কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র ক'রে দিয়েছে। বেঙ্কটরাময়্য-র চোখে দুটোই ন্যায়সম্মত কাজ, তবু যেন তার মনের মধ্যে র.কু.ব. লিখিত গল্পটা পাবলিক প্রসিকিউটারের মতোই উঠে দাঁড়িয়ে সম্বোধন করছে— 'ফরিয়াদী পক্ষের মাননীয় উকীল মহোদয়! এই গঙ্গাকে, এর জীবনটাকে নষ্ট ক'রে দিয়ে, এর মুখে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে একটা নিরীহ মেয়েকে আপনার অমানুষিক প্রবৃত্তির শিকার বানানোই যে আপনার অভিপ্রায়, সেই অভিপ্রায় চরিতার্থ হলেও হতে পারে। কিন্তু আপনি যে ধর্ম, শাস্ত্র, সদাচার

ইত্যাদির কথা বলছেন, তা কি কেবল গঙ্গাকে দিয়েই রক্ষা পাবে বলে আপনি মনে করেন? আপনি কি ভাবছেন, আমি আমার গল্পে যে মা ও মেয়ের কথা বলেছি, তেমন মা ও মেয়ের দল সমাজে নেই? ওভাবে যারা নিজেদের গোপন কথা লুকিয়ে সমাজে বাস করছে, তাদের কি ধর্ম, শাস্ত্র ও সদাচারের দোহাই দিয়ে সমাজচ্যুত করতে পেরেছেন? যারা গোপন করবে তারা ক্ষমার যোগ্য, আর যারা স্বীকার করবে তারা দণ্ডযোগ্য— এটা কী ধরনের নীতি? ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি চুলোয় যাক, কোন এক সাহেবের লেখা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড-এর আইনের চোখেও অ্যাপ্রুভারকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়!'

প্রসিকিউশন পক্ষের যুক্তি প্রসঙ্গচ্যুত হয়ে যাচ্ছে দেখে বেঙ্কটরাময়া মনে মনে হেসে উঠল: 'এই মামলায় বিবাদের বিষয়টা কী বুঝে নিতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা ধর্মশাস্ত্র কী পরিমাণে নষ্ট হয়ে গেছে সেটা বিষয় নয়। এই মামলায় সেণ্ট্রাল পয়েণ্ট হ'ল— আমাদের ধর্ম, সদাচার সতীত্বে বিশ্বাসী একজন মা ও একজন মেয়ে তাদের ব্যক্তিগতজীবনে সেই ধর্ম ও সতীত্ব-বিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে কী দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্মপদ্ধতিকে অনুসরণ করবে সেটাই হ'ল আসল কথা।'

ইজি চেয়ারে বসে বসে কিছুক্ষণ ধ'রে পেপার পড়তে পড়তে বেঙ্কটরাময়া সেই পেপারটাকেই মুখের ওপর রেখে ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সেই গল্পটার বিষয়ে চিন্তা করছিল। আর ওদিকে তার বোন কনক সন্ধ্যাবেলায় তার দাদা খেয়ে-দেয়ে দেশে যাবে বলে রাতের রান্নাটা আগে থেকেই তৈরী করার কাজে ব্যস্ত ছিল। এমন সময়ে তন্দ্রাটা ভেঙে যাওয়ায় বেঙ্কটরাময়া মনে মনে বলে উঠল— 'বেশ, আমি কনককেই জিজ্ঞেস করি।'

'কনক··· কনক'

কনক 'এই যে আসছি দাদা' ব'লে রান্নাঘরে তার হাতের কাজ ফেলে রেখে বড়ো ঘরে এসে উপস্থিত হল।

'কাজ করছ না এমনিই বসে আছ বলে ডাকলাম। খাবার জল দাও।'

'কফি খাবে না?'

'এই অসময়ে আবার কফি কেন? তাছাড়া যাওয়ার সময় তো হয়ে এল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই খেয়েদেয়ে রওনা হতে হবে।' এই কথা বলতে বলতে দাদা ইজিচেয়ার থেকে উঠে বোনের সঙ্গে রান্নাঘরে গেল। কনকের দেওয়া জলের ঘটিটি নিয়ে সেখানেই একটা টুলের উপর বসল।

'আহা, আবার প্লেট কেন? হাতেই একখানা পাঁপড় দাও-না।'

দাদার কথায় কনক একমুহূর্ত তার দিকে চেয়ে রইল, তারপরে তার দাদার সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাব দেখে কনকের মন আনন্দে ভরে গেল। কত বড়ো একটা মানুষ তার দাদা, এক নামে চেনে সকলে— ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার বেঙ্কট-রাময়া। কেবল কি তাই? যে-কোনো সভায় উপস্থিত হলে সকলেই আসন ছেড়ে

উঠে দাঁড়িয়ে যাকে 'আসুন আসুন' বলে অভ্যর্থনা জানায় এত বড়ো একটা পণ্ডিত কিনা এইভাবে এই সামান্য বাড়ীর রান্নাঘরে টুলের উপর পা তুলে বসে আপনা থেকেই পাঁপড় চেয়ে খাচ্ছে !

'কেন ডেকেছিলাম জানো ? ওই গল্পটার কথাই ভাবছিলাম। তুমি যে বলেছ গল্পটা পড়ে তোমার চোখের জল পড়েছে, ওটা ঠিক নয়, কনক। তোমার কান্নার অর্থ এই যে বারো বছর আগে তোমার মেয়ে যে কাজটা ক'রে ফেলেছে তুমি তা গোপন করতে পার নি বলে তোমার মনে এখন খুব কষ্ট হচ্ছে, এই না ? ভেবে দেখো, বেশ ক'রে ভেবে দেখ... ই নিয়ে তোমার কান্নাকাটি করা কি ভালো কথা ?'

দাদা হঠাৎ গম্ভীর সুরে কথা বলতে আরম্ভ করলে, কনক তা সইতে না পেরে নীরব হয়ে রইল। তার মুখখানিও তেমনি বিষণ্ণ হয়ে উঠল, গত একসপ্তাহ ধরে কনক একা-একাই চোখের জল ফেলেছে। দাদা আসাতে এবং দু'দিন তার এখানে থাকার ফলে কনকের নিঃসঙ্গতা কিছুটা দূর হয়েছে। আর মাত্র একঘণ্টা পরেই দাদা তার দেশের বাড়ীর জন্য রওনা হবে। রওনা হওয়ার আগে সেই-সমস্ত বোঝা তো কনকের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে যাবে। দাদা চলে গেলে কনক তার নির্জনবাসে সমস্ত ভার বহন ক'রে আবার চোখের জল ফেলতে বাধ্য হবে এই দুঃখে তার চোখদুটো ছলছল ক'রে উঠল।

দাদা কিন্তু কনকের মনের কথা বুঝতে ভুল করল। সে ভাবল, কনক বুঝি এখনো মেয়ের দুষ্কর্মের কথা গোপন করতে না পাড়ার অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। এইজন্য মুখে ক্রোধের ভাব এনে কঠিন গলায় দাদা বলতে লাগল— 'তাহলে তোমার কী করা উচিত ছিল জানো ? গঙ্গা সেদিন যখন তোমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখনই তার হাত ধ'রে 'কোথায় সেই ছোকরা ? দেখিয়ে দে' এই ব'লে তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সেই ছোকরার সন্ধান ক'রে তার জাতি-কুল-গোত্র কিছুই বিচার না ক'রে তারই পায়ে মেয়েকে ফেলে দিয়ে এলে পারতে। কেবল মেয়ের মায়া কাটানো নয়, আত্মীয়-স্বজন সকলের মায়া কাটিয়ে তোমার উচিত ছিল অন্য কোথাও চলে যাওয়া। তা না ক'রে, সেই পুরোনো কথা গোপন ক'রে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পার নি বলে এখন দুঃখ করছ ? আচ্ছা, সেটা কি ব্যভিচার হত না ?' এই ব'লে দাদা লজ্জায় ক্ষোভে তার মাথা চাপড়াতে থাকে।

কনক আর সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেলে। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বলতে শুরু করে— 'দাদা, আমার মেয়েটা যে আর-পাঁচজনের মতো ভালো নয়, সেকথা ভেবে ভেবে আমি খুবই কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু এও তো দেখতে পাচ্ছি, কত লোক কত বাজে কাজ ক'রে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায় 'আমার মতো ভালো লোক কে আছে দেখাও তো।' ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, আমার মেয়েটার জীবন যে এইরকম হয়ে গেল তার জন্য কি আমার কষ্ট না হয়ে পারে ?'

কনকের মাতৃহৃদয়ের বেদনায় দাদা উদাসীন থাকতে পারল না। বুঝতে পারল কনককে অমন কঠোর কথা বলা উচিত হয় নি। কণ্ঠস্বর খানিকটা কোমল ক'রে বলল—'দ্যাখো কনক, তোমার দুঃখ করার কিছু নেই এতে। অবশ্য তোমার মেয়ের জীবনটা যে এইরকমের হয়ে গেল তাতে মন খুশীও থাকতে পারে না, বুঝি! কিন্তু কী করবে বলো। এ সবই অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্টের জন্য তোমাকে দুঃখ করতে হবে, তোমার মেয়ের আচরণের জন্য তোমাকে দুঃখ পেতে হবে। কিন্তু তোমার নিজের আচরণের জন্য তোমার দুঃখ করা অনাবশ্যক। গঙ্গা তোমাকে আঘাত দিয়েছে বলে তুমি কাঁদছ। কে একটা বাজে লোক একটা যাচ্ছেতাই গল্প লিখেছে, সেই গল্পের মায়ের মতো তুমি কাজ করো নি বলে কি তোমার কান্নাকাটি করা উচিত? সংসারে কত ঘটনাই ঘটে! আমরা কীভাবে চলব সেটা আমাদেরই ঠিক করতে হবে। আমি তোমাকে সোজাসুজি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। ভারতীয়-শাস্ত্র, ভারতীয়-সদাচার, ভারতীয়-সতীত্ববোধ বলতে আমরা যা বুঝি তাতে তোমার বিশ্বাস আছে কি না। কে একটা যাচ্ছেতাই গল্পলেখক, এসব ব্যাপারে তার বিশ্বাস-টিশ্বাস কিছুই নেই। তার প্রত্যেকটা শব্দ থেকেই তা বোঝা যায়। কিন্তু আগে বলো, তোমার নিজের বিশ্বাস কী? প্রশ্নের জবাব দাও।'

প্রশ্নটা এমনভাবে জিজ্ঞাসা করা হল যে, একদিকে সেই গল্পটাকে আসামীর কাঠগড়ায় এবং অন্যদিকে কনককে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বেঙ্কটরাময়্যা যেন তার তরফের সাক্ষীকে জেরা করে বলছে— শুধু বলো 'আছে' অথবা 'নেই'। প্রশ্নটা আর একবার করা হলেও কী যে বলবে কনক তা বুঝতে পারল না। সে বুঝতে পারল না তাকে এইভাবে প্রশ্ন করবার দরকারটাই বা কী। দাদা যেসব বড়ো বড়ো বিষয়ের কথা বলেছে, সে তা বই-টই পড়ে কোনো দিন জানে নি, শেখে নি। হিন্দু পরিবারের সাধারণ রমণীরূপে শুধু সে কেন, তার আগে যারা বেঁচে ছিল সেইসমস্ত অতিবৃদ্ধ রমণীরাও দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে পুরুষানুক্রমে হিন্দুধর্ম ও সতীত্বকে গ্রহণ করে নিয়েছে। 'হায়! ওইসমস্ত ধর্ম-কর্মে বিশ্বাসী আমাদের এই পরিবারে যখন অমন একটা কলঙ্ক লাগল, তখনই মেয়েটাকে হাতে ধরে তার কৃত পাপের জন্য আমরা দুজনেই সমুদ্রের জলে ডুবে মরব বলে সংকল্প করেছিলাম' এই ভেবে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল কনক।

'চুপ চুপ! কাঁদিস নে। তোকে তো কাঁদতে বলি নি আমি। কাঁদবার কী আছে এতে? আমি তো এই কথাই বলেছি যে এ নিয়ে কাঁদবার কোনো আবশ্যকতাই নেই। কীভাবে কীভাবে তোর মেয়েটার জীবন যে নষ্ট হয়ে যেত জানি না, সেই মেয়ের জীবনকে তুই আবার সুন্দর ক'রে গড়ে তুলেছিস। তার জন্য তোমার গর্ববোধ করা উচিত। আনন্দিত হওয়া উচিত। সংসারে নানা অনাচার রয়েছে, সেইসব দেখে-শুনে আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিদের চিন্তা করা ঠিক নয়। পৃথিবীতে সব রকমের লোকই আছে। খারাপ পথে যাওয়া মেয়ের মাথায় জল ঢেলে পবিত্র

করবার মতো মা-ই যে আছে তা নয়। দিনে দিনে অনাচার ক'রে মেয়েদের রোজগারের টাকায় একটু জল ছিটিয়ে দিয়ে তাকে শুদ্ধ ক'রে নেওয়ার মতো মায়েরাও রয়েছে। যারা সৎ লোক তারা কি এইসমস্তকে আদর্শ বলে গ্রহণ করতে পারে?' দাদার কথা শুনতে শুনতে কনকের মনে সন্দেহ জন্মালো যে. সে যে গল্পটা পড়েছে ওটা নিতান্তই একটা কলঙ্কের কথা, ওর প্রধান উদ্দেশ্য হল সমাজের মধ্যে দুর্নীতি প্রচার করা আর যারা কুপথে-বিপথে গেছে ওদের হয়ে ওকালতী করা।

'দাদা যা বলেছে তাই ঠিক। ওই গল্পের মা খারাপ বলেই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে মেয়ের কলঙ্ক গোপন করা।··· ওই গল্পের লেখকও একটা যাচ্ছেতাই ধরনের লোক।··· গঙ্গা কিসের জন্য এইসমস্ত গল্প পড়ে? কেন আমার কাছে অত রাগ ক'রে কাগজটা ছুঁড়ে মেরে বলল—'এটা পড়ে দেখো'? ওর কাজে আমি সায় দিই নি বলেই কি আমার ওপর ক্রোধ? তেমন বংশে আমার জন্ম হয় নি। আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। দাদা বলেছে, আমার কাজের জন্য আমার দুঃখ করা অনুচিত। কিন্তু এমন মেয়েকে পেটে ধরেছি বলেই আমার কান্না পায়, অন্য কোনো-কিছুর জন্য নয়।' এইসমস্ত ভাবতে ভাবতে কনক তার চোখের জল মুছে ফেলে বলল— 'দাদা, তোমার সময় হয়েছে, তুমি খেতে এসো।' এই ব'লে পিঁড়ি পেতে কলাপাতা বিছিয়ে দিল।

হাত ধুয়ে খেতে বসে দাদা আবার শুরু করে দেয়— 'তুই কোনো কারণেই কাঁদিস নে, কনক। তোর মেয়ের বিষয়ে এতক্ষণ যা বললাম সেগুলো ভুল মনে করিস নে। আজকালকার মেয়েদের তুলনায় গঙ্গা অনেক ভালো হলেও ওর মনটা খুব স্থির নয়. শক্ত নয়। ওকে এসব বলা নিরর্থক। এই কালটাই হচ্ছে এইরকম। এ যুগে মহৎ লোকদের মনও প্রলুব্ধ হয়। এই দেখো-না, এই ধরনের গল্পও লেখা হয় এ যুগে। তা আবার পত্রিকায় ছাপা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক এই গল্প পড়ে। ছোটো ছেলেপিলেদের বলা যায়—এটা পড়বে না, ওটা পড়বে না। কিন্তু বড়োদের কি তা বলা যায়? তারা তাদের স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী পড়বে। এত কথা কিসের জন্য বলছি শোন। তুমি এত জানো-শোনো, তোমাকেও এই গল্প বিভ্রান্ত করেছে।'

'তা হ'লে কি আমার মেয়েটার জীবনটা এইভাবেই বৃথা যাবে?' এইকথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে কনকের চোখ আবার সজল হয়ে এল।

'কেন যাবে? তুমি কি জানো না আমাদের জজ শিবরামকৃষ্ণের মেয়ের কথা? আট বছরের মেয়েকে ও জামাইকে তিনি কত আদরযত্নে বড়ো করেছিলেন। সেই ছেলে নদীতে স্নান করতে গেল. আর ফিরে এল না। অতটুকু মেয়ে গলার মঙ্গলসূত্র খুইয়ে চিরকালের জন্য বাপের বাড়ীতে এল। সেই ভাবেই মনে করো-না কেন— তোমার মেয়ের অদৃষ্টলিপিও ছিল এই। এই ভেবেই মনকে বুঝ দিতে হবে।'

যে মেয়ের এখনো বিয়েই হয় নি, সেই মেয়েকে বিধবার সমান ক'রে দেখতে বলছে দাদা। তার নির্মম কথাগুলো কনকের ওপর যেন অগ্নি উদ্গীর্ণ ক'রে দিল। 'শিব শিব! এ কি মেয়ে হয়ে জন্মানোর পাপ?' দাদার কথা শুনতে না পেরে কনক তার হাত দিয়ে কান দুটো চেপে ধরল।

'...আজকালকার রীতি অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর মঙ্গলসূত্র খুলতে বলাটাও নাকি নারীজাতির প্রতি অবিচার বলে গণ্য করা হয়। কেন বাপু, একটা শাস্ত্রের বিধান মেনে যদি বিয়ের সময়ে গলায় মঙ্গলসূত্র পড়তে রাজী হও, তবে সেই শাস্ত্রের বিধানমতোই মঙ্গলসূত্র খুলতে রাজী হবে না এটা কেমন কথা? আমরা সতীত্ব, সদাচার, পতিব্রতার ধর্ম ইত্যাদিতে বিশ্বাস করি বলেই এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করা দরকার! আর সবকিছু ত্যাগ করলে তো কষ্টই নেই— সব ল্যাঠা চুকে যায়।'

'যদি কেউ তোমার মেয়েকে জোর ক'রে বিধবা জীবন যাপনে বাধ্য করে তো সেটা সত্যিই শোচনীয়। কিন্তু তার চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার হ'ল সেই মেয়েকে কুমারী বলে চালিয়ে অন্যের ঘাড়ে গছিয়ে দেওয়া। তোমার মেয়ের যদি বুদ্ধি থাকে তবে সেই লোকটাকে খুঁজে নিয়ে এসে আমাদের কাছে বলা উচিত— 'এই আমার স্বামী। এর সঙ্গেই আমি বসবাস করব।' এ কথা বললে আমরা কি আর 'না' বলতে পারি? যদি পারো গঙ্গাকে এই কথাটা বোলো দেখি।' বেঙ্কটরাময়া বেশ জানে এমন একটা কাজ কখনো সম্ভব নয়, তাই যেন সে সাহস ক'রে— কনককে আঘাত করবার ছলেই কথাটা বলল।

ঠিক এই সময়ে আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করছি। আমি যে ট্যাক্সিতে এসেছি সেটা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকালবেলায় অফিসে যাওয়ার সময় মামা আমাকে বলেছিল— 'সন্ধ্যাবেলায় ফেরার পথে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসো। সেই ট্যাক্সিতেই আমার যাওয়ার সুবিধা হবে।' বরাবরই তার এই অভ্যাস।

যখনই সে এখানে আসে, প্রায়ই তার দু-একদিনের জন্য কাজকর্ম থাকে। সেগুলো শেষ ক'রে দিন-ছ'য়েকের জন্য আমাদের এখানে ক্যাম্প ক'রে বসে। দু'দিনের বেশি হলেও হতে পারে, কিন্তু কম কখনো হয় না। ভেকেশানের সময় দশ পনেরো দিনও এখানে এসে থাকে এবং তখন আমার ঘাড়টাকে আর অক্ষত রাখে না।

ছি! কেন আমি এই-সব সামান্য কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি? এ বাড়ীতে মামা ছাড়া আপন বলতে আর কে আছে? মামা না হলে কোথায় থাকত আমাদের এই বাড়ী? আমার এই চাকরী? আমার এই স্বাধীন জীবন? মামা যে এখানে এসে থাকে, আমাদের সঙ্গে আহার-বিহার করে তা নিয়ে আমার কোনোই দুঃখ নেই। সে যে আমাকে পীড়ন করে তাই নিয়ে আমার দুঃখ! আমি কার কাছে গিয়ে এই দুঃখের কথা বলতে পারি?

মামা সকালে একবার সন্ধ্যায় একবার আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোনো ছাড়া আর কখনও বাইরে যাওয়া দূরে থাক, সদর দরজা পেরিয়েও পা বাড়ায় না। ট্যাক্সি ডেকে আনতে হলে আমাকেই যেতে হয়। সকালবেলা বাজার থেকে তরিতরকারি আনার সময়ে তার জন্য পান-টানও কিনে আনতে হয়। কখনো কখনো ভুল হয়ে গেলে ফিরে যেতে হয় আমাকেই। আমি না থাকলে মাকে যেতে হয়, মামা কখনোই যায় না।

এখানে থাকার সময়ে যদি মাঝখানে বুধবার ও শনিবার আসে, তাহলে তো কথাই নেই। তৈল-স্নান ক...ব বলে কোমরে একটু নেংটি জড়িয়ে তেল মাখতে বসে সমস্ত বাড়ীটাকেই তেল-স্নান করায়। ঘাড় থেকে তেল বেয়ে বেয়ে পড়ে পিঠের ওপর। তখন হয়তো আমি অফিসে বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছি। সেই অবস্থায় আমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে— 'গঙ্গা, পিঠে একটু তেলটা মালিশ করে দাও তো। তাঞ্জোরের বাড়ীতে পুরা খিড়কীর উঠানটাই তার বাথরুম। এখানে এই সি-টাইপ বাড়ীতে জায়গা আর কতটুকু ?

বড়ো ঘরটার ঠিক মাঝখানটিতে পদ্মাসন ক'রে মামা ওই ছোটো তেলের বাটি থেকে হাত ভর্তি তেল ঢেলে ঢেলে যখন নাভিতে, পেটে ডলতে থাকে, আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

যাওয়ার সময়ে এই এখান থেকে ট্যাক্সিটাও সে নিয়ে আসতে পারে না। অফিস থেকে ফেরার পথে আমাকেই ধরে নিয়ে আসতে হবে। আজ আমি ইচ্ছে করেই একটু দেরীতেই অফিস থেকে বেরিয়েছি। তাড়াতাড়ি ফিরলে মামা বলত 'আয়, আমার সঙ্গে স্টেশনে।' এই বলে আমাকে টেনে নিয়ে যেত।

বাড়ীর মধ্যে ঘুরে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। মামা বোধকরি ভিতরে রান্নাঘরে খেতে বসেছে। তার চামড়ার ব্যাগটা যেন রওনা হওয়ার জন্য তৈরী হয়েই চেয়ারের ওপরে বসে আছে। ইজিচেয়ারের ওপরে মামার বদলে পড়ে রয়েছে পত্রিকাটা।

মামা যেন আমার সম্পর্কেই মায়ের কাছে কিছু একটা বলছেন, 'ওর যদি বুদ্ধি থাকত, সেই ছোকরাকে খুঁজে এনে বলতে পারত— এই আমার স্বামী, এর সঙ্গেই আমি থাকব। তাহলে কি আর আমরা 'না' বলতাম ?'

আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। মামা আরও যেন কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। কথায় বলে— ইঁদুরের কান। মামারও হয়েছে তাই। টের পেয়ে গেছে আমি এসেছি। বোধকরি মা কোনো ইশারা-টিশারা করেছে। হাতে ঘোল ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে মামা বড়ো ঘরের দিকে ফিরে তাকাল। বলল, 'গঙ্গা এসে গেছ ?' এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সম্পর্কে বেশ আক্রোশ নিয়েই কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন কিছুই ঘটে নি এমনিভাবে কী করে মানুষ কণ্ঠস্বর বদলে ফেলতে পারে ?

আমি বললাম— 'বাইরে আপনার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। আসার সময় ড্রাইভার বলছিল যেন অনেকক্ষণ ওয়েট্ করতে না হয়।'

মামা বিরক্তিভাবে বিড়বিড় করতে লাগল 'কী করে বলে সে এ কথা। ওয়েটিং-এর জন্য তো আলাদা চার্জ দেবই।' বলতে বলতে মামা আসন ছেড়ে উঠল। আমি আমার ঘরে গেলাম। আমি যখন ড্রেস চেঞ্জ করছি মামা এসে কপাটে আঘাত করল।

'গঙ্গা! আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার কাছে চিঠি দিও। তোমার কাছ থেকে তো চিঠিই পাই না…' দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মামা কথা বলছিল। আমি তখন বেরিয়ে এলাম। আমার হাত ধরে মামা বলল— 'সাবধানে থাকবে। যা দেখবে তাই পড়ে মনকে খারাপ কোরো না। সংসারে হাজারো লোক হাজারো রকম কথা বলবে। আমরা আমাদের মতো কাজ করব। বাকী লোকের কথা ভালো কি মন্দ, ভুল কি শুদ্ধ তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো অনাবশ্যক। বী এ গুড গার্ল।' এই ব'লে খুব বাৎসল্যের সঙ্গে মামা আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটি চুম্বন দিল।

"আমি চললাম, কনক। সাবধানে থেকো। গঙ্গা, আসি গো।'… ট্যাক্সি না চলা পর্যন্ত মামা বার বার আমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছিল।

আমি সদর দরজাতেই দাঁড়িয়ে রইলাম। মা যেন এতে খুব আশ্চর্য হয়েছে মনে হ'ল। আমি কখনো সদরে এসে দাঁড়াই না, কখনো রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি না বলে মায়ের মনে একটা অতৃপ্তি। না ঠিক অতৃপ্তি নয়, একটা গৌরব। কাজেই এখন আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব আশ্চর্য হল মা।

দু'বছরের বেশি হ'ল এখানে এই বাড়ীতে এসেছি। মনে হচ্ছে আজই যেন এই রাস্তাটাকে নতুন ক'রে দেখলাম।

উল্টো দিকের একটা বাড়ীর কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটা গাড়ি এসে ঢুকল। সেখানে দুটি ছোটো মেয়ে ক্যাচ ধরা খেলছিল। গাড়িতে যিনি এলেন তিনি হয়তো মেয়ে দুটির বাবা। ধমক দিলেন, 'সন্ধ্যার আলো জ্বলবার পরেও তোদের খেলা?'

সবুজ রঙের ফ্রক পরা মেয়েটি তার হাতের কুচিগুলোকে ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় মেয়েটিকে কী একটা বলে ভিতরে দৌড়ে গেল। মনে হল দ্বিতীয়টি অন্য বাড়ীর মেয়ে। পাথরের টুকরোগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে আশ মিটিয়ে খেলতে না পারায় নিজে-নিজেই খেলতে খেলতে রাস্তায় এসে পড়ল। আমাদের বাড়ীর সোজাসুজি এলে পরে সদরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বোধহয় সেও কিছুটা আশ্চর্য হল বলে মনে হল। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সেই মেয়েটি হাতের পাথরের কুচি উপরে ছুঁড়ে দিয়ে একবার দু'হাতে তালি বাজিয়ে ক্যাচ্ ধরে ফেলছে। আবার উপরে ছুঁড়ে দিয়ে নীচে পড়বার আগেই হাতে তালি দিয়ে ধরে ফেলল… এ

কেমন খেলা বাপু ? আমার হাসি পেয়ে গেল।

'হাসছেন কেন মামী ?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করতে করতে আমাদের কম্পাউণ্ড গেট পর্যন্ত এসে গেল। আমি কী যে বলব ভেবে পেলাম না। হোক-না ছেলেমানুষ, একজন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা আমার কেমন যেন সঙ্কোচ হতে লাগল। এই মেয়েটি কিন্তু কত সহজভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছে ! আমার কথা যোগাচ্ছে না। খালি হাসি পাচ্ছে।

মেয়েটি কম্পাউণ্ডের গেট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল— 'দিদিমা নেই ?' এতক্ষণে বুঝলাম মেয়েটি আমার মায়ের বন্ধু। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি মা আমার দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে আছে। ব্যাপারটা বোঝা গেল। মা বোধহয় এই মেয়েটির কাছে আমার বিষয়ে কিছু বলে থাকবে। 'আমার মেয়ে খুব গম্ভীর, কথা বলে কম। ঘর ছেড়ে বড়ো একটা বাইরে-টাইরে আসে না—' এ-রকমই কিছু একটা বলে থাকবে। মেয়েটাও বোধকরি ভেবেছিল যে সে আমাকে দিয়ে কথা বলিয়ে তবে ছাড়বে। আজ সুযোগ পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আমাকে নিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি হাসির বেশি আর কিছু দিতে পারলুম না। নিঃশব্দে আমি ভিতরে চলে গেলাম। মা এসে সদর দরজার 'চার্জ' বুঝে নিল। আমি আমার ঘরের মধ্যে থেকেই শুনতে পাচ্ছি — মা ও মেয়েটি দু'জনে সদরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে।

মেয়েটি মাকে জিজ্ঞেস করছে— 'কি দিদিমা, আপনাদের বাড়ীর মামী দেখছি যে কথাই বলে না। খুব অহঙ্কারী বুঝি !'

'ওকে মামী বলছ কেন ? দিদি বলো। ···কী ব্যাপার ? দু'দিন ধরে তোমাকে যে এদিকে আসতে দেখি নি ?'

'আপনাদের বাড়ীতে ঐ যে দাদু এসেছিলেন, তাই।'

'দাদু এসেছিলেন, তাতে তোমার কী হয়েছিল ?'

'তাকে দেখলে বড় ভয় করে আমার। উনি কে দিদিমা ?'

'আমার দাদা, আমার মেয়ের মামা।'

'আপনার আপন দাদা ?'

'আপন দাদা নয়, তুতো দাদা।'

'তুতো দাদা কী দিদিমা ?'

'জানো না যখন, জিজ্ঞেস করছ কেন ?'

'না জানলেই তো জিজ্ঞেস করে। বলো না দিদিমা, 'তুতো' দাদা কী ?'

'মায়ের কথা বলার জন্য একটি উপযুক্ত সঙ্গী জুটেছে। দু'জনেই কলকল করে কথা বলে চলেছে। আমি বিছানার উপর সটান শুয়ে পড়ে ঘাড়ের নীচে হাত রেখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সাড়ে ছ'টা বাজতে চলল। চানটা সেরে বেড়াতে যাব। কিসের জন্য এই অসময়ে শুয়ে আছি ? ওরে বাবা ! এই মামা এখান থেকে বিদায় নিয়েছে বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাচ্ছে। দুটো দিন মনে

হচ্ছিল দুটো মাস। উপদ্রবের যেন শেষ ছিল না। কোনো কাজেই 'না' বলার উপায় ছিল না।

বড়ো ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে হাঁক ছাড়ত— 'গঙ্গা, এদিকে এসো তো একবার। পা দুটো একটু টিপে দাও দেখি।' বয়স্ক মানুষ একথা বললে আমি পারব না উত্তর দিলে একটু অন্যায় দেখায় না কি? সবচেয়ে প্রথমই তো অন্যায় মনে হত আমার মায়ের কাছে। 'ঠিক আছে। আমার ভাগ্যলিপি!' ব'লে, পা টিপে দিলেই কি রক্ষা আছে? তারপরেই ফরমায়েস হত 'গঙ্গা! হাতটা ব্যথা করছে।' বলে আমার হাত টেনে নিয়ে মট মট করে আমার আঙুলগুলো মটকাতো। মনে হত আমার পোড়া কপালে করাঘাত করতে করতে পালাই। যাক, লোকটা যে দেশে চলে গেছে এতেই আমার শান্তি!

মামা কী বলছিল মাকে?··· 'তোর মেয়ের যদি বুদ্ধি থাকে তবে সেই ছোকরার সন্ধান করে তাকে ধরে নিয়ে এসে···।' মামার নিশ্চিত ধারণা যে আমি তাকে খুঁজে বার করতে পারব না। আর যদি খুঁজে বার করতে পারিও বা সে যে আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না এই হল মামার দৃঢ় বিশ্বাস। শেষপর্যন্ত আমার মকদ্দমায় এই হল মামার জাজমেণ্ট।

এখন আমি তার— সেই বারো বছর আগেকার লোকটির— মুখটা ভেবে দেখতে চাই। মনে হয় যেন একখানা ছবি একেবারে লেপাপোঁছা হয়ে গেছে। দশজন লোকের মধ্যে তাকে দেখলে আমার পক্ষে সনাক্ত করা খুবই কঠিন। কিন্তু সেদিন— সেই বারো বছর আগে— যে কথাগুলো বলেছিল, সেগুলো এখনো স্পষ্টভাবে কানে বাজছে! 'তুমি কি জানো যে এই গাড়ীখানি দুটি বছর ধরে প্রত্যেকটি দিন তোমার পেছনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডু ইউ নো দ্যাট?'

হ্যাঁ, যদি তাকে সেই গাড়ীর সঙ্গে দেখতে পাই তবে নিশ্চয়ই আমি চিনতে পারব। ভগবান জানেন, এখনো সেই গাড়ী আমার পশ্চাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না। কে আমার পিছনে ঘুরে বেড়ায় কি বেড়ায় না, তা নিয়ে আজ আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। যেই হোক-না কেন, আমার তাতে কী? এখন আমার পিছন ফিরে তাকাতেই ভয় লাগে।

তাকে খুঁজে বের করা শক্ত বলেই কি আমি তাকে না খুঁজে পারি? আবার ভাবি তাকে যে আমার খুঁজতেই হবে এমনই বা কী দরকার হয়ে পড়েছে? তাই তাকে এতদিন খুঁজি নি। আমি যে তাকে না খুঁজে চুপ করে রয়েছি তার কারণ এই নয় তাকে খুঁজে পেলেও সে আর আমায় বিশ্বাস করবে না। তার কারণ, আমি আর তাকে বিশ্বাস করতে পারব না।

এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি তাকে খুঁজে বেড়ালে তার ফলটা কী? খোঁজাটা বিশেষ কষ্ট নয়, কারণ ও ধরনের গাড়ী মাদ্রাজ শহরে মাত্র খানদশেক রয়েছে। কিন্তু সে গাড়ী এখনও কি তার কাছেই রয়েছে? কার না কার কাছে

রয়েছে সে খুঁজে লাভ কী? সেই গাড়ীখানা বার করতে পারলে তাকেও বের করা যাবে। ছি! এসমস্ত কী পাগলামো! বারো বছর পরে একটা লোকের সন্ধানের জন্য ব্যাকুলতা! একদিক থেকে জীবনের সবই তো পাগলামো ছাড়া কিছু নয়। তার মধ্যে আমার এই পাগলামোটা কী রকম একবার দেখলে মন্দ হয় না।

ইয়েস্, আমি তাকে খুঁজে বার করব।

6

ছটি মাস চলে গেছে। এখনো আমি তার সন্ধান করে চলেছি। সেই ধরনের গাড়ী কতই তো দেখলাম, কিন্তু সেই গাড়ীখানি আমার চোখে পড়ল না। মামা যে বলেছে তাকে খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য, কথাটা সত্য কি? সেই গাড়ী ও গাড়ীর মালিককে আমি কি আর দেখতে পারব না? এ ভাবে ভাবতে গেলে মনে খুবই কষ্ট হয়।

এই বারো বছর ধরে আমি কোনো গাড়ীর দিকে, কোনো মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকাই নি। কোনো গাড়ী আমাকে ফলো করছে কি না, কেউ আমার পিছনে পিছনে আসছে কি না এ সমস্ত নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তাই নেই। কেউ যদি আমার গায়ে পড়ে ধাক্কা দেবার চেষ্টাও করে, আমি ভ্রূক্ষেপও করি না, ফিরেও তাকাই না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার জীবনে আর পুরুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠবে না এই আমার একমাত্র চিন্তা। এখন যে আমি সেই লোকটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তার কারণ কিন্তু এই নয় যে আমার এখন একজন পুরুষ সঙ্গী প্রয়োজন, অথবা তার ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য তাকে আমার বড়ো দরকার। এখন আর আমি কোনো পুরুষকে ভালোবাসতে পারব না। যে-কোনো পুরুষ সম্পর্কেই 'সে যে একজন পুরুষ' এই চেতনাই আমাকে শ্রদ্ধাহীন করে তোলে। পুরুষের স্পর্শ, এমন-কি পুরুষের সান্নিধ্যের চিন্তা পর্যন্ত আমার কাছে অবাঞ্ছিত। ঠিক সেইমতো আমাকে দেখলেও তারা যে কোনো উচ্চ ধারণা পোষণ করবে মনে হয় না। মামার যেমন ধারণা, আমাকে যারা দেখে তারাও তেমনি হয়তো মনে করে যে আমার হাত ধরে টানলেই আমি রাজী হয়ে যাব। কেন যে এই ধারণা জানি না। আমার মধ্যে ও-রকম চিপ্‌নেসের পরিচয় পাওয়া যায়? এই বোকা মেয়েটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বেশ বশ করা যেতে পারে বলেই কি তাদের এই সাহস? হয়তো আমার কোমল স্বভাব এই পুরুষ-জাতের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পশুত্বকে ক্ষেপিয়ে তোলে।

আমার কপাল! সমস্ত বেটাছেলেগুলো আমার সঙ্গে মিস্‌বিহেভ করবার জন্য যেন তৈরী হয়েই থাকে। একটু চোখ তুলে তাকালেই হল। আর যদি

কিছু প্রশ্নের উত্তর দিই, তবে তো আর কথাই নেই। অসভ্য জানোয়ার!

বাসে টিকিট বিক্রী করে যার দিন চলে সেই কণ্ডাকটার পর্যন্ত আমার দিকে চেয়ে চেয়ে গোঁফে তা দেয়। টিকিটের পয়সা নেবার সময়ে আমার আঙুলেই আঙুল ঠেকিয়ে নেয়। খুচরো পয়সা ফেরৎ দেওয়ার সময়েও হাতটা ছুঁইয়ে দেয়। আমিও লক্ষ্য করে দেখি— বেটা অন্যের সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করে কি না। না, করে না। কেবল আমারই সঙ্গে বদমায়েসী বুদ্ধি। টিকিট চাইতে চাইতে যখন পাশ দিয়ে যায়, তখন আমার বুকের মধ্যে ধুক ধুক করে— 'এই বুঝি লোকটা আমাকে ছুঁয়ে দিল।'

মোট কথা পুরুষদের কথা যতই ভাবছি, আমার মনে ততই একটা ঘৃণা-মিশ্রিত ভয় দেখা দিচ্ছে। ভয়টা কী রকম। একটা আরশোলা দেখলে যেমন ভয় জন্মে তেমনি। আরশোলা কামড়াতে পারে বলে তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে শরীরটা কেমন শিউরে ওঠে। সেই রকম একটা ভয় পুরুষ মানুষ দেখে।···

কিন্তু হায়, আমি এখন তেমনি একটা আরশোলাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই খুঁজছি।

আজকাল আমি খুব সেল্‌ফ্‌-কনশাস হয়ে পড়েছি। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে তাকাই। বাসে করে যেতে, অথবা পায়ে হেঁটে চলতে গিয়ে আমি প্রত্যেকটি 'কার' খুঁজে খুঁজে দেখি। মনে হয় এই বুঝি হঠাৎ আমার পেছন পেছন সেই 'কার' ফলো করে আসছে। এখন এই হচ্ছে আমার ভাবনা, আমার কল্পনা।

আজকাল আমি সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীর সদরে এসে দাঁড়াই। রাস্তার প্রত্যেকটি লোককে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। আমার এই দৃষ্টির ফলে পথচারীদের কেউ কেউ কিছুটা বিব্রত বোধ করে। কেউ চলে মাথা নীচু করে। হয়তো ভাবে— কী-রে বাবা, আমাকেই দেখছে নাকি মেয়েটা? ব্যাপারটা যেন কেমন ঠেকছে!

সেই লোকটির— সেই বারো বছর আগেকার লোকটির— মুখখানা ভেবে ভেবে এখন যেন স্মৃতিপথে আনতে পেরেছি।

আজকাল চোখ বন্ধ করলে কেবল মুখ আর মুখ ভেসে ওঠে। সবই পুরুষের মুখ। গোঁফওয়ালা মুখ; গোঁফশূন্য মুখ; কোনো কোনো মুখে শেভ করবার কালো দাগ; কোনো মুখ গোল; কোনো মুখ লম্বা; কোনো মুখে কুলিং গ্লাস; কোনো মুখ বেশ ঝকঝকে; কোনো মুখে রাশি রাশি ব্রণ; কোনো মুখে বসন্ত রোগের দাগ; কারো মুখে বোকা-বোকা ভাব; কারো মুখের দু'পাশ দিয়ে মাথার তেল বেয়ে বেয়ে পড়ে; কারো মুখখানা হাসি-হাসি; কারো মুখে দাঁতগুলো বের করা, কেউ বা গোমড়া-মুখো। সত্যি, পৃথিবীতে যে কত রকমেরই মুখ, একজনের মতো আর-একজন পাওয়া যায় না। নাকেরই বা কত রকম বাহার। কোনো নাকের দিকে তাকালে জন্তু-জানোয়ারের কথা মনে পড়ে। কোনো নাক স্মরণ করিয়ে দেয়

পাখীদের কথা। তা ছাড়া আছে ছাগলের মতো নাক, ঘোড়ার মতো, বানরের মতো, শকুনের মতো, টিয়ে পাখীর মতো··· এর কি আর শেষ আছে!

এভাবে তুলনা করে দেখাটা আমার পক্ষে বেশ একটা সময় কাটাবার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে! আমি যে ওভাবেই দেখবার আশা নিয়ে দেখছি ঠিক তা নয়। কাউকে দেখলেই মনে হয় এই ভদ্রলোক কি আমার সেই বারো বছর আগেকার লোকটির পরিচিত হতে পারে না? যদি হয়, তবে তার সম্পর্কে খোঁজ-খবরও তো নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কী খোঁজ-খবর নেব? কী-ই বা জিজ্ঞাসা করব? আমি তো তার নামটা পর্যন্ত জানি না। সেই গাড়ীর নম্বরটা পর্যন্ত জানি না। আমি কার কাছে কী জিজ্ঞেস করব সে কথা? হায়, আমার অদৃষ্টলিপি! যার নাম পর্যন্ত আমার জানা নেই আজ সে-ই আমার সর্বস্ব। আমার মামা এই কথা বলেছে। মামা যে মহাপণ্ডিত! মামার কথাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট? নয় আবার? ওই কথাই তো এখন আমার জপমন্ত্র।

মামার কথা মানতে হলে আমি তো স্বভাবতই অতি খারাপ চরিত্রের মেয়ে। সত্যই তো কে একটা অজানা লোক, সেই লোকটার সঙ্গে মিলিত হতে রাজী হয়ে গেলাম? সেই নাম-না-জানা লোকটিই আমার স্বামী? সেই গাড়ীর মধ্যে যা সব ঘটেছে সেই কি আমার বিবাহ? ওরকম বিবাহের নাম গান্ধর্ব-বিবাহ? তাই নয় কি? তাই যদি হয়, তবে আমি এখন স্বামীকে খুঁজে নিই না কেন? শকুন্তলা-দুষ্মন্তের মতো গান্ধর্ব-বিবাহে আবদ্ধ হয়ে আমি এখন এই মাদ্রাজ শহরের পথে পথে আমার স্বামীকে খুঁজে বার করব। দময়ন্তী যেমন বনে বনে খুঁজে বেড়িয়েছিল নলকে? সে এতদিনে অন্য কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী হয়ে বেশ কয়েকজন সন্তানের জনক হয় নি কি? আমি যেমন তার কথা ভাবছি, সে কি তেমনি করে ভাবছে আমার কথা? তার কি মনে আছে? স্মরণ করিয়ে দিলেও কি মনে পড়বে? স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ একটা আংটি পর্যন্ত চেয়ে নিই নি। মূর্খ, আমি মূর্খ!

যেমন করে হোক আমি তাকে খুঁজে বার করব, কারণ মামার কাছে প্রমাণ করতে হবে যে আমার সে সামর্থ্য আছে। আরও একটি কথা, এই মামার হাত থেকে এড়িয়ে চলবার জন্যও সেই লোকটিকে আমার প্রয়োজন।

লাঞ্চ টাইম। আমার সেকশনের সকলেই ক্যানটিনে চলে গেছে, পাশেই মেয়ে-দের জন্য স্ক্রীন্ দিয়ে একটা ঘেরা জায়গা থেকে কলকল কথা এবং খিল্‌খিল্ হাসিতে বোঝা যাচ্ছে, ওখানে দু'তিনটি মেয়ে টিফিন নিয়ে ব্যস্ত। আমার কী জানি কেন ক্ষিধে নেই। এই তো টেবিলের ওপর টিফিন বক্স পড়ে রয়েছে। বাক্সের মধ্যে ঘোল ভাত। এদিকে সই করবার জন্য পড়ে আছে, একটার ওপর একটা. অনেকগুলো ফাইল। সই করে তুলে তুলে ছুঁড়ে দেওয়া ফাইলগুলো আরেকদিকে স্তূপীকৃত। পাশেই টেলিফোন রাখা। টেবিলের ওপর এক গ্লাস জল আর তার

ওপর একটা প্লাস্টিকের ঢাকনি। কেন যে পিওন রঙ্গস্বামী রোজ এনে এখানে এই জল রেখে দেয় ভগবান জানে। আমি একদিনও এই জল খাই না। সে নাকি তার 'ডিউটি' করে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি বলে— 'এই ফাইলগুলো এখান থেকে সরিয়ে নাও', তবে রঙ্গস্বামীর মুখে ভ্রূকুটি দেখা দেয়। সে বলে ওঠে— 'সই-টই করে রেখেছেন তো স্যার? তবে আর কী? থাক্ ওখানে। ওগুলো আপনা থেকেই যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছবে। আর যদি অন্য কোথাও কোনোটা পাঠাতে হয়, আলাদা করে রাখুন।··· তারপরে, আর কী করবার আছে বলুন।' রঙ্গস্বামীর গলায় যেন প্রভুত্বের সুর।

আমি কাউকে কিছু বলি না। মেয়েরা সব টিফিনে খাওয়ার সময়ে একে অন্যকে ডাক দিয়ে যায়। আমাকে কেউ ডাকে না, আমিও কাউকে ডাকি না। আমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই।

বোধকরি সেইজন্যই রঙ্গস্বামী কোথাও কিছু বলতে হলে সর্বদা আমার দৃষ্টান্ত দেয়। অফিসের কাজকর্ম করতে বললেই গায়ে তার জ্বর আসে। কেউ যদি বলে 'এখানে যাও, ওখানে যাও' তবে সে বড় খুশী হয়। আমি তাকে কোথাও কোনো কাজে পাঠাই না।

এই তো বসে আছি আমার চেয়ারে। এইভাবে কালও বসেছিলাম। আমার পিছনে কাচের দেয়াল। আর সেই দেয়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছিল মাউণ্ট রোডের যানবাহন চলাচল। সেই 'কার'গুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল!

—আচ্ছা, গল্প-লেখক র. কু. ব. সেই লোকটি নয়তো?

আমার প্রথমে মনে হয়েছিল র. কু. ব. নামের আড়ালে রয়েছে একজন স্ত্রীলোক। কিন্তু আমার মনেহয় এই লেখক কোনো স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। কেবল তাই নয়, মামার মতে লেখক অত্যন্ত পাজি ও নচ্ছার প্রকৃতির লোক। সে যাই-হোক, গল্পটার ঘটনাগুলো, ঘটনাস্থল, চরিত্র, কার, বর্ণনার ভঙ্গী ··· সব কিছু ভেবে দেখলে এ কথা মনে না হয়েই পারে না যে সেই লোকটি আর গল্প-লেখক র. কু. ব. অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যখন র. কু. ব.-কে একজন ইন্‌টেলেকচুয়াল রূপে কল্পনা করছি, সেই বারো বছর আগেকার লোকটি সম্পর্কে কিন্তু সে কথা ভাবাই যায় না। কোথায় মনুষ্যে প্রীতিমান, চিন্তাশীল ও উন্নতমনা র. কু. ব.? আর কোথায় বা সেই ধনীর দুলাল লম্পট লোকটা— যে কার নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় রাস্তায় রাস্তায় বাস্ স্ট্যাণ্ডগুলোতে ঘুরে বেড়ায় যে-কোনো একটি মেয়ের লোভে?

র. কু ব.-কে যে আমি এতদিন একজন মহিলা লেখক বলে ভেবেছি তার কারণ হল তার গল্পে পাওয়া যায় মেয়েদের মনের কথা. আমাদের আধুনিক সমাজজীবনে মেয়েদের সামনে যে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই-সব কথা।

আমার ধারণা ভুল হতে পারে, তবে পুরুষ হলেও সে কোনোক্রমেই সেই বারো বছর আগেকার লোকটা হতে পারে না। হওয়া উচিত নয়।

কেন? কেন এ কথা মনে করছি? হতে যে পারে না সে না-হয় বোঝা গেল। কিন্তু হওয়া যে উচিত নয় তার যুক্তি কী? কী যে যুক্তি জানি না। কিন্তু হলে পরে র. কু. ব. -লিখিত গল্পগুলো আর কি আমার ভালো লাগবে? কী করে ভালো লাগবে? লোকটা কাজ করে একরকম, গল্প লেখে অন্যরকম? র. কু. ব. নামের সেই বুদ্ধিজীবী লেখক কি কখনো 'হিপোক্রিট' হতে পারেন? তা হলে তার চিন্তাধারা সবই কি মিথ্যা? তবে তো সেই চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণের অনুরাগী আমিও মিথ্যা হয়ে গিয়েছি।

বারোটা বছর পার হয়ে গেছে। এই বারো বছরে আমারই কত পরিবর্তন! ছিলাম একটা সংসার-অনভিজ্ঞ বোকা মেয়ে। এখন যা-হোক কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, বড়ো হয়ে উঠেছি। ঠিক সেইভাবেই হয়তো এই বারো বছরে সেই লোকটা —নারী-শিকারের জন্য যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই লোকটা— হয়তো র.কু.ব. নামের লেখকে পরিণত হয়েছে। সে কি চিরকাল একটা লোফার হয়ে থাকতে পারে? চিন্তা, দায়িত্ব, বুদ্ধি ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আসে। হয়তো তার বিয়ে হয়ে গেছে, একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে তার হয়তো এখন ইস্কুলে যাতায়াত করে। সেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে তার কি একদিনও আমার কথা মনে না হয়ে পারে? আমার যেমন ঘটেছিল, তার মেয়েরও তো তেমনি কিছু ঘটতে পারে। এরকম একটা ভয় কি তার বুকে এসে নাড়া দেয় না?

এই জীবনে যে-কোনো লোকের যে-কোনো সময়ে যা-কিছু ঘটে যেতে পারে। এমন কোনো কথাই নেই যে, 'না, এটা ঘটতে পারে না, ওটা ঘটতে পারে।' একবার যদি ঘটে যায়, তখন আর কী করা যেতে পারে? হাউ টু ফেস্ দ্য প্রব্লেম্?

র. কু. ব. নামধারী লেখক আর সেই গাড়ীর লোকটি এক কিনা— এটা আমার কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ তার লেখা সম্পর্কে আমার একরকম অনুরাগ আছে। কাজেই যদি দেখতে পাই র. কু. ব. আর কেউ নয়, সেই লোকটাই, তবে একটা বড় রকমের মুশকিল দেখা দেবে। আমি তো স্থির করেই ফেলেছি বিয়েটিয়ে আর করব না, একাই থাকব, কিন্তু সেই নিঃসঙ্গতা সমস্ত অন্তরকে কি নাড়া দেবে না? কিন্তু যদি কারও সঙ্গে আমি চিরকাল সঙ্গিনীরূপে বাস করি অথবা কাউকে বিয়েই করে ফেলি, তবু কি আমার মনের দ্বিধা দূর হবে?

র. কু. ব. নামের লেখকটি কে সেটা জানবার চেষ্টা এবং সেই গাড়ীর লোকটিকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা যদি এখন ছেড়ে দিই তা হলে কী হবে? কেন আমার এই অদ্ভুত ইচ্ছা?

আমার চোখের সামনে গাড়ী চলছে সার বেঁধে। সাত তলা থেকে আমি

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছি। শত শত লোক দলে দলে দাঁড়িয়ে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাড়ীগুলির কোনোটা কালো, কোনোটা সাদা, কোনোটা নীল, কোনোটা সবুজ রঙের। পরম্পর লাইন দিয়ে সেগুলি আসছে যাচ্ছে। আমার এখান থেকে তাকালে গাড়ীগুলোর কেবল উপরের দিকটা দেখা যায়। ভিতরে বসা মানুষগুলোকে দেখা যায় না।

এই গাড়ীগুলির কোনো-একটায় সে কি বসে আছে? তার তো কত গাড়ীই আছে? শুধু কি বড়ো গাড়ী? ছোটো গাড়ীও আছে নিশ্চয়। ঐ একটা গাড়ী আসছে, একেবারে সাদা, বাচ্চা খরগোসের মতো। খুব ছোট্ট গাড়ী। কী সর্বনাশ! সামনের ওই লরিটা হলুদ রঙের দাগ পেরিয়ে··· আরে বাবা! ব্রেক···

আমি চেয়েই আছি। এক মুহূর্তে, আমার চোখের সামনে, ঐ প্রকাণ্ড লরিটা ঐ ছোট্ট গাড়িখানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে···

আমার এখানে বসে কিছুমাত্র শব্দ শোনা যায় না, শোনা গেল না। ঐ ছোট্ট সাদা গাড়ীর সামনের দিকটা ভেঙেচুরে··· তার পরে আর কিছু দেখা গেল না। দেখা গেল শুধু জনতার ভীড়। তার পরেই পুলিশের লোকজন। কাঁচের জানালার বাইরে সমস্ত ব্যাপার আমার চোখে নির্বাক ছবির মতো লাগছে।

যারা লাঞ্চে গিয়েছিল, তারা একে একে ফিরে এসেছে, টাইপরাইটারের শব্দ শুরু হয়ে গেল।

অফিস পিওন রঙ্গস্বামী কতগুলো ফাইল হাতে ক'রে— কার সঙ্গে জানি দাঁত বের ক'রে গল্প করছে, যেন ভারি একটা মজার খবর— "গেল সাবাড় হয়ে স্যার। বেশ ভারি-ভুরি শয়তানের মতো চেহারা। মুখটা আর চেনা যায় না, মাথাটা ভেঙে চৌচির। একেবারে অক্কা।"

আমি আর শুনতে পারছি না, কান দুটো বন্ধ ক'রে বললাম— "রঙ্গস্বামী, প্লিজ!" আমার কথায় সে নিঃশব্দে চলে গেল। আমার কেন জানি না কান্না পাচ্ছে। মন চায় আবার একবার ওদিকে তাকাতে, কিন্তু সাহস হচ্ছে না।

ছুটি হয়ে গেলে বাড়ী ফেরবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে কাঁচের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। পুলিশ এখনো দাঁড়িয়ে। সেই ছোট্ট গাড়ীখানাকে ক্রেন্ দিয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে··· আমার পেটের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠল।

দুপুরবেলায় কী সুন্দর ভঙ্গিতে একটা বাচ্চা খরগোসের মতো গাড়ীটা এগিয়ে আসছিল। এখন তারই ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপটাকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে খুব খারাপ লাগল।

যে লোকটি গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল, রঙ্গস্বামীর কথায় মনে হল সে আর বেঁচে নেই। আমার যেন কেমন মনে হল— 'না, এ হতে পারে না।' লোকটি যে-ই হোক-না কেন, এভাবে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা ভাবা যায় না।

লোকটার জন্য আমি মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছি। সে হয়তো এখন হাসপাতালের বেড্-এ শুয়ে আছে। মনে হয় বেঁচে যাবে। জীবনহানির কোনো আশঙ্কা নেই। রক্তের দাগ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বঙ্গস্বামীটা সত্যিই পাগলাটে। নিজের মস্তিক দিয়ে কী একটা গাঁজাখুরি গল্প বানিয়েছে।

হয়তো... ঐ গাড়ীর লোকটি তো সেই লোকও হতে পারে। আহা!

7

মামা ঠিকই ধরেছিলেন। র. কু. ব. এই ছদ্মনামে যে লিখছে সে মহিলা নয়, পুরুষ। এখন আমি টেলিফোনে কথা বলছি। ওই পত্রিকার আপিস থেকে একজন সাব-এডিটর আমার সঙ্গে কথা বলছে। আমি এই বলে নিজের পরিচয় দিলাম যে তাদের পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠিকা। সে পরিচয় যথেষ্ট নয় বলে এ কথা বলতে হল যে আমি র. কু. ব. -লিখিত গল্প-উপন্যাসের অন্যতম অনুরাগিণী। ওই 'অগ্নিপ্রবেশ' গল্পটি সম্পর্কেও কিছু বললাম। টেলিফোনে কথা বলার সময়ে আমার এমন সঙ্কোচ মোটেই থাকে না যে একজন অপরিচিত বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলছি। তাই আমি টেলিফোন রিসিভারটা হাতে ধ'রে আছি। মনে হয় যেন কোনো লোকের সঙ্গে নয়, এই রিসিভারটার সঙ্গেই কথাবার্তা হচ্ছে। অনেক কথা হল। আমি সবসময়েই আত্মগতভাবে ধীর কণ্ঠে কথা বলি। সেই গল্পটা আমার লাইন বাই লাইন মনে আছে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এই কথাটা ভেবে যে আমি তো আমার পরিচয় শুরু করেছি ওদের পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকারূপে, তার পরে বলেছি র. কু. ব. -লিখিত গল্প-উপন্যাসের প্রতি আমার অনুরাগের কথা, এখনই হয়তো ফস্ ক'রে মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে যে তাঁর লেখা 'অগ্নিপ্রবেশ' গল্পের নায়িকা আর কেউ নয়, আমিই। ভয়ে ভয়ে আমি হঠাৎ কথা থামিয়ে দিলাম। তার পরে মনে পড়ে গেল আমার ফোন করবার আসল উদ্দেশ্যের কথা। ইংরেজীতে জানতে চাইলাম গল্প-লেখক র. কু. ব. ম'শায়ের ঠিকানাটা কী? কিন্তু ও-প্রান্ত থেকে উত্তর দিতে গিয়ে কেমন একটা দ্বিধা।

'দেখুন, আমাদের লেখকদের সম্মতি ছাড়া অন্য লোককে তাদের ঠিকানা দেওয়া বারণ। আপনার যদি দরকার হয়, এক কাজ করুন। আপনি তাঁকে যা লিখতে চান আমাদের আপিসের ঠিকানাতেই লিখে পাঠান। আমরা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব।'

একটু দ্বিধাভরে বললাম: 'তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে কয়েকটি কথা বলতে চাই।' বেশ সাহসের সঙ্গেই কথাটা শেষ করলাম। ও-প্রান্ত থেকে যে বলছে তার যেন একটু এড়িয়ে চলার ভাব— 'আপনি যা বললেন, ম্যাডাম্, সবই ঠিক।

আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু তাঁর সম্মতি না পেলে কী ক'রে আমরা তাঁর অ্যাড্রেস্ দিই বলুন। আপনি এক কাজ করুন। আপনার ফোন্ নাম্বারটা দিন। লেখকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ ক'রে মিনিট দশেকের মধ্যে আপনাকে জানিয়ে দেব।'

ফোন নাম্বারটা বললাম। লোকটি আমার নামও জিজ্ঞেস করল। একটু দ্বিধা হল। না, নামটা বলা ঠিক হবে না। 'দেখুন, নামের আর দরকার কী? এই নাম্বারেই ফোন ক'রে এক্সটেন্‌শন্ সিক্সটি-থ্রি চাইলেই হবে। আমার টেবিলেই ফোনটা রয়েছে। থ্যাঙ্ক্ ইউ···' এই বলে আমার ফোন্ নাম্বারটা দিয়ে কখন আবার টেলিফোনের আওয়াজ শোনা যাবে তারই জন্য অপেক্ষা করছি।

হঠাৎ এক সময়ে টেলিফোনটা বেজে উঠতেই আমি রিসিভারটা তুলে ধরলাম। সেই সাব-এডিটরের কাছ থেকে র. কু. ব.-এর ঠিকানাটা পাওয়া গেল। আমি এমনিভাবে বসে রইলাম যে আমার যেন অন্য কোনো কাজকর্ম নেই। সত্যিই আমি পাগল হয়ে গেছি। আচ্ছা এই ভাবে কাজকর্ম না ক'রে হাত গুটিয়ে বসে থাকব? সামনে যে ফাইলটা পড়ে আছে ওটাকে একবার খুলে দেখলে হয় না? কাজ নাই বা করলাম, কাজ করবার মতো ভাবটা অন্তত দেখানো চাই। এইভাবে বসে বসে চিন্তা করা ছাড়া কিছুই করলাম না, স্রেফ চুপ ক'রে বসে রইলাম।

আমার এই কর্নার থেকে তাকালে আমার সমস্ত সেকশনটি পুরোপুরি দেখা যায়, এমন-কি পাশের সেকশনও। ময়দানের মতো বিরাট হলঘর। হলভর্তি টেবিল, চেয়ার, ফাইল ও টাইপরাইটার। টেবিলগুলির মাঝখান দিয়ে একটা সরু গলির মতো পথ। সেই পথে কিছু লোক ফাইল নিয়ে খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটো-ছুটি করছে। কেবল রঙ্গস্বামীই এখনও ধীর মন্থর গতিতে এদিকে আসছে। ওই সরু পথটির মধ্য দিয়ে উলটো দিক থেকে দুটো লোক আসছে··· হাসছে···। ঐ যে ওদিকে দুটো লোক পরস্পরকে 'উইশ্' করছে··· আর একদিকে একটা টেবিল ঘিরে পাঁচ-ছ'জন লোক। চার জন ভিজিটার্স্। এর আগে এদের মুখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাদের মধ্যে ইন্‌ট্রোডাক্‌শানের পালা চলছে। বসবার জায়গা নেই। পাশের টেবিলের কাছ থেকে চেয়ারগুলো টেনে নিচ্ছে। ওদের মধ্যে একটি লোক— ঐ যার পরনে কালো প্যান্ট, গায়ে হোয়াইট্ শার্ট— লোকটি তার কুলিং গ্লাসটা খুলে চোখ দিয়ে একবার এই বিরাট হলঘরটাকে দেখে নিচ্ছে। লোকটা এমনভাবে তাকাচ্ছে যে তার তাকানোটা যেন সকলেরই নজরে পড়ে। লোকটার দৃষ্টি ঘুরে-ঘুরে আমার কাছে আসার আগেই আমার দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরে গেল।

একটা ঘড়ি খুলে যখন তার যন্ত্রপাতি দেখা যায়, তখন সমস্ত জিনিসই যেমন মেকানিকাল লাগে, তেমনি মনে হয় এই হলঘরের ব্যস্ততা ও কর্মচাঞ্চল্য দেখে।

আচ্ছা, ওই যে চার জন লোক ভিজিটার্স্ হিসাবে এসেছে, তাদের মধ্যে

কেউ কি হতে পারে আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত লোকটি? ওই কালো প্যাণ্ট ও শাদা শার্ট পরা লোকটি? ওর ও তার মধ্যে মিলটা কোন্‌খানে? বারো বছরে একটা লোকের চেহারা কতটা বদলে যেতে পারে? আমিই কি কেবল তখন যেমন ছিলাম, এখনও তেমনি আছি?

আমার পিছনের কাঁচের জানালা দিয়ে কার্‌ পার্কিং-এর জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীগুলির মধ্যে আমি সেই বিশেষ গাড়ীটি খুঁজছি। অসংখ্য গাড়ী। কিন্তু বিশেষ গাড়ীটি সেখানে নেই

আচ্ছা, আমি কেন এই সমস্ত ভাবছি? কোনো অচেনা লোক দেখলে. কোনো একটা ঘটনা দেখলে. কোনো ভীড় বা অ্যাক্‌সিডেণ্ট দেখলে আমার মনে এই ধরনের চিন্তা কেন জাগে?

কাল রাতে যখন ছাদের ওপর গিয়ে আকাশের দিকে মুখ ক'রে সটান শুয়ে পড়লাম. দেখলাম একটা প্লেন যাচ্ছে— তার লেজের দিকে সবুজ ও লাল রঙের মিটমিটে আলো। কোথায় যাচ্ছে প্লেনটা? দিল্লী, কলকাতা, না বম্বে? আমি তখন ভাবতে শুরু করলাম প্লেনের কথা, প্লেনে যারা যাতায়াত করে তাদের ব্যস্ততার কথা. যারা বিজনেস 'পপল তাদের কথা। অবশেষে ভাবলাম— সেই লোকটিও বোধ হয় এই প্লেনে ক'রে যাচ্ছে এবং মনে মনে স্থির ক'রে ফেললাম— 'বোধ হয়' নয়. নিশ্চয়ই যাচ্ছে। আমি যাই ভাবি-না কেন, আমার সমস্ত ভাবনা এখন এই একজনকে ঘিরে।

কিন্তু এর কোনো মানে হয়? যদি মনের কথাটা প্রকাশ হয়ে যায়. লোকে ধ'রে নেবে আমি তাকে ভালোবাসি। কিন্তু সত্যিই তো আমি তাকে ভালোবাসতে পারি না। ও রকম কোনো আইডিয়াও আমার পক্ষে অসহ্য। তাহলে কেন আমার মন যেখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে?

কারণ অবশ্যই আছে। আর সেই কারণের জন্যই তার সন্ধান করছি। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করার পথটাই পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সে কোন্‌দিন হঠাৎ এক সময়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। এই মুহূর্তেও আসতে পারে। অথবা খানিক পরে। মনে হচ্ছে বুঝি এখনই এই বিশাল বিল্‌ডিংস-এর কোথাও-না-কোথাও সাক্ষাৎ ঘটে যাবে। বুঝি অচেনা কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই সেই লোকটি বেরিয়ে পড়বে, অথবা বেরিয়ে পড়বে তার চেনা-জানা লোক। কিন্তু কেউ জানে না আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার কথাই ভাবছি। এই যে টেলিফোনটা বেজে উঠল। এক মিনিট।

'হ্যাঁ। আমিই জানতে চেয়েছিলাম। একটু দাঁড়ান, নোট ক'রে নিই। ইয়েস্‌··· বলুন। মিস্টার আর. কে. বিশ্বনাথ শর্মা— এই তার ফুল্‌ নেম? ডোর্‌ নাম্বার ষোল? এলাকা? মন্দেইবেলী? থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্‌। টেলিফোন নাম্বার? ও, বাড়ীতে টেলিফোন নেই। তাঁর অফিস নাম্বার? বলুন... ডাবল্‌

এইটু... ও. কে. থ্যাঙ্কস্ এ লট্ !'

এই যে আমার চোখের সামনে, আমার রাইটিং প্যাডের ভিতরকার ব্লটিং পেপার শীটে, লাল পেন্‌সিল দিয়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রেখেছি র. কু. ব. ছদ্ম-নামের লেখক আর. কে. বিশ্বনাথ শর্মার ঠিকানাটা। মিছিমিছি ফোন ক'রে ঠিকানা জোগাড় করলাম। হোয়াট্ নেক্স্ট্ ?

আমার কাজের ধারাই এই রকম। এটা করব, ওটা করব— ওই ভাবনা মাত্রই সার। কাজ আর হয় না। কতবার ভেবেছি— লেটার্স্ টু দ্য এডিটর কলমে চিঠি লিখব। লেখা কি হয়েছে ? এও তো দেখছি সেই রকম।

আমি একটা গল্প লিখলে কেমন হয় ? আমার এক্স্পিরিয়েন্স, আমার প্রব্লেমস্... ছি ! গল্প লিখতে হলে প্রথমেই দরকার— আই শুড্ স্টার্ট থিঙ্কিং ইন তামিল্ ! আই অ্যাম সরি ! এই সামান্য কথাটাও কি তামিলে ভাবা যেত না ? গল্প লিখতে হলে প্রথমে চাই তামিলে চিন্তা করা।

আমার অভিজ্ঞতা, সমস্যা, ভাবনা-চিন্তা— এই সব নিয়ে একটা গল্প লেখা যেতে পারে। কিন্তু র. কু. ব. যেমন লেখে, তেমনি ক'রে লিখতে পারব কি ? কেন পারব না ? ঠিক তারই মতো লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অন্য কোনো রকমে লিখলেই হবে। কিন্তু লিখতেই হবে।... ভালো কথা। আপাতত কী করা যায় ? র. কু. ব.-র সঙ্গে গিয়ে দেখা করব ? এই ঠিকানায় যে রাস্তার কথা লেখা রয়েছে, তার থেকে তো মনে হয় কোনো-একটা অন্ধ-ঘুপচি গলি-টলি হবে। নয় তো কি ? লেখকরা কি বড়ো বড়ো বাংলো বাড়ীতে থাকে নাকি ? মনে হয় র. কু ব. কোথাও কোনো চাকরি-বাকরিও করে। নিশ্চয়ই অনেকগুলো ছেলে-মেয়ের বাপ। বিশ্বনাথ শর্মা এই পুরো নাম থেকে মনে হয়— লোকটার বয়সও বেশ বেশিই। নিশ্চয়ই বিশ্বনাথ শর্মা নামধারী কোনো লোক সেই গাড়ীতে ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারে না। কাজেই নির্ভয়চিত্তে গিয়ে দেখা করব। কিন্তু মনে থাকে যেন বিশ্বনাথ শর্মাও একজন পুরুষ মানুষ। অতএব সাবধান। আমার এ কথা বলার দরকার নেই যে আমিই তার 'অগ্নিপ্রবেশ' গল্পের নায়িকা। তবে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি কেন ? কী বলব তাকে ? কী আর বলব ? তার লেখার একজন অনুরাগিণী হিসেবেই দেখা করতে এসেছি— এইটুকু বলাই কি যথেষ্ট নয় ?... যাই হোক, আগে গিয়ে দেখা তো করি। তার পর অন্য কথা।...

আচ্ছা, তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময়ে কিছু একটা কিনে-টিনে নিয়ে গেলে কেমন হয় ? কী কিনে নেওয়া যায় ? আজ পর্যন্ত আমি কোনো লোককেই কিছু উপহার-টুপহার দিই নি। আমাকেও কেউ দেয় নি। আচ্ছা, কী কিনে নিয়ে যাব ? হঠাৎ একটা আইডিয়া মাথায় এল। তার লেখা যে-কোনো একখানা বই নিয়ে যাব। কী বোকা ! তারই বই নিয়ে তাকেই উপহার দেওয়া ? মন্দ কী, বেশ ভালোই তো হবে ! তবে তাড়াহুড়োর কী আছে ?... তার লেখা বই কিনে দিয়ে

তার স্বাক্ষর আদায় ক'রে যদি আমিই উপহার নিই ? তাহ'লে কেমন হয় ? ভেরি গুড আইডিয়া। লেখক নিশ্চয়ই আমার এই আইডিয়ার খুব প্রশংসা করবে। করবে কি ? ভগবান জানে ! আমার আগে কত লোক এইভাবে তার কাছে গিয়ে তারই বইয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে গেছে ? তাতে কী ? আমিও তাদের মতোই করব। আজ হল কী বার ? বুধবার। আগামী শনিবারের দুপুর বেলায় গেলে কেমন হয় ? সে তার বাড়ীতে থাকবে তো ? ফোন্-এ এনগেজমেণ্ট ক'রে গেলে হয় না ? ফোন্ নাম্বারটা কত ? ভাবল্ এইটু...

আমি র. কু. ব.-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। প্যারিস্ কর্নার, ছ'মাস আগে যেখানে আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ছিল, সেখান থেকে বীচ রোড ধরে বাস-এ করে যাওয়া যায়। এখন মাউণ্ট রোড অফিসে আসার পরে··· ধুৎ ! এই রুট-টা ভারি বোরিং লাগে।

মন্দেইবেলী বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বাসটা দাঁড়াল। গলিটা কোন দিকে হবে কিছুই জানি না। কাউকে যে জিজ্ঞেস করব সে সাহসও নেই। তা বলে কি প্রত্যেকটা গলি ঘুরে ঘুরে দেখা সম্ভব নাকি ?··· ওই যে একটা সাইকেল-রিক্সা আসছে। ওর কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। কী যেন রাস্তার নামটা ? হাতের মধ্যে মুঠো করে রাখা কাগজখানি খুলে একবার দেখে নিলাম। রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল— 'মাইজী, আপনার নামা উচিত ছিল আগের স্টপে, মার্কেটের কাছে। এখন ফিরে যেতে হলে আপনি এই রাস্তায় বাস পাবেন না। কারণ এটা হল ওয়ান ওয়ে··· ঠিক আছে। ছ'আনা পয়সা দেবেন মা। বাড়ীর সামনেই নামিয়ে দেব।'

কথাটা ভালোই মনে হল। সাইকেল-রিক্সায় চড়ে বসলাম। দু'তিনটে রাস্তা ঘুরে অবশেষে এই যে সেই রাস্তা— রাস্তা তো নয় গলি খুবই সরু গলি। সামনে আর একটা গাড়ী আসছে। দু'জনেই ঘণ্টা বাজিয়ে পরস্পরকে সতর্ক করে দিচ্ছে। কেউ একটু সরে গিয়ে অন্যকে পথ ছেড়ে দেবে না। মুখোমুখি গাড়ী থামিয়ে দুটো লোকই ঝগড়া শুরু করে দিল।

আমার রিক্সাওয়ালার যুক্তি এই, সে সওয়ারী নিয়ে আসছে। কাজেই খালি গাড়ীর চালকের উচিত সরে গিয়ে আমাদের গাড়ীকে পথ ছেড়ে দেওয়া। হয়তো সাইকেল রিক্সাওয়ালাদের ধর্ম অনুযায়ী এইটেই ন্যায়নীতি। কাজেই সে ধর্মের জন্য লড়াই শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ওদের বাগ্‌যুদ্ধের ভাষাটা আর একটু কম অশ্লীল হলে কি খুব ক্ষতি হ'ত ? খুব ভয় পেয়ে গেলাম আমি। বেশ বুঝতে পারলাম একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বে না ওরা। হঠাৎ একদিকে ফিরে তাকিয়েই দেখলাম পাশের বাড়ীটার দরজায় ১৩ নম্বর লেখা। আর তো মাত্র তিনটে বাড়ী, বাকী পথটুকু হেঁটেই যাই।

চল্লিশটি পয়সা হাতে নিয়ে বললাম— 'রিক্সাওয়ালা, এখানেই আমি নেমে যাচ্ছি। এই নাও তোমার পয়সা।' এই বলে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। চোদ্দ, পনেরো··· তারপরে ১৫এ, ১৫বি··· এই যে ষোল। এই বাড়ীটা কি? বাড়ীটার পুরোভাগে টালির ছাদ, বারান্দায় গ্রিল, বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার জন্য একটা লম্বা সরু পথ। আগে আমরা ট্রিপ্লিকেনে যে টাইপের বাড়ীতে ছিলাম, সেই রকম আর কি? মনে হল এখানে এক-একখানা ঘর নিয়ে অনেক ঘর ভাড়াটে। বাইরে অন্ধ্র দেশের কডডমা পাথরে বাঁধানো বারান্দায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ রমণী বসে আছেন। এক কোণে, মাসিকের জন্য আলাদা করা ঘরে আর একজন রমণী বসে জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে আমায় দেখছে। একে ঠিক রমণী বলা যায় না। বয়স কিছু কম। আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটো হবে। একই সময়ে, একই জায়গায় চার-পাঁচজন গৃহিণীকে বসে থাকতে দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই বাড়ীটার মধ্যে অনেক ভাড়াটের বাস। ওখানে বাঁধানো সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার অনেকগুলো খণ্ড ছড়ানো। সকলেই বেশ মনের সুখে যে যার দৈনন্দিন জীবনের হিসাব-পত্র দিচ্ছে।

কোণের ঘরে বসা রমণীকে ছুঁয়ে ফেলে একটি ছেলে ভিতরের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। তার উদ্দেশ্যে দাঁত কডমড করে ছেলেটির মা বলে উঠল— 'এই হতভাগা, এদিকে আয় বলছি। জামা খুলে দিয়ে যা··· আসুক তোর বাবা। আজ তোকে মার খাওয়াব দেখিস।' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম— 'আচ্ছা, এখানে কি মিষ্টার বিশ্বনাথ শর্মা থাকেন?' সকলেই আমার দিকে ফিরে তাকাল। কেন জানি না, আমার হাত কাঁপতে লাগল, জিভটা শুকিয়ে এল। মনে কেবল একটি দুশ্চিন্তা, কেউ যদি বলে ওঠে— 'একটা বয়স্কা মেয়েছেলে একজন অজাত পুরুষের খোঁজ করছে, ব্যাপারটা কী?'

সেই কোণের ঘরে বসা রমণীটি একটু হাসল। তার হাসিটি একটি শিশুর হাসির মতো মনে হল। সে হেসে বলল— 'হ্যাঁ, এখানেই থাকেন। আমার স্বামী তিনি। আপনি কে? কী চাই আপনার?' বেশ সহৃদয় কণ্ঠে রমণী জিজ্ঞেস করল। কিন্তু বাকী সকলের চোখে কেমন সন্দেহের ছায়া। মিসেস্ শর্মার যাতে কোনো অবিশ্বাস না হয় সেইজন্য আমি প্রমাণ স্বরূপ হাতের বইখানা দেখালাম। 'বিশে কিছু নয়। আমি তাঁর লেখা গল্পের একজন পাঠিকা মাত্র। তাঁর সঙ্গে দেখা ক এই বইখানায় তাঁর একটা স্বাক্ষর নিতে চাই।' রমণীর মনে বেশ একটু গর্বের ভাব হয়েছে বোঝা গেল। হবে না তো কী? র. কৃ. ব.-এর মতো একজন লেখকের স্ত্রী, গর্ব না হয়ে পারে? আমার মতো কত লোক তাঁর খোঁজ করতে আসে। কিন্তু স্ত্রীর ভাগ্যে শেষপর্যন্ত ওই গর্বটুকুই। নইলে এদের বাড়ী-ঘর দেখলেই বোঝা যায় লেখক মহাশয়ের আর্থিক অবস্থাটা কী-রকম। এর জন্য তো আর গর্ব করা চলে না।

মিসেস শর্মা একটু জোর গলায় বলল— 'আরে কৌসি! এই তো এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দিদি, আপনি একটু ভিতরে দেখুন তো। কৌসীকে দেখলে বলে দেবেন, এই ভদ্রমহিলাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যেতে।'

ভিতরে উঠোনে দেয়ালের একপাশে তুলসীমঞ্চের কাছে কলতলায় জল ধরবার জন্য একজন বৃদ্ধা মহিলা দাঁড়িয়ে। মাথার কাপড় টেনে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। বৃদ্ধার পাশে বছর ছয়েকের একটি মেয়ে, দেহের উপরিভাগে কোনো জামা নেই, কোমরে একটি সুতীর ঘাগরা শক্ত করে বেঁধে বুকের ওপর একটা সেলেট ঠেকিয়ে, জিভটা বের করে কিছু একটা লিখছিল— এই মেয়েটিই বোধহয় কৌসী।

'যা, দেখে আয় তোর মা ডাকছে কেন?' এই বলে বৃদ্ধা রমণী কৌসীকে ঠেলা দিল। 'যাব না, যাও'— এই বলে কৌসী বৃদ্ধার আদেশ অগ্রাহ্য করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

বাইরে বসে যাঁরা গল্পগুজব করছিল, তাঁদেরই একজন বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করে বলল— 'দেখছেন কী?··· আপনাদের বাড়ীতেই··· আপনার ছেলের খোঁজে এসেছে। ডেকে ভেতরে নিয়ে যান।' সেই বৃদ্ধা জলের কলসীটা তুলে আমার কাছে এসে দাঁড়াল : 'তুমি কে মা? আমাদের বিশুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? তুমি বুঝি ওদের কলেজে পড়ো?'

কোন্ কলেজ বুঝতে পারলুম না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল, র. কু. ব. অর্থাৎ বিশ্বনাথ শর্মা বাড়ীতে বিশু নামে পরিচিত। বৃদ্ধা আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর আশা করেছিলেন মনে হয় না। তবু আমি কৈফিয়তের সুরে বললাম— 'আমি আপনার ছেলের সমস্ত গল্পই পড়ে থাকি···। এরপরে আর আমার মুখ থেকে একটি কথাও বেরুল না। র. কু. ব.-এর মেয়ে কৌসী চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে। জলের কলসী নিয়ে বৃদ্ধা এগোতে থাকলেন, আমি তাঁর পিছন পিছন চললাম। কৌসী পূর্বাহ্নেই আমার আগমনবার্তা ঘোষণা করতে করতে ছুটে গেল— 'বাবা! কে একজন মামী তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।' মনে হল এদের অংশ বাড়ীটার পিছন দিকে। দু-তিন ঘর ভাড়াটে পার হয়ে যেতে হবে··· অনেকগুলো ছেলেমেয়ের চেঁচামেচি··· মনে হল যেন একটা এলিমেন্টারী ইস্কুলের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বড়ো ঘরগুলির মধ্যে এমনভাবে সারে সারে শাড়ী ঝুলছে যেন সব তোরণ সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

র. কু. ব.-এর মা চলতে চলতে কথা বলছেন— শুনলে মনে হয় এ সব কথা কাউকে লক্ষ্য করে বলা নয়, নিজের মনেই নিজে বলে যাচ্ছেন। সব সময়েই বুঝি ইনি এইভাবে সমানে বক্ বক্ করেন।

"শয়তানগুলি সারা পথ জুড়ে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে··· দিব্যি করে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না যে এটা বামুনদের বাড়ী। পিছনের দিকে তো জলই আসে

না পাইপে··· দু-দুটো উঠোন পেরিয়ে তবে গিয়ে জল আনতে হয়। আর ঝগড়াও বাধে এ নিয়ে। ওরা বলে, 'আমরা আগে জল ধরব।' এরা বলে, 'আমরা আগে।' আমি তো দু'বছর ধরে পই পই ক'রে বলে আসছি— 'আর একটা বাড়ী দেখে চলে যাই।' কিন্তু আমি বললেই কি হবে? বাড়ী পাওয়া কি অত সহজ কথা নাকি? তোমার মতো যারা এখানে আসে, তাদের সকলকে বলে রেখেছি, তুমি কোথায় থাকো মা?'

এতক্ষণে এই একটি কথাই তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের বাড়ী এগ্‌মোর। সেই যে ওখানে পঞ্চবটী আছে না···?'

'আমি পঞ্চবটীও জানি না, কিষ্কিন্ধ্যাও জানি না।··· আমার বোনপো, বুঝলে মা, তিরুচি থেকে বদলী হয়ে সকলকে নিয়ে এখানে এসেছে তিন মাস হল। ঐ যে কি বলে 'অশোকনগর' না কি, সেখানে থাকে। 'যাব যাব' তো বলছি, যাওয়া হবে কি? একা যে যাব তা রাস্তাঘাট জানা থাকে, সময় হয়, না-হয় একবার ঘুরে আসতাম। একজন সঙ্গে না থাকলে চলে? আমার সময় হয় তো বিশু বাড়ী থাকে না, বিশু বাড়ী থাকে তো আমার সময় থাকে না।··· ওরে ও বিশু, দ্যাখ্ তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কে··· তোর গল্পটল্প নাকি পড়ে। আহা! বেচারী কতদূর থেকে এসেছে! এগ্‌মোর না পঞ্চবটী, সেখান থেকে এসেছে কত আশা নিয়ে।··· বসো মা, বসো' এই বলে ভিতরে গিয়ে কলসী টি নামিয়ে রাখলেন।

এই পিছন দিকের আঙিনায় মংগলূর মার্কা টালির ছাদ দিয়ে ছোটো ছোটো বেশ কয়েকটি ঘর সারি সারি দাঁড়িয়ে। সেই তিন-চারখানা ঘরের একখানি ধুরন্ধর লেখক র. কু. ব. মহাশয়ের রাজপ্রাসাদ বলে বিশ্বাস করাই শক্ত।

মনে হয় মাত্র দু'খানা রুমের বাসা। একখানা তো ঢুকলেই পথে পড়ে। আর একখানি ঠিক সেইমতোই বাঁ দিকে— রান্নাঘর বলে মনে হয়। আমি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার ডান দিকে তিন ফুট চওড়া একটি ছোট্ট বারান্দা। বারান্দাটার একদিকে চটের পর্দা দিয়ে ঢাকা, অন্যদিকে বাঁশের বেড়া দরজা। এইটেই বোধহয় র. কু. ব. মহাশয়ের 'স্টাডি'। দুপুরবেলায় কি ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি? আমি তাহলে ডিসটার্ব করলাম তাঁকে।

না, শব্দ শুনে বোঝা গেল তিনি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠছেন। এই যে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসছেন। আমি বুঝলাম ইনিই হলেন আমার জীবনকথা নিয়ে রচিত গল্পটার স্রষ্টা। কিন্তু উনি কি জানেন যে আমিই তাঁর সেই গল্পের নায়িকা? না জানেন, না জানুন। ও বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয়। কারণ গল্প ও জীবন আলাদা জিনিস। গল্পে যে চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি দেখাই জীবনে সেই একই চরিত্রের প্রতি স্বয়ং গল্প-লেখকও সব বেদনা প্রকাশ করতে পারেন কিনা সন্দেহ।

না, আমাকে আমি ধরা দিয়ে অত খেলো হতে চাই না। আমি যে এতদিনে এটুকু বোঝার মতো বড়ো হয়েছি এই ভেবেই আমি খুশি। আমার মা আমাকে বলেছে— 'কাউকে কখনো সহজে বিশ্বাস কোরো না। যতদূর সম্ভব নিজেকে গোপন করেই রেখো। নইলে সকলেই তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে— তোমার মা, দাদা, মামা, সকলেই...'

এই যে চটের পর্দা সরিয়ে লেখক মহাশয় দেখে নিচ্ছেন— আগন্তুকটি কে?

৪

'ইয়েস্... প্রভু অরগানাইজেশান্‌স্'

'...............'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'...............'

'আপনি কোন্ বিষয়ে জানতে চান জানতে পারি কি?'

'...............'

'বেশ, আমি তাঁর সেক্রেটারিকে দিচ্ছি, আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। প্লিজ হোল্ড্ দা লাইন।'

'হ্যালো, রাও স্পীকিং। মিস্টার প্রভু ইজ নট্ ইন্ স্টেশন। আপনি কে?'

'............ .'

'রিলেটিভ? বোধ হয় দুপুরের প্লেনে আসবেন। দুটোর পরে একবার তাঁর বাড়িতে ফোন ক'রে দেখতে পারেন।'

সেই বৃহৎ বাংলোর নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্যে সেই হলঘরে অনেকক্ষণ ধ'রে টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। বাইরে বেশ রোদ। অনেকদূরে কম্পাউণ্ড পাঁচিলের গা ঘেঁষে রবারের নল দিয়ে ঘাসের ওপর মালী জল দিয়ে চলেছে। আর বাড়ীর খিড়কী বারান্দায় কয়েকজন চাকর-বাকর ও রাঁধুনী বিষম উৎসাহে এমনভাবে বলছে যে অতদূরে টেলিফোনের শব্দ তাদের কানে পৌঁচচ্ছে না। সেই বাড়ীর সর্বময়ী কর্ত্রী পদ্মা মধ্যাহ্ণ ভোজনের পরে দোতালায় তার এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড ঘরখানিতে একা একা বসে পান চিবোচ্ছে। আর ঘরে শোনা যাচ্ছে রেডিওতে সিনেমার গান।

নীচের হলঘরে অনেকক্ষণ ধ'রে টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। ঐ যে বড়ো একখানি গাড়ী কম্পাউণ্ডের মধ্যে এসে ঢুকছে। শনিবারের স্পেশাল ক্লাস সেরে কলেজ থেকে ফিরে এল মঞ্জুলা। গাড়ী থেকে নেমেই টেলিফোনটা বাজছে শুনে একটু দ্রুত পায়ে হলঘরে এসে পৌঁছল।

'একটা লোকও নেই এখানে ? সবগুলো কোথায় গিয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে'— এইরকম মনোভাব নিয়ে মঞ্জুলা ছুটে গিয়ে রিসিভারটা ধরল। 'হ্যাঁ, মিস্টার প্রভুর বাড়ি থেকেই বলছি। আপনি কে কথা বলছেন ? বাবার সঙ্গে কথা বলবেন ?

'..............'

'আই ডোণ্ট নো। এক মিনিট দাঁড়ান। জিজ্ঞেস ক'রে বলছি।' টেলিফোনের পাশে রিসিভারটা রেখে দিয়ে সে 'মা মা' বলে ডাকতে ডাকতে দু'দুটো সিঁড়ি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দোতালায় গিয়ে উঠল। মায়ের ঘরের দরজা খুলতেই ভিতরকার সিনেমা সঙ্গীত ভেসে এল।

'মা, বাবাকে আজ দু'দিন ধ'রে দেখছি না। সকালবেলাতেই আসবার কথা ছিল না ? কে একজন গঙ্গা বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বাবা কি অফিসে ?'

'সকালবেলা বাঙ্গালোর থেকে টেলিফোন এসেছিল। গাড়ী চলে গেছে এয়ারপোর্টে। তোমার বাবা কবে গেল, কিজন্য গেল কে জানে বাপু ? এখন রেস সীজন, তাই না ? ঠিক ঠিক। অফিসে রাও-এর সঙ্গে কথা বলতে বলে দে। বাড়ীতে কিজন্য ফোন করে ?'

মঞ্জুলা দরজাটা বন্ধ করে দিতেই সিনেমার গান আর বাইরে যেতে না পেয়ে ঘরের মধ্যেই গুমরে গুমরে মরছে। দোতলা থেকে নামবার সময়ে কাঠের তৈরী চকচকে মসৃণ হাতলকে হাতের তালু দিয়ে চেপে ধ'রে 'কিরিচ কিরিচ' ধ্বনি তুলে নীচে এসে রিসিভারটা তুলে ধরল মঞ্জু।

'আপনি কি ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাঁর ডটার। অফিসের কিছু হলে আজ হবে বলে মনে হয় না। বাবার সেক্রেটারি মিস্টার রাও অফিসেই আছে, ইউ টক্ টু হিম্।'

'..............'

'ইয়েস ইউ আর রাইট' হি ইজ নট ইন স্টেশন। বিকেল তিনটের পরে ফোন করবেন। প্লিজ জাস্ট হোল্ড অন, হি ইজ কামিং...'

ছোটো গাড়ীখানা তখন কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকছে দেখে সেই গাড়ীখানাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য পোর্টিকো-তে দাঁড়িয়ে থাকা বড়ো গাড়ীটা ওখান থেকে গিয়ে শেডের মধ্য গিয়ে ঢুকল।

ইতিমধ্যে কলেজের আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের মতো বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত প্রভু গাড়ী থেকে নেমেই হাতের জলন্ত সিগারেটটা মাটিতে ফেলে দিয়ে পায়ের জুতো দিয়ে ঘষে ঘষে নিভিয়ে দিয়ে তাকিয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে মঞ্জু।

'ও ! দিস ইজ অ-ফুল। বাঙ্গালোরের ক্লাইমেট কী রকম জানো ? নেক্স্ট টাইম তুমিও যেও। এমনি ওখানে উইক-এণ্ড কাটানো যাবে।'

'তোমার সঙ্গে ? মা কি আমায় যেতে দেবে ?'

'তোমাই ? আমার সঙ্গে যেতে দেবে না ? তাহলে তোমার মাকেই সঙ্গে যেতে বোলো। মঞ্জু। ইউ ডু ওয়ান থিং— আগামী শনি-রবিবার তোমার মাকে নিয়ে চলে যাও বাঙ্গালোর। ইট ওয়াজ ওয়াণ্ডারফুল ! আমিও এসে তোমাদের সঙ্গে জয়েন করব।'

'ও সমস্ত কিছুই হবে না। এখন আমার এক্জামস্। তোমার আর কী বাবা ? বেশ জলি মুডে আছ। না আছে একজামস্ না আছে বিজনেস। কিছু ভাবনা নেই তোমার। ভালো কথা তোমার একটা ফোন কল এসেছে। অনেকক্ষণ ধ'রে ওয়েট করে আছে— গঙ্গা নামে কে একজন।'

'গঙ্গা ?' কপালটা চুলকোতে চুলকোতে প্রভু টেলিফোনের দিকে এগোতে মঞ্জু ভিতরে চলে গেল।

গাড়ী থেকে ড্রাইভার একটা ছোট্ট বাক্স তুলে নিয়ে দোতলার আর-একদিকে প্রভুর ঘরে নিয়ে গেল।

'ইয়েস. প্রভু হিয়র—'

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। গলাটা ধ'রে আসছে। চোখে বুঝি জল বেরিয়ে আসতে চায়।

'হ্যালো... হ্যালো...' তার কণ্ঠস্বর এসে আমার কানের মধ্যে বিঁধছে।

'হ্যালো, আমি গঙ্গা কথা বলছি'— এই সামান্য কথাটা বলতে আমার গলাটা কেঁপে উঠল।

'গঙ্গা ? কোন্ গঙ্গা ? হুইচ নাম্বার ডু ইউ ওয়াণ্ট প্লিজ ?'

'এই নাম্বারই চাই। এটা রঙ নাম্বার কল নয়। আপনি আমাকে জানেন। নট মাই নেম... নাম বললে চিনবেন না। সাক্ষাৎ দেখা হলে চিনবেন।'

'ও' ! এই 'ও' কথাটির কত-না অর্থ। ওর মধ্যে এক দীর্ঘকালের ইতিহাস লুকিয়ে আছে, আর লুকিয়ে আছে আমার সারা জীবনের ভাগ্য। সে কি আমায় চিনতে পেরেছে ? বুঝতে পেরেছে আমি কে ? সেই বারো বছর আগেকার এক সন্ধ্যাবেলার কথা কি তার মনে আছে ? মনে আছে আমার চেহারা ?

'কোন্ বিষয়ে আমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার ?' সত্যই তো আমি কোন্ বিষয়ের কথা বলব ?... সে বোধ হয় এখনও বুঝতে পারে নি আমি কে। নইলে বুঝতে পারলে আর কেন জিজ্ঞেস করবে ? নাকি বুঝেসুঝেও না বোঝার ভান করছে ? আমি আমার মনের দুর্বলতা কাটিয়ে বেশ দৃঢ় কণ্ঠে কথা বললাম। সৌজন্য বজায় রেখে অথচ অধিকারের ভাবটুকু না হারিয়ে কথা বললাম। 'বিষয়টা যে কী তা টেলিফোনে বলার মতো সামান্য নয়— ম্যাটার ইজ নট সো সিম্পল। আসল কথা হচ্ছে আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আমাকে দেখলে তখন আপনি বুঝতে পারবেন। আপনার নামও আমি

জানতে পারলাম মাত্র— কাল। কিন্তু আপনি আমাকে ভালো ভাবেই চেনেন। আমাদের দুজনেরই একবার দেখা হয়েছিল বারো বছর আগে। একদিন খুব ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল— সন্ধ্যাবেলায়— আমাদের কলেজ গেটের সামনে— বাসস্ট্যাণ্ডে— মনে পড়ে? হ্যালো— হ্যালো, ডু ইউ হিয়র মী!'

'ইয়েস! আই হিয়র ইউ!' তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন রুদ্ধ হয়ে এল।

'আপনি আমাকে আপনার গাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন মনে পড়ে? আইল্যাণ্ড গ্রাউণ্ডে গিয়েছিলেন। জায়গাটার নাম যে আইল্যাণ্ড গ্রাউণ্ড সে কথা আমি জানি বছর পাঁচেক পরে। আপনার মনে আছে ঘটনাটা?— এখন আপনাকে দেখলে আমি আপনাকে চিনতে পারব কিনা সে বিষয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ। তবে আপনার সেই গাড়ীখানাই আমার নিশানা। কিন্তু তারপরে আর আপনার সেই গাড়ীখানা দেখি নি। কেনই বা দেখব? দরকার ছিল না কোনো। আই হ্যাভ নেভার বদারড্ টু সি ইউ, নাইদার ইউ নর ইওর কার। কিন্তু এখন অবশ্যই একবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

'তোমার নাম গঙ্গা?' তার দীর্ঘশ্বাস সাপের হিস্‌হিস্ শব্দের মতো আমার কানে এসে আগুনের হলকার মতো লাগল।

আচ্ছা, তার চোখ দুটো কেমন? সাপের মতো না ময়ূরের মতো? বারো বছর আগে চোখের এক প্রান্ত থেকে দেখবার সময়ে সেদিনকার সেই অন্ধকারে— স্তিমিত আলোয় যেমন মনে হয়েছিল, আজও ঠিক সেইভাবেই আমার মনে সেই চোখের ছবি দেখতে পাই।

এই যে আমার অফিসে টেবিলের উপর ওর কোম্পানির এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক স্যুভেনীরে প্রকাশিত ওর ছবি— কয়েকটা পৃষ্ঠা ওল্টালেই চোখে পড়ে। ছবির নীচে ওর নামটাও ছাপা রয়েছে। এই নাম পড়ে বা ছবি দেখে আমি ওকে আবিষ্কার করি নি। এই ছবি যে তারই এটা জানার পরেই সেই চোখের মধ্যে সেই সর্পচক্ষুর সন্ধান পেয়েছি।

'সে সব কথা কি মনে আছে আপনার? এখন আমি কে বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন।'

যা-কিছুই জিজ্ঞেস করি-না-কেন. লোকটি সহজে 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলছে না। তার কথাবার্তার মধ্য থেকে কোনো একটা বিশেষ পয়েণ্ট ধরার উপায় নেই। তার কথার বেশির ভাগই হল হুঁ, উঁ, ও ইত্যাদি।

আচ্ছা. এ রকম লোক সে কতই তো দেখেছে, না? কত লোক একে বিশ্বাস ক'রে ফোন ক'রে ক'রে প্রতারিত হয়েছে কে জানে। এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে আমি ঠোঁটটা কামড়ে ধরলাম। দুটো লোকের মধ্যে এই নীরবতা একটা সংলাপের মতোই দীর্ঘ হয়ে চলেছে। একবার ভাবলাম 'ঠক' ক'রে রিসিভারটা রেখে দিই। আবার ভাবলাম— আমি কেন রাখি, ওদিক থেকেই রাখুক। তাই

আমি চুপ করে আছি। মনে হল একবার বিদ্রূপের ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করি— কী ব্যাপার! কোনো কথাবার্তা নেই যে! এমন সময়ে···।

'গঙ্গা!'··· আহা! সে তাহলে আমার নাম ধরে ডাকছে। এখন তাকে কী যে উত্তর দেব বুঝে উঠতে পারছি না। আমি শুধু বললাম— 'উঁ'। সে তখন এক নাগাড়ে বলতে থাকল— 'আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছি। সেদিনের পরে তোমার বিষয়ে কতটা ভেবেছিলাম আমার মনে নেই। তবে ভেবেছি ঠিকই। কিন্তু বারো বছর পরে তোমার কাছ থেকে এই রকম একটা ফোন কল আসবে এ কথা আমি ভাবতেই পারি নি। সত্যিই কি তুমিই সেই? ও! তুমি কত ছোটো ছিলে সেদিন। আমারও এই ইচ্ছা ছিল তোমার কথা কিছু জানব। আচ্ছা, তুমি এখন কোথেকে কথা বলছ? হাউ আর ইউ? হোয়াট আর ইউ? তোমার বাড়ীতে টেলিফোন আছে?'

একটার পর একটা সে কত কথা জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে। আমি সব কথায় কেবল 'উঁ উঁ' করে যাচ্ছি তাও ধরা-ধরা গলায়। বুকটা কেমন ব্যথা ব্যথা করছে। কেন যে আমার এখন কান্না পাচ্ছে জানি না; ওকে এখন ভর্ৎসনা করা, অভিশাপ দেওয়ার কোনো অর্থ নেই বুঝলাম।

'হ্যালো··· হ্যালো··· গঙ্গা! ডু ইউ হিয়র মী? প্লিজ ডোণ্ট ডিসকানেক্ট। হ্যালো!'

আমি রিসিভারটা রেখে দিয়েছি ভেবে ও বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে মনে ক'রে একটু দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললাম— 'আই অ্যাম সরি! আই হিয়র ইউ।'

'তুমি আমায় কী ভাবে খুঁজে বার করলে? হাউ ডিড ইউ স্পট মী?'

এতক্ষণে আমি আমার পিষ্ট মনটাকে একটু শিথিল করে দিয়ে হেসে হেসে বললাম— 'বড়ো মানুষ হওয়ার ঐ তো বিপদ। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে আপনারা কি রেহাই পেতে পারেন? পারেন না। আচ্ছা, এর আগে যে টেলি-ফোনে কথা বলছিল সে কি আপনার ডটার?'

'হ্যাঁ. কলেজে পড়ছে।'

'কলেজে?'

'হ্যাঁ, এই বছরেই ভর্তি হয়েছে।'

নিজের মেয়ে কলেজে পড়তে যাচ্ছে দেখেও কি আমার কথা ওর মনে পড়ে নি? কলেজে যখন পড়ছে তখন মেয়ের বয়স বছর পনেরো তো হবেই। তাহলে তখন— সেই বারো বছর আগে— তার বিয়ে-থা হয়ে গেছে?

'হোয়াই ডোণ্ট ইউ কাম হিয়ার? যখন খুশি এখানে চলে আসতে পারো। মাই ডোরস্ আর ওপেন ফর ইউ। ইউ মাস্ট মীট মাই ডটার। সী ইজ ভেরি সুইট, স্মার্ট··· '

নিজের মেয়ের এক নাগাড়ে প্রশংসা করে যাচ্ছে। আমি যখন কলেজে

পড়তাম, আমার মাও তখন পরীক্ষায় আমার নম্বর পাওয়া নিয়ে এইভাবেই প্রশংসা করে বেড়াত! নিজের মেয়ের প্রশংসা করছে করুক, কিন্তু তাতে আমার কী উত্তর দেওয়ার থাকতে পারে ঠিক বুঝলাম না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী কাজের জন্য ফোন করেছ?'

'আপনার সঙ্গে মীট করবার জন্য।'

'হঠাৎ? বারো বছর ধ'রে তো মনে হয় নি।'

'কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও কি পরিবর্তন হবে না? দু'মাস আগে পর্যন্তও আপনার সঙ্গে দেখা করবার কথা মনে জাগে নি। কিন্তু গত দু'মাস ধ'রে প্রতিটি দিন আমি আপনার খোঁজ করে বেড়াচ্ছি। আপনার গাড়ীখানাই আমার কাছে আপনাকে চেনার নিদর্শন। প্রতিদিন আমি কত গাড়ীই যে দেখেছি, কিন্তু আপনার সেই গাড়ীখানিই কেবল বাদ গেল। এখন আর কি সেই গাড়ীটা নেই আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ, আমার কাছেই আছে। তবে আমি ও'র এখন ব্যবহার করি না। বাড়ীর অন্য সকলেরা করে। আমার ডটার সেই গাড়ীতে করেই কলেজে যাতায়াত করে। আমি এখন একটা ছোটো কার রেখেছি। আজকাল এই হল ফ্যাশন।'

'ওহো! বড়ো মানুষ হওয়ার পরে ছোটো কার? বাই দ্য বাই, ডু ইউ হ্যাভ এ হোয়াইট কার?'

'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?'

'গত সপ্তাহে মাউন্ট রোডের দিকে গিয়েছিলেন কি?'

'কেন? দিনে দু-তিন বার আমি মাউন্ট রোড ধরে যাতায়াত করি। ব্যাপার কী?'

'বিশেষ কিছু নয়। আমাদের অফিসের সামনে সেদিন একটা সাদা গাড়ীর অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল। তখন আমি আপনার কথা ভেবে একটু ভয় পেয়েছিলাম।'

'তুমি কোন্ অফিসে কাজ করছ? আর ইউ ম্যারেড? তোমার বিয়ে-থা হয়েছে তো? ছেলেপিলে কটি?'

প্রশ্নটা শুনে আমি হেসে উঠলাম। একটু বিচিত্র হাসি। আমি যে হাসতে পারি এটা আমাদের অফিসের লোকদের কাছে একটু অদ্ভুত ব্যাপার বৈকি। তারা নিজেদের চোখ-কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। আচ্ছা আমি এত হাসছি কেন? ফোনে আমার হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে সে যেন ভয় পেয়েছে বলে মনে হল।

'হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার? এ ভাবে হাসছ কেন? এতে হাসবার কী আছে?' সে আমাকে আরও কী কী সব জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু আমি শুধু হেসেই চলেছি। সে সজোরে বলে উঠল— 'প্লীজ স্টপ ইট।' এদিকে আমার চোখ দুটি ছাপিয়ে অশ্রু ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে এ হাসি থামাতে পারে একমাত্র চোখের জল।

হায়! আমার পক্ষে কান্না সাজে না। অফিস-সুদ্ধ লোক আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

আমার চেয়ারটা রিভলভিং চেয়ার। আমি যে কাঁদছি সেটা যেন তারা দেখতে না পায়। আমি তাই হাসতে হাসতে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসবার জন্য চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে দিলাম।

আমার কণ্ঠে হাসি, মনে কান্না। সেই কান্না আসার পরে হাসিটা থেমে গেল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আমি এতক্ষণ পর তার প্রশ্নের জবাব দিলাম। 'ইয়েস। আমি একটা অফিসে চাকরি করছি। অন্যান্য খবর সাক্ষাতেই বলা যাবে। কোথায় আমাদের দেখা হতে পারে বলুন।' সে আমাকে অফিস অ্যাড্রেস জিজ্ঞাসা করল। ভাবে বুঝলাম যেন এখনই এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু সেটা তেমন সুবিধের না হয়ে দৃষ্টিকটু হবে বলেই আমার মনে হল। বাড়ীতে আসতে বলব কি? না, দরকার নেই। লোকটি কেমন না জেনে এই লোকটিই যে সেই লোক সে কথা পাড়া-প্রতিবেশীকে জানতে না দেওয়াই ভালো। বোধকরি মামা যা বলেছে তাই ঠিক, 'তাকে যে খুঁজে বার করবে, কথাটা ভেবে দেখো। এই কাজটা করবার জন্য তার কী দায় পড়েছে? খুঁজে বার করলেও সে তোমাকে বিশ্বাস করবে না। সে তোমাকে ভাববে কী জানো? ভাববে— গাড়ী থামিয়ে হাত ধরে টান দিলেই যারা উঠে বসে তারা কি ভালো হতে পারে?' বোধকরি সেইরকম কোনো মতলব নিয়েই লোকটা আমার সঙ্গে কথা বলছে।

এখন আমাকে খুব সাবধান হয়ে চলতে হয়। আমি আর সেদিনের মতো সহজ সরল বোকা মেয়ে নই। আমি এখন খুব, খুব চালাক হয়ে গেছি।

'সেই জায়গাতেই দেখা হবে।'

'কোন্ জায়গায়?'

'এর আগে— সেই বারো বছর আগে— যেখানে আমাদের দেখা হয়েছিল সেই জায়গায়। কলেজের গেটের সামনে বাসস্টপে— নইলে সাড়ে পাঁচটার সময়ে রাজাজী হলের কাছে সেই আইল্যাণ্ড গ্রাউণ্ডে আমাদের দেখা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়।'

9

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। তার মানে এখনো ঘণ্টা দুই বাকী। সেই প্রভুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের জন্য যাচ্ছি। বারো বছর আগে প্রথম সাক্ষাতের পরে আজ পর্যন্ত সেই সাক্ষাতের ফলাফল যা ঘটেছিল সেই-সব বুঝে দেখার চেষ্টা করছি।

আচ্ছা, সেদিন যদি ঐভাবে তার সঙ্গে আমার দেখা না হত? যদি সেই গাড়ীতে আমি না চড়তাম? যদি তার টানাটানির কাছে আত্মসমর্পণ না করতাম? বোকার মতো কাঁদতে কাঁদতে এসে যদি মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা না বলতাম?

কী আর এমন হত? সেদিন যে গল্পলেখক র.কু.ব. মহাশয়ের বাড়ীতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ রমণীকে দেখেছিলাম, তাদেরই মতো একজন পুরুষ মানুষকে বিয়ে ক'রে, পাঁচ-ছটি শিশুর মা হয়ে, সমস্ত জগৎকে সেই পতিদেবতার মধ্যে লুকিয়ে, সেই দেবতার ভয়ে ভীত হয়ে, কখনো-সখনো দেবতাকে ভয় দেখিয়ে—এর চেয়ে নারীজন্মের আর কী সার্থকতা আছে?

দরকার হলে হেঁশেলে হাঁড়ি-কুঁড়ি মাজা-ঘষার বদলে এই আমার মতো, ঐ যে সামনে বসে মেয়েটি সমানে টাইপ করে চলেছে ওর মতো, নয়তো ঐ মেয়ে-কেরানীদের মতো — যারা প্রতিমুহূর্তে এই ভেবে ভয়ে ভয়েই থাকে 'এ কী বলবে' 'ও না-জানি কী বলবে', যারা বিয়ের চিহ্ন মঙ্গলসূত্রটাকে ভিতরে টেনে নিয়ে ব্লাউজের আড়ালে লুকিয়ে রাখে অথবা ইচ্ছে করেই লাইসেন্স দেখাবার মতো বাইরে ঝুলিয়ে রাখে, তারপরে দু'বছরে একবার করে স্থূলোদরী হয়ে, মাঝে মাঝে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে কখনো বা তিনি এই বলেছেন, ওই বলেছেন, —মোটকথা নানাবিধ আলোচনায় অফিসটাকে করে ফেলবে র.কু.ব. মহাশয়ের বাড়ীর সামনের রোয়াক— লেখাপড়া শিখলেই বা কী, চাকরি-বাকরি করলেই বা কী, রোজগার করলেই বা কী, না করলেই বা কী, মেয়েদের জীবনই হল ঘানিটানার জীবন।

সেদিন লেখক মশাইয়ের ওখানে কথা প্রসঙ্গে আমি এই ধরনের নানা যুক্তি-তর্ক করেছিলাম। সেই 'অগ্নিপ্রবেশ' গল্পটার পরে এই মাস-ছয়েকের মধ্যে সে আরও দু'তিনটে গল্প লিখে ফেলেছে। কাজেই আমি গিয়েই সম্প্রতি লিখিত গল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। মিনিট দশেকের মধ্যে সেইসমস্ত গল্পের কথা শেষ করে আমি তাকে টেনে আনলাম আমার উদ্দিষ্ট গল্পের মধ্যে। তারপর থেকে রাত্রি সাড়ে সাতটায় যখন উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে ও তার মায়ের কাছে 'আসি গো' বলে নমস্কার জানালাম, সেই সময় পর্যন্ত ওই একটি গল্প নিয়েই আমরা কথাবার্তা বলছিলাম। তবু মনে হয় এখনও সে বিষয়ে প্রচুর আলোচনার অবকাশ আছে।

আমি বেশ কৌশল করে নিজেকে গোপন ক'রে রেখেছিলাম। তার গল্পটি নিশ্চয়ই আমার কাহিনী নিয়ে লেখা! কিন্তু সে আমায় চিনল না। আমি কিন্তু তাকে চিনে ফেললাম। বারো বছর আগে যারা আমায় দেখেছিল, তারা কি আজ আমায় চিনতে পারে?

র.কু.ব. নামধারী উঁচুদরের লেখক সকলের কাছেই বিশ্বনাথন্ নামে পরিচিত, ভদ্রলোক আমাদের কলেজে অ্যাটেণ্ডার ছিলেন বলে আমি সহজেই

তাকে চিনতে পারলাম। এখনও সে সেই কলেজ লাইব্রেরির অ্যাটেণ্ডার হিসেবে কাজ করছে। তখনকার দিনে এর মাথায় ছিল মস্ত বড়ো শিখা। শিখা না বলে জটা বলাই ভালো। কলেজের ছাত্রীরা প্রায় সবসময়েই তাকে ঘিরে থাকত এবং নানারকম ঠাট্টা-তামাশা করত। এমন-কি ছোলা ঝুনো নারকেলের মতো বাঁধা তার বিরাট শিখাটা দেখে অনেক মেয়ে নিজেদের ছোটো চুলের দুঃখে ঠাট্টাও করত তাকে। আবার তামাশা করত এই বলে— 'স্যার, স্যার, আপনি যখন শিখাটা কেটে ফেলবেন, আমাকে দিতে হবে কিন্তু। ভুলবেন না যেন।' সেও কিছু কম যায় না। উত্তরে বলত— 'তাই হবে, তাই হবে। কিন্তু সেদিন আসার আগেই তোমাদের চুলের কেতা যেভাবে দিনে দিনে খাটো হয়ে আসছে তাতে কি আর শিখার দরকার হবে?'

এখন আমার চোখের সামনে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার সেই দিনের চেহারা। বিদ্যা তার সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের লাইব্রেরিয়ানও যে সমস্ত বিষয় জানত না, তা ছিল তার নখদর্পণে। সকলেই এ বিষয়ে একমত। আমাদের কলেজে এমন একদল ছাত্রী ছিল যারা তাদের ক্লাসে অ্যাটেণ্ডেন্স্ না দিলেও লাইব্রেরিতে এসে রেজিস্টারে সাইন করতে একদিনও ভুলে যেত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন তার বাড়ীর আঙিনায় সেই মল্লিকাবিতানের নীচে দু'খানা বেতের চেয়ারে বসে আমরা কথা বলছিলাম, তখন তাদের বাড়ীর সদরের আলোটা তার পিছন দিকটায় পড়াতে তার মুখটা ভালো করে দেখতে পাই নি। আলোটা সোজা এসে পড়েছিল আমার মুখের ওপর। সেইজন্যই বোধহয় আমার মুখটা সে চিনেও থাকতে পারে।

নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল— 'আপনি তো বলছেন আপনি ইকনমিক্স্-এর এম. এ., তাই না? কোন্ কলেজ থেকে! আমি তার মুখটা দেখতে পারছিলাম না বলে তার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে পারি নি। আমার মুখটা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বলে আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমি তাকে এইটুকুই মাত্র বললাম যে আমি ত্রিরুচি ও চিদম্বরে পড়াশুনো করেছি। 'ওহো! আপনি তাহলে চাকরি পাওয়ার পরে মাদ্রাজ এসেছেন'— তার প্রশ্নের উত্তরে আমি সংক্ষেপে বললাম 'হ্যাঁ'। তারপরে পুনরায় সেই গল্প নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলাম। আমি বললাম— 'আচ্ছা, আপনাদের এই মাদ্রাজ শহরে কলেজের ছাত্রীদের বোধকরি এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, কী বলেন! আমি হলাম মফস্বলের স্টুডেন্ট। আমার তো এই গল্পের কথা বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হয় না।' ও! কী মিথ্যা কথাটাই না বলে ফেললাম।

সে শুনে একটু হাসল। অন্ধকারে কেবল তার চকচকে দাঁতগুলিই দেখা গেল এমন সময়ে দৌড়ে এল তার শিশু কন্যা কৌসী। তাকে কোলে তুলে বসিয়ে

তার পরে বলল— 'আপনিই প্রথম এমন কথাটা জিজ্ঞেস করলেন। সকলেই আসে ঝগড়া করতে— এমনি করে কি লেখা উচিত! কখনও যে এরকম ঘটনা ঘটেছে সে কথা কেউ জিজ্ঞেস করে নি। আপনি এই গল্পের কথা বলেছেন না! ওর মধ্যে আমার যেটুকু কল্পনা মিশিয়েছি, তা গল্পের শেষ দিকে। দেখুন, দশ-বারো বছর আগে আমাদের কলেজেই ওই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল।'

ঘরের আলোটায় চোখ জ্বালা জ্বালা করছিল বলে আমি একটু ছায়ার দিকে সরে বসলাম। সেই মল্লিকা-বিতান থেকে টুপ টুপ ক'রে ফুল ঝরে পড়ছে। শিশু-কন্যা তার বাপের কোল থেকে নেমে বৃষ্টির জল ধরবার জন্য যেমন হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে তেমনি ভাবে দৌড়ে দৌড়ে প্রতিটি ফুল ধরবার জন্য বিতানের নীচে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর মেয়ের বাবা আমাকেই আমার গল্প শোনাচ্ছে—আমার গল্পের মতো আর একটি গল্প নয়, আমারই গল্প।

মনে হয়, মেয়েটির নাম— অর্থাৎ আমার নাম— তার জানা ছিল না। কিন্তু সেই পুরুষটিকে সে ভালোভাবেই চিনত। সেই পুরুষটির জীবনযাপন প্রণালীই নাকি এই রকম। এই পর্যন্ত বলে লেখক কিছুক্ষণ কী চিন্তা ক'রে তার পরে বলল: 'সেই ঘটনার পরে সেই লোকটিকে আর সেই কলেজের আশেপাশে দেখা গেল না। সম্প্রতি সেই লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে একথা কিন্তু মনে হয় নি যে সে এখনও সেই-সব কাজ ক'রে চলেছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম — 'আচ্ছা, সেই মেয়েটির তার পরে কী হল কিছু বলতে পারেন কি?' একটি কথায় জবাব পেলাম— 'জানি না।' জবাব থেকে মনে হল যে লেখক যেন মেয়েটির কথা জানা একটা মুখ্য বিষয় বলেই মনে করে না। তার পরে সে বলল— 'কী আর হবে? তবে অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে শুনেছি, তার মা-বাপ সকলেই তাকে খুব প্রহার করেছে, রাস্তায় ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তার পরে সেই মেয়েটিকেও আর কলেজে দেখা যায় নি। ব্যস্, সেখানেই সব শেষ। তবে সেই-সমস্ত কথা শুনে মেয়েটির মায়ের ওপর আমি ভীষণ চটে গিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, আপনি কি তখনই— মানে এই ঘটনা শোনার পরেই— গল্প লেখা শুরু করেছেন? না আগেই লিখতেন?'

'আগেও লিখতাম। কিন্তু কেউ চিনত না। এত জনপ্রিয়তাও হয় নি। কী করে হবে? পত্রিকার সম্পাদক মশাইরা যে প্রায়ই গল্প ফেরৎ পাঠাতেন।'

'আচ্ছা, এত বছর কেটে যাওয়ার পরে সেই গল্পটা হঠাৎ এখন লিখতে আপনার ইচ্ছা হল কেন?'

লেখক আবার হাসল। হেসে বলল— 'র. কু. ব. এখনও সেই কলেজ লাইব্রেরির অ্যাটেণ্ডার। এই গল্পের ফলেই সেই কলেজের নাম-ডাক খুব বেড়ে গেছে। সাহিত্য সভায়, কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে সেই সামান্য অ্যাটেণ্ডার এমনভাবে মাল্যভূষিত হয় যে সে যেন একজন মস্ত বড়ো লোক।

বক্তৃতাও দেয়। অন্যান্য কলেজ থেকেও নেমন্তন্ন আসে। হ্যাঁ, এই গল্পের যে ভিলেইন, মানে সেই লোকটা, তার নাম হল প্রভু, পুরো নাম প্রভাকরন্। এ বছর কলেজের নতুন সেশন শুরু হওয়ার সময়ে হঠাৎ বারো বছর পরে আমাদের কলেজ কম্পাউণ্ডে সেই গাড়ীখানা আবার দেখা গেল। সেই লোকটি এবং তার মেয়ে গাড়ী থেকে নেমে প্রিন্সিপালের রুমের দিকে যাচ্ছিল। লোকটির বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। আর তার মেয়েটির পনেরো-ষোল। কিন্তু ইতি-মধ্যেই মাথায় সে তার বাপের সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন পরে জানলাম, মেয়েটি র. কু. ব. নামক লেখকের খুব ভক্ত। আমি ওই কলেজেই আছি জানতে পেরে একদিন সে অনেক মেয়েকে জুটিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। জিজ্ঞেস করল— 'আচ্ছা স্যর, এ ধরনের গল্প কেন লেখেন?' আমার সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে তারা নানা রকমের লোক। কিন্তু তাদের মেজারিটি আসে এই ধরনের প্রশ্ন করতে। আচ্ছা আপনিই বলুন, এই ধরনের প্রশ্নের কী উত্তর দেওয়া যায়? আমার ভাগ্য আর কি! এই ধরনের গল্প লিখে অচেনা পাঠকদের কাছ থেকে নানা রকম সমালোচনা পেয়েছি।' এই বলে সে হাসল। আমারও হাসি পেয়ে গেল।

আমি বললাম— 'আমার মামাও একজন এই ধরনের লোক। আপনাকে দেখলে অমনি জ্বলে যেত। এমন একটা দিন নেই যেদিন অন্তত একবার সে আপনার নিন্দা না করবে।'

'তাই নাকি?' লেখক বেশ খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ওদিকে দিদিমা তার নাতনীকে ডাকছে— 'আরে কৌসী! কোথায় গেলি? খেতে আয়। সাড়ে সাতটা তো বেজে গেছে।' বলতে বলতে দিদিমা নাতনীর খোঁজে বাইরে বেরিয়ে এল। সেই শিশু আমার চেয়ারের পেছনে লুকিয়ে থেকে চাপা গলায় তার বাবাকে বলছে— 'বাবা বোলো না, বোলো না।' ওদিকে দিদিমাও তারস্বরে 'কৌসী কৌসী' বলে চিৎকার করছে। এই ব্যাপারে লেখক হেসে উঠে বলল— 'দেখুন, আমার মায়ের মতোই, এইভাবে যে কিছু লোক আমার ওপর অসন্তুষ্ট তাতে আমি খুশী। কিছুক্ষণ পরেই আমার মা তার নাতনীকে দুটো চড় লাগাবে। কিন্তু কালও আবার মেয়েটা এইভাবে লুকিয়ে থেকে তার দিদিমাকে জ্বালাবে। এ না হলে নাতনী-দিদিমার মধ্যে আর কী সম্পর্ক রইলো বলুন।'

লেখকের মা পুত্রের কথা শোনবার জন্য একটু দাঁড়াল। কী বুঝল সেই জানে। হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠল— 'বিশুর লেখা গল্প নিয়ে বুঝি বলছ, মা? তোমার মতো মেয়েরা খুব প্রশংসা করে। কী লেখে ও? সব বিষয়ে ও অন্য সকলের উল্টো কথা বলবে। আমার, মা, একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে জিতবে কে? ও ন্যায়কে অন্যায় আর অন্যায়কে ন্যায় করে দেখাবে। দেখো মা, আমি গরীব মানুষ। আমার যদি সামর্থ্য থাকত, আমি ওকে

ওকালতি পড়াতাম। ওর বাবা ছিল উকীলের গোমস্তা। সেই বাপের গুণ আর-কি ! ওর বাবাও ছিল এইরকম। সকলের মতের বিরুদ্ধে কথা বলা।'

লেখক হাসল। 'কিছুক্ষণ আগে আপনি বলেছিলেন না— সমস্ত পৃথিবীকে সেই একটি লোকের মধ্যে-পুরে দিয়ে— এ হল তাই।'

'হয়েছে, হয়েছে। তুই আমাকে পরিহাস করছিস। বল্ তোর মেয়ে কোথায় ?' দিদিমাকে ফাঁকি দিয়ে ঠকাতে পারার আনন্দে কৌসী হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল।

দিদিমা বলল— 'কী চালাক মেয়ে-রে, বাবা ! যা তোর মাকে আসতে বল্ গিয়ে। রাত দশটা পর্যন্ত হেঁশেলের জিনিসপত্র ছড়ানে-ছিটানো থাকবে— ও বাপু আমি পারব না। হ্যাঁ-মা, কতক্ষণ ধরে কথা বলছ। একটু কফি এনে দিই, খাও না কেনে। আমার বিশু এ-সব কিছুই চাইবে না। কথার লোক পেলেই হল ! কথাই বলতে থাকবে।' এই বলে সে ভিতরে গেল। আমার মন কিন্তু লেখকের গল্পের দিকে।

'তার পরে ? সেই-যে বললেন প্রভু না প্রভাকরের মেয়েটা আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে ? তারপর ?'

'হ্যাঁ, আমার সমস্ত গল্প যেন একেবারে মুখস্থ ছিল তার। তারপরে একদিন মেয়েটির বাবার অফিসে এমপ্লইস্ রিক্রেয়েশন ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে যাতে আমি উপস্থিত থাকি সেইজন্য কে কে এসেছিল আমার কাছে। আর সঙ্গে মেয়েটি ছিল সুপারিশের জন্য। আমি গিয়েছিলাম সেই উৎসবে এবং সেখানেই মুখোমুখি পরিচয় হয় মিস্টার প্রভু বা প্রভাকরের সঙ্গে। এখন সে গণ্য-মান্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার মনে পড়ে গেল সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটির পুরোনো দিনের কথা। আপনার কাছে আরও একটা কথা আমি বলতে চাই। সেটা আমি অন্য কোনো গল্পে বলবার চেষ্টা করব। আপনি বোধকরি ভাবছেন সেই প্রভুই কেবল একটি মেয়েকে নষ্ট করেছে। তা নয়। সেই প্রভুকেও যারা নষ্ট করেছে এমন কয়েকটি মেয়ের কথাও আমি জানি। এই 'অগ্নিপ্রবেশ' গল্পটার জন্য এত লোক এত সোরগোল তুলছে, সে গল্পটা লিখলে যে কী-রকম হবে জানি না।'

আমার মনে হল সে গল্পটা আমাকে বলতে চাইবে না। 'বলুন' বলে অনুরোধ জানানোটাও ঠিক মনে হল না আমার। তার মুখ থেকে কী কথা বেরোয় আমি তার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। কোনো ভালো গায়ককে গান গাওয়ার অনুরোধ জানালে সে যেমন বাহানা করে বিশুবাবুও তেমনি মৌন হয়ে থাকল। ইতিমধ্যে তার মা নিয়ে এল কফি। কফি খাওয়ার অছিলায় বিশুবাবুর মৌনতা বেড়ে গেল। 'কেমন হয়েছে, মা ? নামেই কফি। ভালো দুধ না হলে কি কফি হয় ? এ দিকে তো ভালো দুধ নেই। তোমাদের ওখানে ? একটু পাওয়া-টাওয়া যায় ? ডিপোর দুধ, না বাড়ীতে দোয়ানো দুধ ?'

'ঘরের দরজায় গরু এনে দুইয়ে দেয় বোধহয়। মা-ই সব ব্যবস্থা করে কিনা, আমি কিছুই জানি না। তবে গোয়ালার সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করে— মা বোধকরি ডিপো থেকে আনলেও আনতে পারে— ঠিক জানি না।'

'তোমাদের বাড়ীতে কে কে আছে?'

'আমি ও আমার মা। দাদা, বৌদি ওরা ট্রিপ্লিকেনে থাকে।'

'বেশ কথা।' এই বলে দিদিমা কাফর বাসন নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

আমি বললাম— 'আচ্ছা, আপনার সেই গল্পটার নাম দিয়েছেন 'অগ্নিপ্রবেশ' তাই না?'

লেখক হেসে বলল— 'আমার যিনি জন্মদায়িনী তিনিও একজন মেয়ে, আর আপনিও একজন মেয়ে। এই কথাটা সম্প্রতি ভুলে গিয়েই বলছি। সাধারণত, এই মেয়েরা তেমন ভালো নয়। ভালো যে নয় তার কোনো কারণ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। কিন্তু সেটা অন্য কথা। মেয়েরা যে কতটা কলঙ্কিত তার স্পেসিমেনস্ তো আমাদের কলেজেই দেখতে পাচ্ছি। অফ কোর্স, 'অগ্নিপ্রবেশ' গল্পের সেই মেয়েটিকেও আমি আমাদের কলেজেই দেখেছিমাম। কিন্তু তেমন মেয়ে ভিন্ন রকমের, একটু ব্যতিক্রম আর কি! অনেকে জিজ্ঞাসা করে, এ যুগেও কি অমন কলেজ স্টুডেন্ট আছে নাকি? খুব সঙ্গত প্রশ্ন। তবে কী আমার বেশির ভাগ লেখা ঠিক স্বাভাবিকদের নিয়ে নয়, একটু অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত বিষয় নিয়েই আমি লিখি।'

'আমার মামা বলে যে, সেই মেয়েটা অমন একটা কাজ করে এল, আর তার মা সেই ব্যাপারটা চাপা দিয়ে ফেলল, এর থেকেই বোঝা যায় মা-বেটি কতদূর অসৎ। মেয়েটার মাও যৌবনে এইসমস্ত কাজ ক'রে চাপা দিয়ে দিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তা-না-হলে এ কী ক'রে সম্ভব?'

বিশুবাবু হাসল— 'আপনার মামার কী মেয়ে সন্তান আছে?'

'না, নেই।'

'তাই তো তিনি অমন কথা বলতে পারেন।'

আমি ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলাম, দিদিমা কৌসীকে ভাত খাওয়াচ্ছে। কৌসী নিজের হাতে জল খাবে বলে জিদ করতে সমস্ত জল বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। 'বানর! তোর ভারি বাড় হয়েছে, না? চাইলে আমি খাইয়ে দিতে পারতাম না?' এই বলে দিদিমা নাতনীর গালে দু'ঘা লাগিয়ে দিল। শিশুও মুখে ভাত নিয়ে 'বাবা' বলে কেঁদে ফেলল।

'ডাক দেখি তোর বাপকে। এই বিশু, দেখে যা তোর মেয়ের শয়তানি। সারা ঘরে জল ফেলেছে, দেখে যা। জামা খুলে ওকে ওর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিই! আমাকে দিয়ে এ-সব পোষাবে না বাবা। আরও দুটো দিন আমার প্রাণটা জালিয়ে খাবে।'

এমন সময়ে আমার পিছন থেকে কে যেন বলল— 'কিরে কৌসী, দিদিমাকে জ্বালাচ্ছিস কেন রে? আয় এখানে। আমি খাইয়ে দিই।' পিছন ফিরে দেখলাম, বিশুবাবুর স্ত্রী। হাসিমুখে হাতে একটি প্লেট ও গেলাস নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়িয়েছে।

বিশুবাবু স্ত্রীকে বলল— 'জ্বালাতন না ক'রে কী করবে বলো। বিয়ের দশ বছর পরে একটি মেয়ের জন্ম দিয়েছ। একপুত্রী। তাই 'নাই' দিচ্ছ একটু বেশি পরিমাণে। দশ বছর বয়স হল, ভাত খাওয়াতে এত হাঙ্গামা। ঐ দেখো ওদের ঘরে। চারটি ছেলে-মেয়ে। রান্না হতে-না-হতেই চেঁচামেচি শুরু করে। দেখো, ছেলেপিলে না থাকলে একরকমের কষ্ট। আবার থাকলেও আর-একরকমের কষ্ট।' এই বলে সে হাসল। বিশুবাবুর স্ত্রী হেসে বলল— 'আস্তে, ওদের কানে গিয়ে পৌঁছতে পারে কখন।' এই বলে সে একবার প্রতিবেশীর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল।

রাত সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। আমাকে রওনা হতে হবে। বিশুবাবুর গল্পসংগ্রহ বইখানিতে তার স্বাক্ষর দিতে বলায় সে ঘরের মধ্যে গিয়ে সই-টই ক'রে বেরিয়ে আসার সময়ে বইখানির সঙ্গে একটা 'স্যুভেনীর'-ও নিয়ে এল। দু-তিন পৃষ্ঠা ওল্টাবার পরে একখানি ছবি দেখিয়ে বলল— আপনি বলেছিলেন না 'অগ্নিপ্রবেশ'-এর কথা, জিজ্ঞেস করেছিলেন এরকম ঘটনা ঘটতে পারে কি, এই দেখুন গল্পের হিরো!'

ছবিখানা দেখলাম। এই যে সেই লোকটি, নিঃসন্দেহ হওয়ার পরে তার চোখের মধ্যে টের পেলাম সর্প চোখের ছায়া। তার পরে আরও দু-তিন পৃষ্ঠা উল্টে দেখলাম। র. কু. ব. মহাশয়ের ছবিও ছাপা হয়েছে। বইখানা আমার দরকার। কিন্তু সোজাসুজি চাইতে পারি না বলে বিশুবাবুর ফোটোখানির অছিলায় তাকে বললাম— এখানে আপনি একটা সই ক'রে দিন স্যর।'

আমার আবেদন অগ্রাহ্য হল না। 'এতে আমার একটা প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে, বুঝলেন। পড়ে দেখবেন।' এই বলে নিজের ছবির ওপর সই ক'রে স্যুভেনীরখানি আমার হাতে তুলে দিল।

অফিসে আমার সেকশানে আমি একাই বসে আছি। এইবার আমিও রওনা হলাম। সে তো আমায় চিনতে পারবে না। সেই বারো বছর আগে আমাকে যারা দেখেছিল আজ তারা কেউ আমাকে চিনতে পারে না। সেই জায়গায়, যেখানে বারো বছর আগে দেখা হয়েছিল, কোনো চেনা-পরিচয়-শূন্য একটি লোকের জন্য আর একটি লোক অপেক্ষা করছে, সেই অপেক্ষারত ব্যক্তিকেই আজ নতুন ক'রে খুঁজে বার করতে হবে।

6

ঐ যে ! সেই গাড়ীখানি দাঁড়িয়ে আছে।

এখনো অন্ধকার হয় নি। গ্রাউণ্ডের একদিকে বরং রোদ ছড়িয়ে আছে। আর একখানি ছোটো গাড়ী গ্রাউণ্ডের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করছে। মনে হয় কেউ নতুন ড্রাইভিং শিখছে।

আমি হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম টমাস্ মন্‌রো সাহেবের মূর্তির কাছে। এতদূর থেকেও আমি সেই সুবৃহৎ গাড়ীখানি দেখে চিনতে পেরেছি। বারো বছর পরে এই প্রথম গাড়ীটা দেখলাম।

গাড়ীখানা দেখতে কেমন তা আমি চোখ বুজলেই দেখতে পারি। কিন্তু সেই গাড়ীর মালিক এখন কেমন সে-কথা আমার কল্পনার বহির্ভূত। একজন অচেনা অজানা পুরুষের সঙ্গে একা একা দেখা করতে যাচ্ছি. কেন জানি না এ ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র ভয়-ডর নেই। যেন পূর্ণ অধিকার নিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি অগ্রসর হচ্ছি।

সামনের বড়ো রাস্তাটা পার হয়ে এলাম। তারপরে দুটো ছোটো ছোটো রাস্তা পাশাপাশি। আমার মতো আরও দুটি মেয়ে সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মনে হয় ওরা কাজ করে সেক্রেটারিয়েটে। কয়েকটি মেয়ে চলেছে একা একা। আবার দু-তিন লোকের ছোটো ছোটো দলও এগিয়ে যাচ্ছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে জোড়ায় জোড়ায় নর-নারী। আমার সেই লোকটি গাড়ীতে বসে বসে গ্রাউণ্ডের এদিকে যাতায়াতকারী সমস্ত লোককেই দেখতে পাচ্ছে সন্দেহ নেই। এর মধ্যে আমি কোন্‌জন তা সে কী ক'রে খুঁজে বার করবে ? আমি যাতে তাকে সহজেই খুঁজে বার করতে পারি সেইজন্যই সে আজ বহুদিনের অব্যবহৃত গাড়ীখানি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে এসে পৌঁছলাম। সন্ধ্যায় অপস্রিয়মাণ রোদ আমার পিঠের ওপর পড়েছে। মাটির ওপরে আমার দীর্ঘ ছায়া। আমার মনে হয় এতক্ষণে সে আমায় চিনতে পেরেছে। সেই বিস্তৃত ময়দানের এক কোণে গাড়ীখানি দাঁড়িয়ে। ঠিক বিপরীত কোণ থেকে একটি স্ট্রেইট লাইন এঁকে হাতে একটি হ্যাণ্ড-ব্যাগ ...র সেই গাড়ীর সোজাসুজি আমি এগিয়ে চলেছি। ড্রাইভিং শেখার জন্য আর একজন কে আর একটি ছোট্ট কার নিয়ে সেই ময়দান প্রদক্ষিণ করছে। এত বড়ো ময়দানে ওই দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীখানা. এই ঘাসের পথে এগিয়ে চলা আমি এবং বার বার চক্কর দিয়ে চলা ওই ছোট্ট কার— তবু মনে হচ্ছে ময়দান একেবারেই ফাঁকা, কোথাও কোনো শব্দ নেই।

সে যে আমাকে চিনতে পেরেছে তা বুঝতে দেরী হল না, কারণ গাড়ীর দরজা খুলে পায়ের জুতো দিয়ে পাল্লাটাকে ঠেকিয়ে রেখে, চোখ থেকে কুলিং গ্লাস খুলে

ফেলে সে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি কিন্তু এখনও তাকে চিনতে পারি নি।

আচ্ছা, তাকে চিনতে পেরেই বা আমার কী লাভ? আমি কিসের আশায় তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি? কিসের জন্য এত কষ্ট স্বীকার ক'রে তাকে খুঁজে বের ক'রে আজ তাকে আসতে বলেছি? সত্যিই তাকে আসতে বলা হল! আর আমিও এদিকে এসে গেলাম, অতঃপর কী? কী কথা বলব?

গাড়ীর কাছে যতই এগিয়ে যাচ্ছি, মনের মধ্যে ততই ভয় বেড়ে যাচ্ছে। অনাবশ্যক সমস্যা সৃষ্টি করে এখন আমিই মনে মনে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছি। মাথা তুলে যে সামনের দিকে তাকাব, তাও সম্ভব হচ্ছে না। গাড়ীর কাছে এসে গেলাম। সেও গাড়ীর দরজা ভালো ক'রে খুলে দিয়ে নীচে নেমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি এবারে মাথা তুলে তাকে ভালো ক'রে দেখলাম।

ইয়েস··· ইনিই সেই ব্যক্তি! (মুখোমুখি সাক্ষাতের পরে আমায় চেয়ে বয়স্ক লোককে অমর্যাদাসূচক 'এ, সে' না বলে 'ইনি, তিনি' বলেই ভাবা উচিত)।

'হ্যালো' বলে হাসিমুখে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ইনি। একবার তুলনা ক'রে দেখলাম সেই লোকটার সঙ্গে, বারো বছর আগে যে লোকটা আমাকে 'প্লিজ, গেট ইন' বলে গাড়ীর দরজা খুলে দিয়েছিল। সে তখন ছিল লম্বা পাতলা চেহারার লোক। এখনকার মতোই বেশ টাইট করে পরা পোষাকে তখন তাকে খুবই মানাত। এখন বয়সের ফলে শরীরের এখানে ওখানে কিছু বাড়তি মাংস দেখা যাচ্ছে। লম্বায় মাঝামাঝি। তখন কিছু রোগাটে ছিল বলে একটু বেশি লম্বা মনে হয়েছিল। এখন শরীরটা মোটা হয়ে যাওয়ায় আগের চেয়ে বেঁটে বলে লাগছে। কানের কাছে দুদিকেই চুল পেকে বেশ শাদা হ'য়ে এসেছে মনে হচ্ছে যেন চুন দিয়ে লেপা। ভুরু ও চোখ দুটো আগের মতোই রয়েছে, কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

'হ্যালো' বলে বাড়িয়ে দেওয়া এঁর হাতখানি ঈষৎ ছুঁয়ে আমিও 'হ্যালো' বলে প্রত্যভিবাদন জানালাম। হাত ছুঁতে গিয়ে চোখে পড়লো— সিগারেট ধরে ধরে দুটো আঙুল কেমন যেন লালচে হয়ে গেছে। একটু খটকা লাগল। একটু বা ঘিনঘিনে ভাব। এঁর সঙ্গে করমর্দনের পরে আমি আমার আঙুল ক'টা ডলতে থাকি। মনে হচ্ছে আঙুল ক'টা ধুয়ে ফেলতে পারলে ভালো হত।

উনি বললেন— 'এখন তো সবে সাড়ে পাঁচটা। আরও খানিকক্ষণ রোদ থাকবে। গাড়ীর মধ্যে বসেই কথা বলা যাক।' আমি যে এই প্রস্তাবে মোটেই অসম্মত নই, তার প্রমাণ হয়ে গেল। তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটা দরজা খুলে ফেললাম, তা-ও আবার সামনের দিকের দরজা। উনি উল্টো দিকের দরজাটা খুলে স্টীয়ারিং-এর সামনে বসলেন। আমি কিন্তু দরজা খুলেও সেইভাবেই বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। উনি বললেন 'গেট ইন'। ঠিক যেন সেই বারো বছর আগেকার দিনটির কথা।

দুজনেই পাশাপাশি বসে অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলাম। উনি কেবল সিগারেট খেয়ে চলেছেন আর ধোঁয়া ছড়াচ্ছেন। একসময়ে হঠাৎ বলে উঠলেন— 'আচ্ছা, আমি যখন টেলিফোনে জিজ্ঞেস করলাম তোমার বিয়ে হয়েছে কি না, তুমি অমন ক'রে হেসে উঠলে কেন?'

আমি মাথা নীচু ক'রে উত্তর দিলাম. 'বিয়ে ব্যাপারটা তো খুবই আনন্দের খবর, তাই না? কাজেই বিয়ের ব্যাপারে কথা বলার সময়ে কেউ ভাসবে না তবে কি কাঁদবে নাকি? আমার বিয়ে সম্পর্কে যখন আপনি জানতে চাইলেন তখন কি আমি না হেসে পারি?' কথাগুলো বেশ নাটুকে ভঙ্গীতে বলে ফেললাম! বলে মনে হল— আচ্ছা, আমি কি এ রকম করেও কথা বলতে পারি?

ইনি আমার দিকে অমন ক'রে তাকিয়ে আছেন কেন? কী দেখছেন আমার মধ্যে? বারো বছর আগে আমি ছিলাম একটা হাবাগোবা মেয়ে এখন বেশ সেয়ান হয়ে উঠেছি— আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বোধক'র এই কথাই ভাবছেন। 'আচ্ছা, আপনি তো ফোনে বললেন আপনার একটি মেয়ে কলেজে পড়ে।' এইটুকু বলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম— 'আপনার কটি ছেলেমেয়ে?'

'টেলিফোনে যে কথা বলেছে, সে আমার বড়ো মেয়ে— মঞ্জু। ওর পরে দুটি ছেলে-- সুভাস ও বাবু। সুভাসের বয়স বছর বারো। তার ছোটো বাবু।'

উনি যেভাবে কথাবার্তা বলছেন তাতে মনে হল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পিতৃদেবের খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নয়। আমি বললাম— 'আচ্ছা, তখন তো. মানে তার আগেই তো, আপনার বিয়ে-থা হয়ে গেছে, তাই না? আপনার বড়ো মেয়ের মানে মঞ্জুরও, তখন জন্ম হয়েছে, তাই না?' আমার প্রশ্নে তিনি মাথা নেড়ে জানালেন— হ্যাঁ। এখন আমি একটু অনুযোগের সুরে বললাম— 'তখন তো আপনি এ সব বিষয়ে কিছুই বলেন নি আমাকে, বলেছিলেন কি?'

তিনি ইংরেজীতে বললেন-- 'দেখো, তখন আমরা এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই নি যে পরস্পরের মধ্যে কোনো জানাশোনা দরকার। দ্যাট ইজ গুড। আমি যার সঙ্গে মিট করি তাদের সকলের সঙ্গে যদি চেনা-পরিচয় আরম্ভ করি তবে, সেই আরম্ভের আর শেষ নেই। ধরো, দুটি নর-নারীর দেখা হ'য়ে গেল. তাই বলে কি একজনের চিন্তাভাবনার বোঝা আরেকজনের মাথায় চাপিয়ে দিতে হবে? কাজেই কে. কোথাকার লোক, কী নাম এসমস্ত না জেনে যে-কোনো পছন্দসই লোকের সঙ্গে দেখা হওয়াতেই আনন্দ। উই শেয়ার ওনলি প্লেজারস্। যার যার দুঃখ-কষ্ট তার তার কাছে। কারো দুঃখ-কষ্ট অন্য কেউ নিতে পারে না। এইজন্যই যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়, আমি তাদের কাছে নামটাও জানতে চাই না। আমার বিষয়েও তাদের কাছে কিছু বলি-টলি না।'

'হাঁ, ওটা আপনার পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। অন্যদের বিষয়ে আপনার জানার কোনো প্রয়োজন না থাকতে পারে। কিন্তু আপনার এ কথা বোঝা উচিত

নয় যে, যাদের সঙ্গে আপনি মেলামেশা করেছেন ও করছেন, তারা সকলেই আপনার মতো নয় ?'

আমি যে কী বললাম তা বোধকরি ওঁর মগজে ঢোকে নি। না ঢুকলেও খুব মাথা নাড়তে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম— 'কী বলেছি বুঝতে পেরেছেন আপনি ?'

'না, ঠিক বুঝতে পারি নি। আর একবার বলো তো'— এই বলে তিনি মাথা নাড়িয়ে নির্বোধের মতো হাসতে লাগলেন। লোকটা একটু 'ডাল্' টাইপের মনে হচ্ছে। বারো বছর আগে যেন একটু ব্রিলিয়াণ্ট বলে মনে হয়েছিল। বারো বছর তো সোজা কথা নয়, মানুষকে কত বদলে দেয়! এবারে আমি একটু সাহসী হয়ে বললাম— 'এই গাড়ীতে আপনার ও আমার মধ্যে যে ঘটনা ঘটে গেছে, সে-রকম অভিজ্ঞতা কত লোকের সঙ্গেই আপনার হয়ে থাকবে! আমাদের কলেজ থেকেই কত গার্ল-ফ্রেণ্ডস্ পেয়ে থাকবেন! কত রকমের! যাদের সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছে, যাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয় এবং ভবিষ্যতেও যাদের মাত্র এক-আধবারই দেখা হতে পারে— অনেক ধরনের বান্ধবী। তাদের মধ্যে অনেকের হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে। এবং তারা হয়তো নিজেদের হাতে আপনাকে শুভ-বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে গেছে। এবং আপনিও হয়তো নিজের হাতে প্রেজেণ্টেশন দিয়ে এসেছেন! তা ছাড়া আপনি মস্ত বড়ো লোক, হয়তো আশীর্বাদ-টাশীর্বাদও ক'রে থাকবেন। দেখুন, মানুষ আজকাল জীবনটাকে কত সহজ ক'রে নিয়েছে।' এইভাবে মাথা নীচু ক'রে শুরু করলেও যখন সোজাসুজি তার দিকে তাকিয়ে কথা বললাম, দেখলাম মুখখানির কোথাও কোনো বুদ্ধির দীপ্তি নেই। লোকটা বোকা। চূড়ান্ত বোকা। আমি বলেই চললাম— 'আপনার বহু বান্ধবীর ব্যাপার দেখেই বোধকরি আপনি আমার কাছে ফোনে জানতে চেয়েছিলেন— আমার বিয়ে হয়েছে কি না এবং ক'টি আমার ছেলেমেয়ে, তাই না ?'

এই পর্যন্ত বলে আমার মনে পড়ল মামার কথা। সে প্রায়ই বলত— 'সেই লোকটা তোমাকে বিশ্বাস করবে ভেবেছ, গাড়ী থামিয়ে হাত ধরে— টান দিলেই যে মেয়ে সুড় সুড় ক'রে যায়, সে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারে না।' মামার কথার জের টেনে, আমি যে একজন মেয়েছেলে সে কথা ভুলে গিয়ে, বেশ একটু দুর্বিনীতভাবেই বললাম— 'গাড়ী থামিয়ে হাত ধরে টান দিলেই যে মেয়েরা সুড় সুড় ক'রে চলে যায় তাদের মতো হয়েও এতদিনে আমার হয়তো বিয়ে হয়ে যেত। আর যারা যায় না, তাদের মতো হলেও হয়তো বিয়েটা আটকে থাকত না। সেই বারো বছর আগেকার দিনটিতে বলেছিলেন— 'এইসমস্ত সার্টিফিকেটের কোনো দরকার নেই', মনে পড়ে ?' কথাটা মনে করিয়ে দিলেও যেন কিছুই বুঝতে পারে নি এইভাবে ভুরু দুটো কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'সার্টিফিকেট ? কই, আমি কখনো বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না।' তার কথা শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। বললাম— 'আপনার মনে নেই, কিন্তু আমার আছে। আপনি আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম— আমার ভীষণ ভয় করছে। এসমস্ত আমি কিছুই জানি না, খুব ভয় করছে আমার। তখন আপনি গালে চড় দেওয়ার মতোই বলেছিলেন— রকম দেখো-না মেয়ের ! এসমস্ত সার্টিফিকেট কেন ? মনে পড়ে আপনার ?' এবারে তিনি কপালটা চুলকোতে লাগলেন। আমি বললাম— 'আই অ্যাম সরি, মিস্টার প্রভু ! আপনার বিরক্তি হচ্ছে। হয়তো আপনার দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে বারো বছর আগেকার একটি সন্ধ্যার মতো আজকের ঈভনিংটাও মাটি ক'রে দিলাম আপনার। আজ যে আপনাকে এখানে ডেকেছি সে কেবল এই কথাটি বলার জন্য যে, কেবল একটা সন্ধ্যাবেলাই নয়, মাটি হয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি— একটি জীবন।'

'নো··· নো··· সে-সব কিছু নয়। আমার খুব ভালোই লেগেছে টেলিফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলতে, আর তোমার সঙ্গে এই দেখা হওয়াতেও আমি খুব খুশী। গাড়ীর মধ্যে যত মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তুমি তাদের মতো সামান্য মেয়ে নও। ছাট ইজ হোয়াই আই ফেল্ট গিল্টি। তোমার কথা আমার ভাবা উচিৎ নয়, তবু না ভেবেও পারি নি। সেদিন সন্ধ্যার সঙ্গেই তোমাকে আমার ভুলে যাওয়া ভালো বলে ভুলে গিয়েছি। আমি তোমার কাছে একটি সত্যি কথা বলব ? আমার লাইফে আমি কেবল একটি মেয়েকেই নষ্ট করেছি— সেই মেয়েটি তুমি, আর কেউ নয়। বাকী সব আমার কাছে আসার আগেই নষ্ট হয়ে গেছে।' এই পর্যন্ত বলে সিগারেটে সজোর টান লাগিয়ে অনেকখানি ধোঁয়া ছড়ালেন। ধোঁয়ার জন্য কিংবা অন্য কারণে, তাঁর চোখ ছল ছল ক'রে উঠল। গলাটা পরিষ্কার ক'রে নেবার জন্য একটা কাশির মতো শব্দ করলেন, তারপরে আমার দিকে না তাকিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। আমিও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম।

সেই গ্রাউণ্ডের চারদিকে যে ছোট্ট গাড়ীখানা ক্রমাগত চক্কর দিচ্ছিল, সেটিকে আর দেখা যাচ্ছে না এখন। সেই বিরাট ময়দানে মাত্র দুটি প্রাণী— আমরা দুজন। দীর্ঘ হয়ে আসা অপরাহ্নের ছায়া কাছাকাছি এসে এক হয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার কালো ছায়া দেখা দিল। এ কি সন্ধ্যাকাল ? না কি ভোরবেলাকার আলো-আঁধার ? মনের মধ্যে কেমন একটা অস্পষ্ট চেতনা।··· দূরে আয়রণ ব্রিজের ওপর এইমাত্র আলো জ্বলে উঠল। সারা বীচ রোডেও আলো দেখা দিতে লাগল। আমি আমার রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম— সাড়ে ছটা বেজে গেছে।

আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম। তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে ওদিককার দরজার ওপর চিবুকটা রেখে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন— না, চোখ বন্ধ ক'রে থাকলেন। কপালের ওপর চুল এসে পড়েছে। সেই সেদিনকার মতো আজকেও তাকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। সেদিনকার মতো না হলেও, আজও

দেখতে বেশ সুশ্রী। তখন ছিল এক ধরনের রূপ— বেশ আপ-টু-ডেট স্টাইল। আজও সেই স্টাইলটি বজায় আছে। ওদিক থেকে একটু হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ সুগন্ধ আমার নাকের মধ্যে এসে ঢুকল।

এঁর টাকা-পয়সা বাদ দিয়ে লোকটার নিজস্ব মূল্যের কথা ভাবতে গেলে আমার মনে ভারি অনুকম্পা জাগে। আহা বেচারা! এই শরীরটা দিয়ে সামান্য একটু শ্রমের কাজও করতে পারে না। এঁর যা বিষয়-সম্পত্তি তার কিছুই তাঁর নিজের নয়, সবই পিতৃপুরুষের। তিনি বললেন কি না যে তাঁর জীবনে তিনি প্রথম যে মেয়েটিকে নষ্ট করেছেন সে হলাম আমি। বাট হোয়াট এ্যাবাউট হিজ ওয়াইফ? মহিলার গলায় মঙ্গলসূত্র ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি যে তাকে সবচেয়ে আগে নষ্ট ক'রে দিয়েছেন সে কথা যেন তাঁর মনেই হয় না। এহেন পুরুষের জীবনসঙ্গিনী সম্পদের গরিমা ছাড়া আর কিসের গৌরব করতে পারে? সে কথা যাক। এঁকে কিসের জন্য যে এভাবে আসতে বলে এসমস্ত কথা বলছি, এখনো তার অর্থ বুঝতে পারি নি। এতে বোঝবার আছেই বা কী? এ আমার অধিকার, রাইট। ইয়েস··· দিস ইজ মাই রাইট। আমি বোধহয় কথাটা ভাবতে গিয়ে একটু হেসে ফেলেছি। তিনি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন— 'আচ্ছা এই বারো বছর ধরে তুমি আমার কথা ভেবেছ, অথচ আমাকে খুঁজে বার করতে এতদিন লাগল তোমার? কথাটা শুনে মামার একটা কথা মনে পড়ল। মামা বলছিল যে ইনি আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারবেন না। কথাটা যে ভুল, বুঝতে দেরী হল না। আমার প্রত্যেকটি কথা তিনি বিশ্বাস করেন, বলতে কি একটু বেশি পরিমাণেই বিশ্বাস করেন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। আহা! এমন লোকের সঙ্গে কি প্রতারণা করতে পারি!

আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম— 'নো, নো। আপনি যা বলেছেন সে-রকম কিছু নয়। এইমাত্র মাস ছয়েক আগে আপনার কথাটা বিশেষভাবে মনে পড়ল। এ কথা সত্য যে গত ছ'মাস ধরে আমি আপনাকে খুঁজেছি। তার আগে কিন্তু আপনার কোনো খোঁজ করি নি, এমন-কি খোঁজ করবার কথা মনেও জাগে নি।'

কিছুক্ষণ কী ভাবার পরে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— 'তারপরে তুমি কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলে বোধহয়? কারণ অন্য কোনো ব্যাপারে তোমাদের কলেজের দিকে গেলেও তুমি আর আমার চোখে পড় নি। অ্যাম আই রাইট?'

আমার কেন জানি না একটা দীর্ঘশ্বাস এসে গেল ভাবলাম— 'তারপরে আমার জীবনে যা ঘটেছে কী হবে তাঁর জেনে?' বুকটা কেমন ক'রে উঠল, ঠোঁট শুকিয়ে এল। সেই যে তাঁকে শেষ মুহূর্তে দেখেছিলাম বারো বছর আগে, সেই থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমার জীবনের ঘটনাগুলি এঁর কাছে বলতে পারব কি না ভাবতে গিয়ে মনটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কোনো একটা বিষয় যদি চিন্তার ক্রম

না রেখে এলোমেলো ভাবা যায়, তবে তার মধ্যে অন্য চিন্তাও এসে মাথা তোলে। সেইভাবেই আমার মনের মধ্যে ভীড় ক'রে এলো অনেক মানুষের চেহারা, তাদের কথা, তাদের গালমন্দ : এলো কলেজ হোস্টেল, ফ্রেণ্ডস, ক্লাস লেকচারস্ ; লেখা-পড়া ; আর এলো কানে-শোনা কত কথা, চোখে-দেখা কত দৃশ্য— সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। চোখ বন্ধ ক'রে একপাশে একটু কাৎ হয়ে মাথাটা এলিয়ে দিলাম।

'হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার'— এই কথা জিজ্ঞেস করতে করতে তিনি আমার কাঁধের ওপর হাত রাখলেন। আমি এক মুহূর্তে ঠিক হয়ে বসে সতর্ক হয়ে গেলাম : 'আই অ্যাম সরি!' নিজেকে সামলে নিয়ে, মুহূর্তের জন্য মুখের ওপর এসে পড়া বিরক্তির ভাবটা লুকিয়ে শান্ত হলাম। ওঁর হাতটা দেখছি। কাঁপছে।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমিও আপনাকে ভুল বুঝি নি। অন্যমনস্ক হয়ে কী সব কথা ভাবছিলাম, এমনসময়ে হঠাৎ আপনার হাতটা এসে পড়ায় আমি আমার অজ্ঞাতেই রি-অ্যাক্ট করলাম।'

উনি একটু ভয়মিশ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন— 'আমরা আর কোথাও যাব কি? অন্ধকারও হয়ে এসেছে।'

'ও ইয়েস।'

'তা হলে, আয়রন ব্রিজ ধরে বীচ রোডে গিয়ে 'মেরিনা ক্যানটিন'-এ গিয়ে কফি কিংবা কোল্ড-ড্রিঙ্ক খাওয়া যায়।

'ও ইয়েস।'

বারো বছর আগে ঠিক এইভাবেই এক সন্ধ্যাবেলায় এই গাড়ীতেই— সেদিন আমি বসেছিলাম পিছনের সীটে— এঁর সঙ্গে এই গ্রাউণ্ডে এসে এইভাবেই ফিরে যাওয়ার পর থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের সমস্ত ঘটনা যেন বিলীন হয়ে গিয়ে, আমি যেন এই গাড়ীর মধ্যেই বড়ো হয়ে এখন পিছন থেকে সামনের সীটে এসে বসেছি, যেন এই দীর্ঘ বারো বছরে কিছুই ঘটে নি, যেন আমার চরিত্র কলুষিত হয় নি— এইসমস্ত আমার কল্পনায় ভেসে উঠল।

গাড়ী এগিয়ে চলেছে। একটা ব্যাপার এইমাত্র আমার নজরে পড়ল। এই গাড়ীটার স্টীয়ারিং ডান দিকে নয়, বাঁ দিকে। অন্য গাড়ীতেও কিন্তু এমন ব্যবস্থা দেখা যায় না। বোধহয় বাসস্টপে যারা লিফ্‌ট নেওয়ার জন্য দাঁড়ায়, তাদের গা ঘেঁষে গাড়ী দাঁড় করিয়ে তাদের তুলে নেওয়ার পক্ষে এই ধরনের গাড়ীই বেশ সুবিধাজনক।

আমিই কথা শুরু করলাম— 'সেই ঘটনার পরে আমি মাদ্রাজ শহর ছেড়ে চলে যাই। সেদিন আপনার গাড়ীতে ক'রে সেই যে এলাম, সেই আমার সেই কলেজে যাওয়ার শেষ দিন। রাস্তার কোণে আমায় নামিয়ে দিয়ে 'আই অ্যাম সরি,' বলে আপনি চলে গেলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেলাম,

কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনাই বললাম।

'ও! মাই গুডনেস' বলে তিনি জিব কাটলেন।

'মা আমায় মারতে লাগল আর জিজ্ঞেস করতে থাকল— 'বল্ কে? বল্ কে সেই লোকটা?' আমি কি বলব— কে? পরিচয় কিছু জানতাম কি? তার পরে কত শত ঘটনাই ঘটে গেছে। তঞ্জাবুরে (তাঞ্জোরে) আমার মামাবাড়ীতে গেলাম। পড়াশুনা করলাম— ত্রিরুচি ও ত্রিদম্বরম্-এ। চাকরী পাওয়ার পরে এই পাঁচ-ছ বছর এই মাদ্রাজ শহরে আছি। বিয়ে আমি করব না, বিয়ে আমার হবে না। তার জন্য আমার কোনো দুঃখও নেই। বরং বেশ সুখেই আছি। কিন্তু এ দেশে অবিবাহিত মেয়েদের কোনো মান-মর্যাদা নেই। বিয়েও হয় নি, কোনো পুরুষ বন্ধুও নেই. এমন কোনো মেয়ের কথা আমাদের দেশে কেউ ভাবতে পারে না, বিশ্বাসও করতে পারে না। তাই বলে কি আমি আর-একজনকে বিয়ে ক'রে জীবনটা নষ্ট করতে পারি? আপনিই বলুন।'

ইনি একবার তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। দেখে মনে হল ইনি বোধকরি এক্ষুণি কেঁদে ফেলবেন। দেখে আমার খুব ভয় জন্মাল। আমি বললাম— 'ব্যাপার কী, আপনি যে কোনো কথাই বলছেন না?'

একবার তিনি গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলেন। 'তোমাকে অনেক কথা বলার আছে। দেখো, আমি কোনো কাজেরই যোগ্য নই. যাকে বলে গুড-ফর-নাথিং তাই। তুমিই তো বলেছ যে তুমি কত লেখাপড়া শিখেছ। তোমার গুণের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই আমার। ইংরেজি খুব বলছি, না? পড়েছি তো হাইস্কুল পর্যন্ত। তবে কিনা কনভেন্ট এজুকেশান এই যা। তাতে লাভ কী হল? এখন তো শুদ্ধভাবে না বলতে পারি তামিল, না বলতে পারি ইংরেজি। সেইজন্যে অনেক সময় আমার কথা বলতেই ভয় হয়।'— হাসতে হাসতে বললেন কথাগুলি। এঁর মনের মধ্যে যে এতটা দুঃখ ও বিমর্ষভাব, এতটা হীনমন্যতাবোধ ছিল তা আমি এখন বুঝতে পারলাম। আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। গাড়ী এসে সেই রেস্টুরেন্টের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল।

উনি জিজ্ঞেস করলেন— 'তুমি তো ভেজিটেরিয়ান. তাই না? আই থিঙ্ক ইউ আর এ ব্রাহ্মিন— তোমার কথাবার্তা থেকে তাই তো মনে হয়।' আমি কোনো উত্তর দিলাম না। গাড়ী এসে ভিতরে দাঁড়াল।

একজন ওয়েটার এসে ওঁকে সেলাম দিল। বোধহয় চেনে ওঁকে। প্রায়ই আসেন নাকি এখানে?

'কী খাবে? বিস্কিট অ্যাণ্ড টী?'

'খালি টী।'

'ও. কে. খালি টী নিয়ে এসো।'

লোকটা চলে যাওয়ার পর— উনি আমাকে বেশ দেখতে লাগলেন।

'তোমাকে দেখলে একদিকে যেমন আমার আনন্দ হয়, আবার দুঃখও হয় তেমনি।' এই কথা বলে কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর ইংরেজিতে বললেন— 'যেমন খেলতে খেলতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সেই ঘটনার মতোই সমস্ত ব্যাপারটা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত। তার জন্য কি সমস্ত জীবনটাই মাটি ক'রে ফেলবে? ওয়ান শুড টেক থিঙ্গস ইজি ইন লাইফ!'

আমার জন্য ইনি সত্যি সত্যি খুবই করুণা বোধ করছেন মনে হল।

'ইউ নো?— আমি যখন বললাম যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব, তখন আমি ভাবলাম যে, তোমার বিয়ে-থা হয়ে গেছে, দু-তিনটে ছেলেমেয়েও হয়েছে, হয়তো তুমি ফ্রেণ্ড হিসেবে কিছু হেল্প-টেল্প চাইবে। তা না হলে— জাস্ট ফর অ্যান এ্যাকোএনটেন্স ফোন করেছ বলে ভাবলাম।'

আমি একটু ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞেস করলাম— 'ও! বিয়ে-টিয়ে করার পরে আপনাকে ফোন ক'রে ডেকে আনার মতো মেয়েও আছে তা হলে?'

'দেখো, এই জগতে না আছে কী? কিন্তু যতদূর আমি জানি, জীবনকে নষ্ট ক'রে ফেলার মতো মেয়ে বোধহয় তুমিই একা।' এঁর কথার মধ্যে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'তা কী করে সম্ভব? আমার বিবেকের কথা নাহয় ছেড়ে দিন। এইরকম একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া মেয়েকে জেনেশুনে বিয়ে করতে কে এগিয়ে আসবে?'

'হোয়াট আর ইউ ট কং? নষ্ট হয়ে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া··· আই ক্যান সে মেনি কেসেস। এক পুরুষের সঙ্গে কিছুদিন স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস ক'রে, তারপরে ডিভোর্স ক'রে, তারপরে অন্য একজনকে বিয়ে করল। তুমি যে নষ্ট হয়েছ তা কি সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল?— আমাদের এই সাক্ষাতের ফল খুব শীগ্গির শীগ্গির ফলবে সেটা কী বলো তো?'

ওয়েটার চা নিয়ে এল। উনি কাপ ও সসার নিয়ে আমার হাতে দিলেন, নিজেও একটা তুলে নিলেন। ওয়েটার চলে গেলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন— 'তোমার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমাকে। রিয়েলি! তোমার মতো একটি মেয়ে নিজের জীবনকে এইভাবে ব্যর্থ করে দেবে, এর কোনো মানেই হয় না। দেখবে, আমি তোমার জন্য একটি ফার্স্টক্লাস জামাই জুটিয়ে দেব— যে ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে খুঁতখুঁত করে না, দৃষ্টি মোটেই সংকীর্ণ নয়। তুমি কী বলো?'

আমি বলব কী? বসে বসে ভাবছি লেখক র. কৃ. ব.-এঁর সম্পর্কে কী বলছিল। বলেছিল: 'লোকটি এখন আর আগের মতো নেই। সে এখন গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। হ্যাঁ। তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।'

11

সেই রেস্টোরেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তিনি কেবল আমার বিয়ের ব্যাপারেই কথাবার্তা বললেন। আমি কিন্তু একটি কথাও বলি নি। আমাদের চারিদিকে অনেক লোক দলে দলে যাচ্ছে— কেউ গাড়ীতে, কেউ হেঁটে। ওদের মধ্যে পরিচিত কেউ যদি আমায় দেখে ফেলে সে ভয়ও আছে। কিন্তু কিসের ভয়? দেখুক-না ওরা। সকলে দেখবে বলেই আমি এই কাজ আরম্ভ করেছি। এতে ভয় পাওয়ার কী আছে। মাথা উঁচু ক'রে গাড়ীর মধ্যে বসে রইলাম।

গাড়ী এখন বীচ রোড ধ'রে এগিয়ে চলেছে। বিবাহের শোভাযাত্রার মতো বেশ মন্থর গতিতে। এঁর সিগারেটের ধোঁয়া হাওয়ায় হাওয়ায় আমাকে আলিঙ্গন ক'রে চলে যাওয়ার সময়ে সেই গন্ধটা আমার বেশ লাগে। ছিঃ! 'সিগারেটের গন্ধ ভালো লাগে'— এ কথা কি কোনো মেয়ের ভাবা উচিত? চোখমুখ কুঁচকে অসন্তোষের ভাব দেখিয়ে 'ইস! দুর্গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে!'— মেয়েদের পক্ষে এই কথাটাই শোভা পায়। কিন্তু যদি কোনো মেয়ের ভালো লেগে যায় গন্ধটা? তবে সেই মেয়ের স্বভাব-চরিত্র যে কী পরিমাণ খারাপ হয়েছে— সে কথা জিজ্ঞেস করতে হয় আমার মামাকে। তিনি একটা বিরাট 'থীসিস' আওড়াবেন সন্দেহ নেই! ··· সিগারেট জিনিসটা রেপ্রেসণ্ট করে পুরুষ মানুষকে, ওটা পুরুষ চরিত্রের লক্ষণ। কাজেই যদি কোনো মেয়ে বলে যে সেই সিগারেটের দুর্গন্ধ তার ভালো লাগে এবং এই পরিমাণ ভালো লাগে, তবে বুঝতে হবে সেই মেয়েটির সেই পরিমাণ পুরুষের সাহচর্য দরকার। আরও বুঝতে হবে যে···।

মামার মনটি কেমন তা আমার ভালোই জানা আছে। কাজেই কীভাবে সে চিন্তা করবে, কীভাবে তার যুক্তিজাল বিস্তার করবে এই-সব কথা ভেবে ভেবে আমিই এখন যেন আধাআধি 'মামা' বনে গেছি। সত্যিই তো আমি যে এই পাশের ভদ্রলোককে এতদিন পরে খুঁজেপেতে আবিষ্কার করেছি তার মূল আইডিয়াটা তো মামারই। মামা! আপনি দেখুন আমি বুদ্ধিমতী মেয়ে কিনা!

এখন, ঠিক এই অবস্থায় ও এই বেশে, এই গাড়ীর মধ্যে মামা যদি একবার আমায় দেখতেন! শুধু দেখলেই হয়ে যেত!

ইনি চুপচাপ গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁর দিকে তাকালে আমার কেমন যেন মায়া লাগে। আহা বেচারা! যেন কী একটা অপরাধবোধে ভিতরে ভিতরে ইনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন বুঝলাম। অবশেষে আমিই তাঁর কাছে বলতে আরম্ভ করলাম: 'বিয়ে আমার হয়ে গেছে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মতো একরকমের বিবাহ — আজ থেকে বারো বছর আগে— আমাদের শাস্ত্রে বলে গান্ধর্ব বিবাহ, এই গাড়ীর মধ্যেই আমার সেই বিবাহ হয়েছে।'

হঠাৎ ব্রেক কষতেই চাকা ও রাস্তার তীব্র ঘর্ষণে গাড়ীটা থেমে গেল।

রাস্তার ঠিক মাঝখানে এক বুড়ী জেলেনী কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছুটছে। ইনি বাইরে হাত বাড়িয়ে রিক্‌সাওয়ালাদের মতো কুৎসিত ভাষায় বুড়ীটাকে গালাগাল দিচ্ছেন।

'হা আমার কপাল! উনি এমন ভাষায় গালি দিচ্ছেন কেন?' আমার সমস্ত দেহ সংকুচিত হয়ে এল।

আবার গাড়ী চলতে থাকল। এখন মনে হচ্ছে তিনি তাঁর আচরণের জন্য একটু লজ্জিত। নিজের মনেই বলতে লাগলেন— 'কী সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যেত! আমি যদি একমুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম, তাহলে? অন্ধকারে পেত্নীর মতো এসে দাঁড়িয়েছে? দেখো-না। যতসব হতচ্ছাড়া হাভাতে! একটু আঁচড় লাগলেই হত আর কি! হৈ হৈ করে লোক এসে জড় হত। তাছাড়া আছে ঐ জেলেগুলোর বস্তি? পঙ্গপালের মতো ছুটে আসত না? একা থাকলে না হয় কথা ছিল। শয়তানের সঙ্গে শয়তানী করা যেত। গাড়ীর মধ্যে মেয়েছেলে নিয়ে তাই করা যায় নাকি? তাই তো ভয় পেয়ে গেলাম।'

ইনি যখন তামিলে কথা বলেন, শুনতে বেশ মজা লাগে। একে তো মাদ্রাজ শহরের কথ্য বুলি, তাও আবার ঠিক ক'রে বলতে পারেন না। অনেকটা ফিরিঙ্গি তামিল আর কি! ইংরেজি যা বলেন বলেন, কিন্তু এঁর তামিল বলার স্ট্যাণ্ডার্ড বেশ কৌতুকপ্রদ। তার জন্য তামিল দায়ী নয়, দায়ী উনি। আমি ওঁকে বললাম— 'বেটার ইউ টক ইন ইংলিশ।' উনি পথের দিকে চোখ রেখে গাড়ী চালাতে চালাতে বললেন— আই ফীল টেরিবলি সরি! তুমি গাড়ীর মধ্যেকার ঘটনাকে বলতে চাও বিবাহ, আমাকে মনে করছ তোমার স্বামী বলে, কেমন কি না? এতে কিন্তু তুমি বিবাহের প্রতি অবজ্ঞা দেখাচ্ছ, তোমার নিজের প্রতিও।'

'আমি সেই ঘটনাকে বিবাহ বলে মনে করি ঠিকই, কিন্তু তা বলে এ কথা ভাববেন না যে সেই সুবাদে আপনার কাছে স্ত্রীর অধিকার দাবি করতে এসেছি। আই মীন লীগালি। আমি যে অন্য কোনো পুরুষের স্ত্রী হতে পারব, সেই পবিত্র অধিকার আমি হারিয়েছি। আমি এখন যে-কোনো লোকের উপপত্নী হয়ে থাকতে পারি, কিন্তু পত্নী রূপে নয়। আই ক্যান ওনলি বি এ কনক্যুবাইন টু সামওয়ান; ইয়েস, নট এ ওয়াইফ এনি মোর। আমি তাই আপনাকে খুঁজে বার করেছি। পত্নী হবার জন্য নয়, এমন কি উপপত্নীও হতে চাই না। আমি শুধু চাই আপনি আমাকে কাজে নয় নামে মাত্র আপনার উপপত্নীরূপে গ্রহণ করুন। দ্যাট উইল হেল্প মী এ লট।'

'ডোণ্ট টক ননসেন্স। ওতে তোমার কোনো উপকারই হবে না। তোমার জীবনের বারোটা বছর তুমি নষ্ট করেছ, তাই কি যথেষ্ট নয়? বন্ধুরূপে তোমাকে যতটা সাহায্য করতে পারি, করব। তুমি তোমার জীবনকে সুন্দর করে গুছিয়ে তোলো। আমি যে তোমার জীবনের এতটা বছর মাটি করে দিয়েছি, এই ঢের!

তুমি কেবল এইটুকু স্থির করে ফেলো যে তোমার একটি সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক জীবন চাই, দেখবে কী চমৎকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে। আমার নামের সঙ্গে তোমাকে যুক্ত ক'রে বৃথা তুমি নিজেকে নষ্ট কোরো না। আমি, দেখো, সমস্ত ব্যাপারে একটি অপদার্থ লোক। বারো বছর আগে যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় সেদিনও আমার কোনো গুণ ছিল না, কিন্তু একটা জিনিস ছিল প্রচুর— টাকা। তার মানে আমি ছিলাম লাখোপতির ছেলে। কিন্তু এখন আমার সে যোগ্যতাও নেই। এখন আমি আর ধনীর সন্তান নই, একজন বড়লোক গৃহিণীর স্বামী মাত্র— জাস্ট্ এ হাস্‌ব্যাণ্ড অব্ এ মিলিয়নরেস্।'...

আই. জি. অফিসের সামনে কার পার্কিং-এর জায়গাটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— 'আচ্ছা, তোমার কি খুব তাড়া আছে? নয়তো এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে যেতে পারি।'

'আমাব কোনো তাড়া নেই। আমাকে কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।'

বীচ রোডের প্যারালাল যে রাস্তাটা সমুদ্রের বালুতটের মধ্য দিয়ে চলে গেছে সেখানে গাড়ীটা ঘোরাতে ঘোরাতে উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন:

'আর ইউ লিভিং অ্যালোন্?'

'না, সঙ্গে আমার মা রয়েছে।'

'তাহলে তোমরা দুজন মাত্র?'

'ইয়েস, একজন ব্রাদার আছে বটে, তবে সে আলাদা থাকে। সেই ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলায় আমার সেই ভাই আমাকে ও মাকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেয়। দু'দিন অঝোর বৃষ্টির মধ্যে আমার মা ও আমি খোলা বারান্দায় কাটিয়েছি। মা আমায় মারল, বকল। তবু সেই আমার একমাত্র আশ্রয়। সেই একটি কারণেই তাকে আমি অন্য কারও কাছে রাখতে পারি না। যদিও আমার লাইফটা যে এভাবে এসে দাঁড়িয়েছে তার জন্য প্রধানত দায়ী আমার মা, তবু তার জন্য কি আমি তাকে ঘৃণা করতে পারি?'

গাড়ী থামিয়ে উনি নেমে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট ধরালেন। মুখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। খানিক পরে আমার কাছে ঘুরে এসে গাড়ীর উপর হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "ইউ আর রাইট্। ওদেরকে আমরা ঘৃণা করতে পারি না। আমার বাবা আমার জন্য কি করেছিল জানো?" এইটুকু বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বুঝলাম, ইনি এই মুহূর্তে তাঁর নিজের জীবনের কোনো সমস্যার কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছেন। রাত তখন সাড়ে সাতটা। ইনি বললেন— "বরাবর আমি এই সময়টায় কোথায় থাকি জানো? আমাদের

ক্লাবে। বাড়ী ফিরতে রাত বারোটা বেজে যায়। কোনো কোনো দিন দুটো-তিনটেও হয়ে যায়। এই হালে আমি কী হয়েছি জানো? আই হ্যাভ বিকাম্ অ্যান অ্যালকোহলিক্।"

কথাটা শুনেই আমি একবার তাকালাম তাঁর মুখের দিকে।

'আমি কী বললাম বুঝতে পেরেছ? আমাদের জনতার ভাষায় বললে বলতে হয়— আমি একজন মাতাল। মাতাল না হলে আমি বাঁচতে পারি না তা নয়, কিন্তু মাতাল না হ'লে আমার প্রেস্‌টিজ থাকে না। খুব মজার ব্যাপার, কী বলো? আমার স্ত্রীর কথা বলেছি না? তিনিই হলেন মিলিয়নরেস!…'

আরে বাবা! এই সামান্য কথাটা বলার সময়ে ওর মুখের ওপর একটা ঘৃণা ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল কেন?

'আমার প্রতি আমার স্ত্রীর ভালোবাসাও নেই, শ্রদ্ধাও নেই, কিন্তু ভয় আছে কারণ আমি যে মাতাল। আমি যেদিন মাতাল হই, ভয়ে কাঁপতে থাকে। তাকে ভয় খাওয়াবার জন্যই আমি মদ খাই। যখন আমি সুস্থ স্বাভাবিক থাকি, মদ-টদ খাই না, তখন তার খুব গলাবাজি শোনা যায়। আর মদ খেলে আমার গলাবাজি। তখন সে ভয়ে চুপটি করে থাকে। সো আই ফেল্ট দাস ইজ বেটার দ্যান দ্যাট।' এই বলে বেশ রঙ্গ করে হাসতে লাগলেন। আমার খুব বিশ্রী লাগছিল ব্যাপারটা। তিনি ইংরেজিতে বলেই চললেন: 'আমি জীবনযাপন করছি একটা কয়েদীর মতো। আমার নামের কোনো সম্পত্তির মালিক আমি নই। তার ওপর আমার কোনোরকম অধিকারও নেই। আমার বিষয়ে যদি জানতে চাও তবে আমার বাবার উইলখানা পড়ে দেখো। এর পরেও যদি বলো যে আমার বাড়ীতে মাথা উঁচু ক'রে— একটা পুরুষ মানুষের মতো আমার বাস করা উচিত, তবে আমি বলব কী জানো? আমার মতো একটা প্রেতাত্মা তা পারে না।'

'প্রেতাত্মা' কথাটা তাঁর ইংরেজী কথার অনুবাদ মাত্র। তিনি বলেছিলেন: 'এ ডেড সোল'।

সমানে তিনি বলে চললেন— 'সেই উইলে আমার বাবা আমার বিষয়ে বলেছেন কী জানো? গোড়াতেই বলা হয়েছে: 'আমার একমাত্র পুত্র প্রভাকরন্ একটি অপদার্থ, অকর্মণ্য, দুশ্চরিত্র এবং দুর্জন-সহবাসকারী লোক। এইভাবে একটা মস্ত তালিকা তৈরি ক'র তারপরে আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত সম্পত্তি আমার স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছেন বাবা। তার মধ্যে এই-সব ক্লজেস্ ছিল যে মাসে আমাকে দেওয়া হবে এত টাকা এবং এই এই আইটেম থেকে আয়ের টাকা আমি হাতখরচ হিসেবে ব্যয় করতে পারব। এই-সব ব্যবস্থা ক'রে মরণকালে বাবা আমার হাত ধরে কেঁদে বলেছিলেন; 'এইসমস্ত করেছি তোমারই ভালোর জন্য।' আমি কি সেইজন্য আমার বাবাকে ঘৃণা করতে পারি?

সেই পথ দিয়ে তখন একটা আইসক্রীমের গাড়ী যাচ্ছিল। দেখেই ছোটো

শিশুর মতো খুশী হয়ে উনি বললেন— 'আইসক্রীম খাবে?'

'নো থ্যাঙ্কস!'

'আই লাভ ইট'— এই বলে দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে ডেকে আনলেন। আইসক্রীমের গাড়ীটা এসে কার-এর কাছে দাঁড়াল। উনি তাকে নানারকম কথা জিজ্ঞেস ক'রে অবশেষে দুটি 'কাপ' ও একটি 'বার' কিনলেন। পার্স্ থেকে দুটো টাকা বের করে লোকটিকে বিদায় দিলেন। এই অবস্থায় এঁকে দেখে আমার না খুবই কৌতুক বোধ হচ্ছিল।

'জাস্ট টেস্ট ইট— বেশ চমৎকার' এই বলে একটা 'কাপ' আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। না নিয়ে আর উপায় রইল না। আইসক্রীম আমিও খাই। কিন্তু রাস্তার ওপর গাড়ীর মধ্যে বসে একজন পুরুষের চোখের সামনে জিব দিয়ে চুষে চুষে আইসক্রীম খেতে খুবই লজ্জা হচ্ছে। ওঁর আর কি। রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়েই সেই 'কাপ'টাকে এক মিনিটের মধ্যে চুষে শেষ ক'রে আকাশের দিকে মুখ ক'রে কাঠিটাও চাটতে শুরু ক'রে দিলেন···।

'বুঝলে কি না, আমাদের মঞ্জু চার-চারটে 'কাপ' খেয়ে ফেলে। আমাদের বাড়ীর সকলেই আইসক্রীম ভালোবাসে। পদ্মা টের পেলে অবশ্য বকাবকি করে। ছেলেমেয়েরা তাই এসে আমাদের দলে ভিড়ে যায়।'

এই প্রথম জানতে পেলাম ওঁর স্ত্রীর নাম পদ্মা।

আমি কাপের শেষ আইসক্রীমটুকু কাঠির চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললাম— 'আপনার বাবা উইলে যা ব্যবস্থা করেছেন সে তো আপনারই স্বভাব-চরিত্রের জন্য, কি না? তিনি যে আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলেন তার প্রমাণ আপনাকেই দিতে হবে।'

'কিসের প্রমাণ দিতে হবে?' আইসক্রীম খেতে খেতে প্রশ্ন করলেন। ওঁর সম্পর্কে আমার কেবল একটি কথাই মনে হল— হোয়াট এ স্পিরিট পারসনালিটি।' কিছুক্ষণ আগে উনি খুব গম্ভীরভাবে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন যে বাবার উইল করা ঠিক হয় নি এবং ওঁর মানমর্যাদাও বিশেষ কিছু নেই। সেই লোকটিই এখন একটি আইসক্রীমের লোভে সমস্ত ভুলে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে কি না তাঁকে কিসের প্রমাণ দিতে হবে।

'আপনার বাবা আপনার বিষয়ে উইলে যে ব্যবস্থা করে গেছেন, সেটা যে ঠিক নয়, ভুল, আপনার চাল-চলন আচার-ব্যবহার দিয়ে তার প্রমাণ দিতে হবে!'

সেই কাগজের কাপটাকে পাকিয়ে বল ছোঁড়ার মতো উপরের দিকে আলগোছে ছুঁড়ে দিয়ে আর-একহাত দিয়ে আঘাত ক'রে সেটাকে অনেক দূরে ফেলে দিয়ে আমার কথার উত্তর দিলেন; 'দেখো, যেভাবে আছি, এই বেশ আছি। বাবা যে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে গেছেন আমি তাই নিয়ে থাকব বলে স্থির করেছি। বোধহয় তিনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন। অত সাবধানে

উইল করা হলেও প্রথম প্রথম আমি যা চাইতাম পদ্মা তাতেই মাথা নাড়ত এবং আমিও জলের মতো টাকা ঢালতে লাগলাম। এই ব্যাপার দেখেই পদ্মা হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেল। সে আমার সব-কিছু অন্যায় সহ্য করে। কিন্তু অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা শুনলেই সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ঐ একটা বিষয়ে মেয়েরা মেয়েই থেকে যায়। কিন্তু একটা কথা, যত মেয়ের সঙ্গে আমি দেহমিলনে আবদ্ধ হয়েছি, তারা কেউ আমাকে ভালোবাসে নি। এমন-কি আমার স্ত্রীও না। আমিও সেই ভালোবাসার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেছি। প্রত্যেকটি নারীকে প্রথম দেখার সময়ে ভাবি— এই বুঝি ভালোবাসা। কিন্তু কিছুদিন পরেই বেরিয়ে পড়ে— সব মিথ্যে।' এমনভাবে তিনি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যেন সকলেই তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। তাঁর এই ধরনের কথাবার্তায় আমার খুব হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু কোনোমতে সেই হাসি চেপে তাঁকে প্রশ্ন করলাম: 'আপনাকে কেউ ভালোবাসে নি বলে আপনি একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাই না? আচ্ছা বলুন তো, আপনি আপনার স্ত্রীকে কিংবা অন্য মেয়েকে ভালোবেসেছেন কিনা। আপনার অনেক টাকা আছে, গাড়ী আছে, বাড়ী আছে, জীবনযাপনে অনেক জাঁকজমক করে থাকেন, ভালো ভালো জামাকাপড় পরেন, সেন্ট আতর মাখেন, আর তাই বুঝি মনে করেন রাস্তার মেয়েরা আপনাকে দেখলেই ভালোবাসবে, তাই না?'

বয়সে ইনি আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড়ো। কিন্তু আমার মনে হয় আসলে ইনি একটি শিশু যাকে আমি অনায়াসেই লেখাপড়া শিখিয়ে দিতে পারি। এঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ে আমার কখনো এ-রকম মনে হয় না যে আমি একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। আমার মনে হয় যে এঁর চেয়ে আমি মনের দিক থেকে অনেক বলশালী। এখনই যদি এঁর এই অবস্থা, তবে বারো বছর আগে যে কতটা বোকা ছিলেন সহজেই বোঝা যায়। সেই বোকামির কাছে ভীত হয়ে আমি নিজেকে বলি দিয়ে এলাম! আজ তো স্পষ্টই বুঝতে পারছি সেদিন আমি কী বোকাই না ছিলাম। আজ আমার এই মনের ভাব দেখে বুঝতে পারি আমি অনেকটা বদলে গিয়েছি। একটা কথা ভেবে আমি বিস্মিত হই। কাল মানুষের মধ্যে কত-না পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। কেবল কয়েকটি মানুষেই বোধহয় অপরিবর্তিত থেকে যায়। ইনি তাদেরই একজন।

রাত সাড়ে আটটা বাজতে চলেছে। হঠাৎ ইনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি বুঝলাম, এখন ওঁকে ক্লাবে যেতে হবে। বুঝতে পেরে বললাম— 'চলুন যাওয়া যাক। আপনার তাড়া থাকলে আপনি এখান থেকেই চলে যান। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ী চলে যাই।'

'নো··· নো··· আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসি। তোমাদের বাড়ীটা কোথায়?'

'এগমোর স্টেশনের কাছে।'

আবার গাড়ী চলল। সিগারেটের ধোঁয়া থেকে সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। উনি একটি কথাও বললেন না। আমিও চুপচাপ বসে রইলাম।

গাড়ী আমাদের রাস্তায় এসে ঢুকলে দূর থেকেই দেখলাম মা সদর দরজায় আলো জেলে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাকে জীবনের একটা বড়ো আঘাত দিতে যাচ্ছি।

এই যে আমাদের বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে থামল। মা চেয়ে দেখল। সামনের সীটে পাশাপাশি বসা আমাদের দুজনের ওপরই সদরের আলোটা এসে পড়ল। মা চেয়ে চেয়ে দেখলেন। সে যাতে ভালো ক'রে দেখতে পায় সেই-জন্য আমি ইচ্ছা করেই ওঁর কাছ থেকে ধীরে-সুস্থে বিদায় নিচ্ছিলাম।

'কাল আপনাকে ফোন করব। গুড নাইট। চিয়ার ইউ।'

আমি ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নামলাম। মা কাণ্ডকারখানা দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

12

রাত দশটা বাজতে চলল। গঙ্গা এখনও ফিরল না। ও যে সেই সকালবেলায় অফিসে চলে যায়, সেই থেকে শুরু ক'রে সন্ধ্যাবেলায় ওর বাড়ী ফেরা পর্যন্ত আমার মন এখনও এই ভেবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে— গঙ্গা আসছে না কেন, এত দেরী হচ্ছে কেন ওর? এখন তো প্রতিটি মুহূর্তে বুকটার মধ্যে কেমন যেন করছে আমার।

রোজই ভাবি ওকে একবার জিজ্ঞেস করব কথাটা। কিন্তু গলা পর্যন্ত এসেই কথাগুলি আটকে যায়। আমি কী কী জিজ্ঞেস করব? কেমন ক'রে কথাটা পাড়ব? আর জিজ্ঞেস করবার আছেই বা কী? মন তো আমার সব কথাই জানে। জানে যে আমার মাথার ওপর একটা বজ্রপাত হ'তে চলেছে!

যখন খুশী আসে, যেখানে খুশী বেরিয়ে যায়। এখন কি আর আমি একটা কথাও বলতে পারি? আমি কেবল আকাশ-পাতাল ভাবনা করে মরি, ভয়ে ভয়ে থাকি। মেয়েটাকে নিয়ে যে যাই বলুক-না-কেন, আমি কি তাই বিশ্বাস করব?

গণেশটা এসে কত কথা বলে গেছে। সে যা বলেছে তা কি মেয়ের কাছে বলি? কেন বলি না? আমার কথা হল এই— আমার অন্তরে যখন এই গভীর বিশ্বাস রয়েছে যে মেয়ে আমার কোনো খারাপ পথে যাবে না, তখন কিসের জন্য এইসমস্ত কথা নিয়ে মেয়েটাকে ঘাঁটাব? ওর সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলে। আমিও ছেড়ে দেবার লোক নই, জোর গলায় বলি— 'আমার মেয়ে সম্পর্কে কথা বলতে তোমার কি রাইট হে?' গণেশকেও আমি এইভাবেই চুপ করিয়ে দিই।

আচ্ছা, গঙ্গার কি বন্ধু-টন্ধু আছে ? আমি এই কথা ভেবে ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই, ও কারও সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে কিনা তারপরে ওর কপালটা একেবারে সাদামাটা। কেন বাপু, একটু তিলক লাগাতে পার না ? আমার মনে তো কত ইচ্ছে, শুক্রবারে কিংবা কোনো পাল-পার্বণের দিনে মেয়েটা মাথাটা একটু ফুল-টুল দিয়ে সাজাক। তা কি শোনে আমার কথা ? ও যখন বেড়াতে বেরোয় কিংবা চাকরী করতে যায়, দেখে গর্বে আমার বুকটা ভরে আসে। কিন্তু আমার কপালে কি সুখ আছে ? সব গেছে। একদিন ঘুরে ঘুরে এ বাড়ী সে বাড়ী গিয়ে গিয়ে মেয়েটার কত গুণ গেয়েছি। এখন ? বাইরে গিয়ে মুখ দেখাতে পারি না।

এই তো কিছুক্ষণ আগে ছেলেটা এসে চলে গেল। ওর এক-একটা এক-দিকে ঢুকে আরেক দিক থেকে বেরোয়। আমার হেঁট মাথা আর তুলতে পারি না। কিছুই বলতে না পেরে বসে বসে চোখের জল ফেলি। আমার কান্নায় অন্যের কী ? স্বামী বলো, মেয়ে বলো— ঘরের বৌ বলো— সকলকে দিয়ে আমায় কাঁদতে হবে, এই ছিল ললাট-লেখন। কিন্তু কেন আমার এই পোড়া কপাল ? আমি কি সাত-আটটা ছেলেমেয়ে বিইয়েছি ? ছেলে বলতে একটি, মেয়ে বলতে একটি। মেয়েটা বাইরে থেকে অকাজ-কুকাজ করে আসে, আর ছেলেটা এসে নানা আকথা-কুকথা শোনায়। আমি এখন কি করব, হা ঈশ্বর !

লোকে যা মেয়েটাকে নিয়ে বলাবলি করে, তা যদি সত্য হয়, এই জীবন তবে কিসের জন্য ? আমার বড় ভয়, মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে সেই বারো বছর আগে একদিন কিছুক্ষণের জন্য ওকে পাগলামিতে পেয়েছিল, আর এখন তো নিত্য পাগলামি। পাগলামি মেয়েটাকে নাচাচ্ছে, মেয়েটিও নাচছে ! ওকে বলে কোনো লাভ নেই। কিছু একটা ভূতেটুতে ধরেছে ওকে নাহলে কি ওর মতি-বুদ্ধি এমন বিগড়ে যায় ? আমি যদি নিজের চোখে না দেখতাম, কেবল লোকের মুখে শুনতাম, তবে তো বিশ্বাসই করতাম না।

আজকাল গঙ্গা যখন এসে সদরে পা দেয় তখন সদর থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত গন্ধে ম ম করে। কেউ যদি একথা বলত আমি কি বিশ্বাস করতাম ? কপালে তিলক পরাটা দরকার, আমারও তো সেই আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখন দেখছি তিলকের বদলে কপালে কী একটা পরে— নামও জানি না ছাই, আজকাল না কি এইটেই ফ্যাশান ··· দেখতে একটা ছাপের মতো। এসব পাগলামি ছাড়া আর কী বলুন ? ভুরুতে আবার কাজল মাখে। কানের কাছে কিছু চুল টেনে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখে যে দেখলেই মনে পড়ে যায় আমাদের দেশের সেই ছোটলোকগুলির বড় বড় জুলফির কথা। আগের ব্লাউজগুলি সব দরজিকে দিয়ে এমনভাবে হাতা কাটিয়ে আনলে যে এখন আর লজ্জাশরমের বালাই নেই — কাঁধ বগল সব দেখা যায়। এই যে সেদিন নতুন ব্লাউজগুলি তৈরী করালো সেগুলির হাত বলতে কিছুই নেই ! মনে হয় যেন ভিতরে পরবার জিনিস। সব সময়েই যদি এইসব প'রে ঘোরাফেরা

করে তবে দিনকয়েক পরে কে আর লক্ষ্য করছে? নতুন নতুন ফ্যাশন হলেই হল। গঙ্গা না কিনে ছাড়বে না!

এক সময়ে আমার অহংকার ছিল এই ভেবে যে মেয়েটা কোনোদিন তার কোনো সখী-টখী বাড়ীতে নিয়ে এসে বলে নি— 'মা, এ আমার বান্ধবী।' এই গেল মাসে কোথাকার কোন্ একটা শয়তানকে টেনে এনে ঘরের মধ্যে ঢোকাল। ওর নাকি বন্ধু! আহা রে, বন্ধু! এ সব কী ভয়ানক কথা? বেটাও এসে মাতব্বরের মতো সোফার ওপর বসে ফুড়ুক ফুড়ুক ক'রে ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়তে লাগল, দুর্গন্ধে সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চায়। কী জাত কে জানে? মুসলমান, না খৃস্টান, না ছোটলোক?

ওই যখন টেনে এনে ঘরের মধ্যে বসাল, আমি আর কী করব? হা আমার কপাল! কফি তৈরী করে এনে শয়তানটার সামনে রাখতে হল। শরীরটা যেন কুঁকড়ে গেল। গঙ্গাই লোকটার মুখোমুখি বসে নানা রকম আদর-আপ্যায়ন করতে লাগল। রান্নাঘরের ফাঁক দিয়ে আমি তো সবই দেখছি। হায় আমার কর্ম। কফি খাবার নমুনা দেখো-না কেন? গ্লাসটা তুলে চুমুক দিয়ে একেবারে এঁটো করে খেল! বলি, আলগা না খেয়ে চুমুক দিয়ে খেতে মজাটা কী? আবার শব্দ ক'রে ক'রে চুমুক দেয়। ভাগ্য ভালো, লোকটা চলে যাওয়ার পর গঙ্গা নিজেই গেলাস-টেলাস তুলে ধুয়ে মুছে দিল। তারপর আমি একটু শুদ্ধ জল ছিটিয়ে সেগুলি তুলে রাখলাম।

গঙ্গা এখন আর বেড়াতে যায় না। লোকটাই আসে, কাক ডাকার আগেই এসে হাজির হয়। গাড়ী নিয়ে আসা মাত্রই তামাশা দেখার জন্য আশেপাশের প্রতিটি বাড়ীর সমস্ত লোক সদর দরজায় ও জানালায় এসে দাঁড়ায়! লজ্জা, লজ্জা! সমস্ত মানমর্যাদা ডুবিয়ে দিল। মাথা টান করে চলা ঘোড়ার মতো গঙ্গাটা ওই লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কী যে একগুয়েমি! সকলকে যেন ডাক দিয়ে বলছে— 'এই ছাখ্ আমার নাম আমিই ডোবাব।'

এখন আমি কী করি? এইভাবে ও হাতছাড়া হয়ে গেল। আগের মতো এখন কি আর মারধোর করতে পারি? আচ্ছা লুকিয়েচুরিয়ে বেঙ্গু দাদাকে একখানা চিঠি লিখলে কেমন হয়? কিন্তু সে-ই বা এসে কী করবে এখন? দাদা প্রায়ই নানা কথা বলত। তখন আমার কী কষ্টই না হত। "তোর মেয়ে সম্পর্কে ভালো কথা বলব ভাবিস নে। ওর কি আর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে?" তখন দাদার কথাগুলিকে খুব অন্যায় বলে ঠেকত, এখন আর ঠেকে না। এখন যে যা বলে, তাই ন্যায্য বলে মনে হয়। আমার কী অদৃষ্ট! এই সমস্ত নোংরা ব্যাপার দেখে শুনে মুখে যে চুনকালি পড়ল।

আমি বাবা চলে যাব। যেদিকে দুচোখ যায়। যে-কোনো বাড়ীতে গিয়ে এই রাঁধুনীর কাজ করলেও আমার একবেলার খাওয়া আর পরনের একখানা

কাপড় কি জুটবে না, নাকি? ছি! আমি এখন কিসের জন্য কাঁদছি? ও যা করছে, তা নিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করার মতো অধিকার এখন তো আমার নেই। মা হলেও মায়ের মর্যাদা হারিয়েছি।

আজ আসুক বাড়ীতে। দুটোর মধ্যে একটা কথা আমাকে জানতেই হবে।—'গঙ্গা! আমি কি এখানে থাকব? না, অন্য কোথাও চলে যাব?' গণেশটা বলেছে, আমাকে নাকি এখানেই থেকে ওদের বিছানা পেতে দিতে হবে! আইয়ো! গণেশ যে কত রকমের কত প্রশ্ন বলে গেছে।

ঠিক এই সময়ে আমি অফিস থেকে বাড়ী ফিরলাম। আজও খানিকটা দেরী হয়ে গেল। সদরের আলোটা জেলে মা সিঁড়ির ওপর বসে আছে। অভ্যাস-মতো হাতে একখানা পত্রিকা থাকত। আজ কিন্তু খালি হাতে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। আজ আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই এসেছি। আজ তিনি আমাকে নিয়ে আসেন নি। আমিই তাঁকে আসতে বারণ করেছি। কারণ কথায় কথায় বড্ড বেশি খেয়ে ফেলেছেন আজ। তাই ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে এসেছে, আমি পিছনের সীটে বসেছিলাম। 'ঐ যে সদরে লাইট জলছে,···একজন মহিলা বসে আছে সিঁড়িতে, ঐ বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড় করাবে'— এইভাবে ড্রাইভারকে আগেই নির্দেশ দিয়েছিলাম। সে আমার নির্দেশমতো গাড়ী থামিয়ে নীচে নেমে এসে পিছনের একটা দরজা খুলে দিল। তারপরে একটা সেলাম ঠুকে জিজ্ঞেস করলেন— 'আমি এখন যেতে পারি দিদিমণি?

গাড়ী চলে গেল। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছি— এ কী, মুখে আঁচল চেপে মা কিসের জন্য হঠাৎ এইভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে? আমি এখন কি করব? দেখেও দেখি নি— এই ভাব দেখিয়ে ভিতরে চলে যাব? অথবা একটু কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করব··· 'এ সব কী হচ্ছে মা?' অথবা 'মা, কেন তুমি কাঁদছ গো?' এই বলে একটু সান্ত্বনা দেব?

আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। কিন্তু এই বয়সে মা আমার শিশুর মতো কাঁদছে দেখে কেমন যেন মায়া হল। কিন্তু মাকে কী বলে ডেকে সান্ত্বনা দেব? মনে পড়ে গেল, গত বারো বছর ধ'রে মাকে একবার 'মা' বলে ডাকি নি।

আমি একবার পিছন ফিরে রাস্তার দিকে তাকালাম। উলটো দিকের বাড়ীর জানালায় জানালায় লোকের মাথা দেখা যাচ্ছে। 'সামনের বাড়ী থেকে উঁকি মেরে কারা দেখছে। যদি কিছু বলার থাকে ভিতরে এসে বলো।' এই বলে সদরের লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে ভিতরে চলে এলাম। মা দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে আমার পেছন পেছন বড় ঘরে এল। মায়ের দিকে ফিরে তাকাতে

আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। ড্রেস চেঞ্জ করবার জন্য রুমের মধ্যে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম।

তখন মা বলল— 'সামনের বাড়ী থেকে কে না কে দেখেছে তা কি তোর আজই চোখে পড়ল?'

ড্রেস চেঞ্জ করতে করতে আয়নার দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেয়ে গেল। পোশাক পরে আয়নার সামনে ইচ্ছে করেই ঘুরে বেড়াই।

এর পরে আমি আর আমাকে নষ্ট করতেই পারি না। আমার জীবনে প্রয়োজন ছিল একটু অভিনয় করার ক্ষমতা। এতদিন সেই ক্ষমতা ছিল না বলেই সকলেই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে ভেবেছে— 'বোকা, একেবারে বোকা।' এখন সেই আমাকেই সকলে সমীহ ক'রে চলে। কিন্তু একটা কথা। আগেও আমাকে কেউ সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা বলে মনে করত না, এখনও করে না। তখনও ওরা ভাবত— 'নষ্ট হওয়া বোকা মেয়ে।' এখনও ভাবে— 'নষ্ট হওয়া মেয়ে।' কিন্তু 'বোকা' বলে কেউ ভাবে না। সকলেই জেনে গেছে আমি আর অনাথা নই, আমারও একটি পুরুষ মানুষ রয়েছে।

অফিসে এখন আর কেউ খারাপ মতলব নিয়ে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে না। অবশ্য আড়ালে সকলেই চুপে চুপে নিন্দা করে। করে করুক। আই ডোণ্ট কেয়ার্। কেন কেয়ার্ করব? আমি কি সাজগোজ না ক'রে বিধবার মতো থাকব? এক সময়ে ছিলাম। সাজগোজ কিছুই করতাম না। কারণ তখন কেবলই ভয় হত রাস্তায়, বাসে পাজী বদমায়েস লোকগুলো আমার সঙ্গে মিসবিহেভ করবে। এখন আর আমার ভয় কী? কে কী বলল তাতে আমার কী?

ওরা বলাবলি করে, তিনি আমায় উপপত্নী ক'রে রেখেছেন। সেটা অবশ্য ভালো কথা, ন্যায্য কথা স্বীকার করি। কিন্তু সত্যিই যে আমি তাঁর উপপত্নী নই, একথা তিনিও জানেন, আমিও জানি। বাইরের লোক সেকথা জানে না।

সেদিন তিনি আমায় দেখতে এসেছিলেন— কী আশা ও বিশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন জানি না। আমি যে তাঁকে ভালোবাসি না একথা জানার পরে তিনি খুব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন বুঝেছি। তাঁর বড়ো আকাঙ্ক্ষা কোনো নারী তার প্রাণমন দিয়ে তাঁকে ভালোবাসে। সেরকম কোনো নারীর মন এ জন্মে তিনি পাবেন বলে মনে হয় না। হায়, পুওর সোল্।

আমি তাঁকে চিরকাল বিশ্বাসভাজন বন্ধু বলেই মনে করব। কখনো তিনি সত্যিই শিশু! কখনো আমার তাঁর ব্যবহারে দেখি পিতৃস্নেহ। এ কথাটা আমি বুঝতে পারি যখন মঞ্জু ও তার বাবার কথাবার্তা শুনি। তিনি আমার সঙ্গে যেমন কথাবার্তা বলেন তাঁর মেয়ের সঙ্গেও তেমনি। স্ত্রীর সঙ্গে বোধকরি দশ বছরের ওপর কোনো বাক্যালাপ নেই। ঝগড়াকে তো আর বাক্যালাপ

বলা যায় না। সেটি অবশ্য রোজই হয়ে থাকে।

তাঁর মেয়ে মঞ্জুকে আমার খুব ভালো লাগে। আজকাল রোজ অফিস থেকে সোজা ওদের বাড়ীতে যাই। মঞ্জুর বাবা বোতল ও গেলাস নিয়ে ব্যাল্‌কনিতে বসে পান শুরু করে দেন। মঞ্জু ও আমি নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলি। তিনি শুনে শুনে হাসেন— কখনো সে হাসির মানে বোঝা যায়, কখনো বোঝা যায় না।

আমাকে দেখার পর থেকে ইনি আর ক্লাবে যান না। সত্যই এতে আমি ভারি খুশী। আজকাল আমি যেসব নতুন স্টাইলে জামাকাপড় পরে থাকি, সব মঞ্জুর কাছে শেখা। আমার মনে হচ্ছে সুখশান্তিতে জীবন কাটাবার জন্য আমি একটা পথের সন্ধান পেয়েছি।

আমি যখন এলাম, মা বসে বসে কাঁদছিল। কান্নার কারণটা কী হ'তে পারে? হয়তো গণেশ বসেছিল। সেদিন আমাদের অফিসের সামনে আমি যখন গাড়ীতে উঠছি, গণেশ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। 'দেখুক-না, ভালো ক'রে দেখুক' মনে মনে এই কথা ভেবে আমি সামনের সীটে তাঁর পাশে চড়ে বসলাম। আমি সব জানি, ভালো করেই জানি। আজকাল রোজ রোজ গণেশ সি. আই. ডি.-র মতো আমাকে ওয়াচ্ করে। বাড়ীতে গিয়ে নিশ্চয়ই বৌদির কানে লাগায় কেমন ক'রে আমি এক-এক দিন এক-একজনের গাড়ীতে ক'রে যাতায়াত করি। আমার খুব স্টাইলের কথাও ফলাও ক'রে বর্ণনা করে। বৌদি আবার সকলের কাছে রটিয়ে বেড়ায় যে আজকাল আমি বব্‌ড্ হেয়ার নিয়ে গাউন পরে সকলের মধ্যে ঘোরাফেরা করি। রটাচ্ছে রটাক। তারা এক-একটা বলে, আমি এক-একটা ক'রে দেখছি। ড্রেস করার মধ্যে দোষটা কী? যে যার খুশীমতো, সুবিধামতো ড্রেস করবে। ওতে বলার আছে কী?

আমি আমার ঘরের দরজাটা খুলে বড় ঘরে এলাম। মা এভাবে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কী দেখছে? আমিও চেয়ে আছি মায়ের দিকে। 'এসব কি ভালো হচ্ছে?' মায়ের গলাটা ধরা-ধরা। আমি একথার কোনো উত্তর দিলাম না।

'তুই বললি কিনা রাস্তায় কে না কে লোক আমাদের দেখছে। ওরা যে সব সময়ই দেখছে সেটা তোর খেয়াল নেই বুঝি?'

'দেখে দেখুক।'

'সন্ধেবেলায় গণেশ এসে কত কী কথা শুনিয়ে গেল তা জানিস? মায়ের সম্মান যদি থাকত, তবে কি আর শোনাতে পারত? তবে কি আর তুই এমনি ধারা চলাফেরা করতিস?' এই বলে মা পুনরায় কাঁদতে থাকে। মায়ের কান্না আমি দেখতে পারলুম না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'গণেশ কি আজ নতুন এসে কিছু বলেছে। ও তো বরাবর বলে আসছে। এজন্য তুমি এখন

কাঁদছ কেন ?'

'ও তো বরাবরই বলত তা ঠিক। কিন্তু আমি কি কখনও তোকে কিছু বলেছি ? বলি নি, কারণ তোর ওপর আমার খুব বিশ্বাস ছিল। আমি ভাবতাম ওরা সব গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য বলে। কিন্তু এখন তোর চালচলন দেখে আমার নিজেরই গা জ্বলে ওঠে। আমার পেটে জ্বালা ধরে।' এই বলে মা তার পেটের ওপর হাত চাপড়াতে লাগল। কিন্তু সেখানেই থামল না। মুখ তার চলতেই থাকল। 'তোর বুদ্ধিশুদ্ধি বিগড়ে গেছে নাকি ? নইলে এই রকম কাপড়, এই রকম ব্লাউস পরে রাস্তায় বেরোতে হয় ? আগে ভাবতাম তোর কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। এখন সর্বনাশের পথে যাবি বলেই এইটারে জুটিয়েছিস। অমন একটা বেটাছেলের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধুত্ব কিসের লা ? এইভাবে সময়ে-অসময়ে কার-না-কার গাড়ীতে এসে নামতে দেখলে লোকে তো বলবেই। তারা কি আর ভুল বলবে ? তুই তো সব জানিস, মা। কেন এমন করিস তবে ?" এই বলে মা কাঁদছে আর কথা বলছে। তারপরে দাঁতে দাঁত কামড়ে আগের মতোই চীৎকার ক'রে বলল— "শনিতে ধরেছে, তোকে শনিতে ধরেছে। মুখ খুলে উত্তর দে না। আমার মনে আমি বকবক ক'রে যাচ্ছি, আর তুই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছিস। না-হয় তো আমাকে কোথাও বিদায় করে দে।"

মায়ের মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। এখনো তাকে মা বলে ডাক দিই নি। আমার ড্রেস নিয়ে লোকের এত কথা কিসের ? আমি নিজেকে খুব সামলে নিয়ে বললাম— 'সেই গাড়ীতে যিনি আমায় নিয়ে আসেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি সেই লোক। একদিন তোমায় দাদা বলেছিল মনে পড়ে ?— "যদি ক্ষমতা থাকে সেই লোকটাকে খুঁজেপেতে নিয়ে এনে গঙ্গা বলুক-না কেন— এই আমার স্বামী, আমরা কি বাধা দেব ? দেব না !"— আমার বুদ্ধি দিয়ে কৌশল দিয়ে বারো বছর পরে তাঁকে খুঁজে বের করেছি। কিন্তু আমরা কখনও স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করি নি। আমরা দুজনেই সে অবস্থা পার হয়ে এসেছি। তাঁর ফ্যামিলি আছে, বিয়ের যোগ্য মেয়ে আছে। এখন থেকে তিনিই আমার স্বামী হয়ে থাকবেন। দুনিয়াটাকে চিনলে না মা. কত বাঘ গোক্ষুর চামড়া দিয়ে গা ঢেকে আত্মগোপন ক'রে আছে'— বেঙ্গুমামা সম্পর্কে আর একটু হ'লে বলে ফেলেছিলাম আর কি. হঠাৎ জিবটা কাটলাম। আমি যে অম্মুজম্ মামীর কাছে শপথ করেছি।

'শাট্-আপ্ (আইয়ো ! আমি কী বললাম ? একথা আমার বলা উচিত হয় নি। এর কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু আমি বলে ফেলেছি) তুমি কি তোমার মর্যাদামতো থাকো ? ইট্ ইজ্ ওয়ান্স্ ওন্ বিসনেস। তুমি গ্লাসগো মলমল দিয়ে বানানো ব্লাউস পরছ। রঙীন শাড়ী পরছ। বাবার মৃত্যুর দিন কি তুমি মাথার চুল ফেলে দিয়েছিলে ? এ নিয়ে বৌদি পর্যন্ত নানা কথা বলে।'

মা তক্ষুণি বজ্রাহতের মতো বসে পড়ল।

আজ রাতে আমি কিছু খেলাম না। মাকে কাঁদিয়েছি, তার মনে ব্যথা দিয়েছি, আজ তাই আমার উপবাস। এই উপবাসই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

13

ইনিই হচ্ছেন সেই লোকটি—এ কথা শোনার পরে তাঁর ও আমার সম্পর্কের বিষয়ে মা কী ভাবছেন জানি না! কয়েকদিন আগে মামা মায়ের কাছে বলেছিল 'লোকটাকে খুঁজে পেতে টেনে আনতে পারলে...'। মা তো তখন মামার কথার উত্তরে অনায়াসেই বলতে পারত 'দাদা, তুমি কি বলছ এসব? কে না কে, কোথাকার লোক, কী জাত, কী বংশ কে জানে? বুঝতে না পেরে মেয়েটা যদি একটা ভুল ক'রেই থাকে, তার জন্য আমরা কি তাকে তাড়িয়ে দিতে পারি? তুমি যা বলছ, দাদা, এসব ঠিক নয়। গঙ্গার খুঁজতেও হবে না, কোথাও যেতে হবে না'। মা তো একথা বলতে পারত। কিন্তু বলে নি। মায়ের বুঝি মনে হয়েছিল মামার কথাই ঠিক। মা কী বলে শোনার জন্য আমি কিছুক্ষণ আড়ালে অপেক্ষা করলাম। মায়ের মুখভাব থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে সে মামার কথায় সম্মতি দিয়ে স্বীকার করেছিল যে তার দাদার কথাই ঠিক।

মামা নিশ্চিতভাবে বুঝে নিয়েছিল যে আমি একটা হাবাগবা মেয়ে। সে আরো বুঝেছিল যে সেই লোকটা যেমন অপদার্থ তেমনি শয়তান। আমি কি কখনও তাকে খুঁজে বের করতে পারব? অসম্ভব। যদি বা খুঁজে বের করতে পারি, সেই লোকটা নিশ্চয়ই 'ছি ছি' করে আমাকে অগ্রাহ্য ক'রে চলে যাবে। এই সাহসে ভর ক'রেই মামা অতসব কথা বলেছিল। তা না হলে কি লোকটার জাত, ধর্ম কিছুই না জেনে বলতে পারে—'সেই তোর স্বামী।'

মা ও মামা বোধ করি এ সব বিশ্বাসই করে না। তারা হয়তো ভাবে—এই নতুন লোক আর সেই বারো বছর আগেকার লোক এক নয়। পৃথক। এটা বোধহয় নতুন কোনো লোক গঙ্গাকে নষ্ট করছে। করুক!

যদি আমার কথা বলেন তো আমার জীবনের সমস্যা মিটে গেছে। আমি এখন শান্তিতে আছি। সুখে আছি। আমার কোনো অভাব নেই, অসন্তোষ নেই।··· অফিসে ও অন্যত্র আমাদের দুজনকে নিয়ে লোকে কী ভাবে সে কথা আমার ভালোই জানা আছে। তারা যে ঐভাবে বলাবলি করে, তাতেই আমার জয়।

লোক হিসাবে ইনি খারাপ নন। এই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পরস্পরের কাছে বেশ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছি।

অফিসের লোকেরা আজকাল মনে করছে আমি একটা অস্বাভাবিক

অবস্থা থেকে এখন খুব স্বাভাবিক হয়েছি। প্রথম এক সপ্তাহ অফিসের সহকর্মীরা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে ইনি রোজ দশটা নাগাদ আমাকে অফিসে নিয়ে আসেন এবং অপরাহ্ণে এসে ডেকে নিয়ে যান। দেখতে দেখতে এখন তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন আর কেউ এদিকে চোখ মেলে তাকায় না। তাকালেও আগের মতো, ভীড় ক'রে এসে চেয়ে থাকে না।

গত এক মাস যাবৎ নিত্য সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার সময়ে ইনি আমাদের বাড়ীতে আসেন। আমি যদি তখন স্নানের ঘরে বা খাবার ঘরে থাকি, তবে ইনি আমার রেডি হওয়া পর্যন্ত বড় ঘরে বসে সিগারেট মুখে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, এদিকে ইনি মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন, ওদিকে মায়ের পেটে গনগন ক'রে আগুন জ্বলছে। আমি কী বলব? নীরবে মাথা নীচু ক'রে তৈরি হয়ে নিই।

সোফা সেটের মাঝখানে বসানো টিপয়ের ওপর রাখার জন্য মাত্র গেল সপ্তাহে সতেরো টাকা দিয়ে একটি সুন্দর 'অ্যাশ্-ট্রে' কিনে এনেছি। মানে, তাঁর আবার আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের রীতিনীতি জানা নেই। যেখানে বসেন, যেখানে দাঁড়ান, রাশি রাশি সিগারেটের টুকরো। অফিসে যাবার সময়ে ঘরটাকে অমন নোংরা রেখে যেতে মন চায় না। হায়! মাকে কি এই সমস্ত টুকরো একসঙ্গে জড়ো করতে হবে?

আমি একটু কৌশল করে ওকে বলি— 'আপনি গিয়ে গাড়ীতে উঠুন, আমি এই এক মিনিটের মধ্যে এসে যাচ্ছি।' যেন কিছু ভুলে ফেলে রাখা জিনিসের কথা মনে পড়ে গেছে। ভিতরে এসে তাড়াতাড়ি ক'রে সমস্ত টুকরো কুড়িয়ে ময়লার ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিই। একদিন ব্যাপারটা মায়ের চোখে পড়ে। 'আইয়ো, এই ছিল কপালের লেখন' এই ব'লে কপাল চাপড়াতে থাকে। এর পরেই ওই 'অ্যাশ্-ট্রে' কেনার আইডিয়াটা আমার মাথায় জাগল। ওর জন্যও মা অনেক চেঁচামেচি করেছে। "ও তো থুথুর বাসন বললেই হয়। বিড়ি-সিগারেটের যত আবর্জনা ঘরের মাঝখানে রাখার কী দরকার? কেউ যদি বসে পড়ে, দেখে কী ভাববে?' এই কথাগুলি নিজের মনেই বলতে বলতে আমি কী উত্তর দিই জানবার জন্য আমার কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এর পরেই 'অ্যাশ্-ট্রে'-টাকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। তিনি এলে বস্তুটি বাইরে আসে। আবার তিনি চলে গেলে ওটি আমার ঘরে চলে যায়।

এইভাবে যতদূর সম্ভব অ্যাড্জাস্ট্ ক'রে চলতে চলতে আজ মায়ের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ দেখা দিল।

তাঁর লাইফটা নিতান্তই একঘেয়ে। অফিস নামে মাত্র। মনে হয়, আমার সঙ্গে এই পরিচয় হওয়ার পর থেকে মাসখানেক যাবৎ তিনি নিয়মিত অফিস করছেন। ইনি জয়েন্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, কিন্তু সেও নামে মাত্র। পদ্মার স্বামী বলেই অফিসে এঁর যা-কিছু মর্যাদা। সেদিন তিনি নিজেই বলেছিলেন।

চেক্-এ সই-টই করেন তিনিই। কিন্তু চেকগুলি পাস হবে তখনই যখন তার ওপর তাঁর স্ত্রী পদ্মার কাউণ্টার সিগনেচার থাকবে। ভেবে দেখলে এই সমস্ত ব্যবস্থা খুবই দরকার বলে মনে হয়।

ওদের বাড়ীর কথা যদি বলতে হয় তবে সে বাড়ীতে তিনটি শিশু— সুভাষ, বাবু এবং তাদের পিতা। স্ত্রী পদ্মার কাছেতে ইনি একটি 'স্পয়েল্ট চাইল্ড্' বলে গণ্য হন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে ছেলে দুটো যাতে এর হাতে পড়ে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য প্রতিমুহূর্তে পদ্মা ভয়ে ভয়ে বাপের হাত থেকে ছেলেদের আগলে রাখে।

এ বাড়ীতে দায়িত্বপূর্ণ বয়স্ক লোক হচ্ছে পদ্মা এবং তার মেয়ে মঞ্জু। মঞ্জুর বাবার মতে মঞ্জু খুব ব্রাইট গার্ল। পদ্মা তার স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণ হলেও মঞ্জু কিন্তু তার বাবাকে খুব ভালোবাসে। কোনো কোনো সময়ে বাপ তাঁর মেয়ের শিশু হয়ে যান। তখন মঞ্জুও বাবাকে বকুনি দেয়। "ঢের হয়েছে আজ, অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছ, আর না"— এই বলে মঞ্জু বোঁতল নিয়ে প্রস্থান করতে উদ্যত হলে তার বাবা 'প্লীজ্ প্লীজ্' করে কাকুতি মিনতি জানিয়ে মঞ্জুর হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নেন। তখন মঞ্জু বলে— 'দেন্ আই ডোন্ট টক টু ইউ' এই বলে মঞ্জু রাগ ক'রে চলে যায়। বাপ তখন কিছুক্ষণ মঞ্জুর গমনপথের দিকে চেয়ে থেকে, আবার কিছুক্ষণ বোতলটার দিকে চেয়ে থেকে, অবশেষে 'মঞ্জু মঞ্জু' ব'লে ডাকতে ডাকতে তাকে ধরে নিয়ে এসে বলে— 'এই দ্যাখ, যেমন ছিল তেমনই আছে। এক ফোঁটাও খাই নি। নিয়ে যা, তুলে নিয়ে যা। রাগ করিস নে।' এই বলে বোতলটা মঞ্জুর হাতে ফিরিয়ে দেন। মঞ্জু তখন স্নেহের হাসি হেসে বলে— 'ইট্ ইজ অল্ রাইট। এ লিট্ল'—এই বলে সামান্য খানিকটা ঢেলে তাতে সোডা মিশিয়ে বাপের সামনে রেখে দিতেই বাপ বলে ওঠেন— 'থ্যাঙ্ক্স্'। কাজেই বোঝা গেল এ বাড়ীতে মঞ্জুর বাপের চেয়ে ছোট শিশু আর কেউ নেই।

দিন-পনেরো আগে আমি প্রথমবার ওদের বাড়ীতে যাই। সেইদিনকার ঘটনাগুলো বেশ মনে পড়ছে। তিনি কিন্তু প্রথম দিন থেকেই আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। আমার বেশ ভয়-ভয় লাগছে। কিন্তু তাঁর মতে, তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে কথাবার্তা বলে তাকে আমার বন্ধুরূপে গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেকবারই আমি এই কথাটাই ভাবছিলাম যে, এই লোকটি কেমন, নিজের মেয়ের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। কিন্তু সেদিন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার পরে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে পরিচিত হয়ে আমার মন এই রকম একটা সুযোগ পাওয়ার জন্য খুব খুশী।

মনে হয় আমার সম্পর্কে আগে থেকেই মঞ্জুর বাবা মঞ্জুকে কিছু বলে থাকবেন। কী বলেছেন জানি না। তবে মঞ্জুর হাবভাব থেকে মনে হল সে সব-কিছুই জানে।... ছি! এইরকম অল্পবয়স্ক সন্তানদের কাছে সেই সব ঘটনা

বলেছেন ?

আমি এঁদের বাড়ীতে প্রথম যখন যাই কেবল তখন একবারের জন্য পদ্মার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল। হাসিমুখে 'আসুন' ব'লে অভ্যর্থনাও জানিয়েছিলেন। আমার কিন্তু মনে মনে একটা অনিশ্চিত রকমের ভয়। আগে থেকেই তিনি বলে রেখেছিলেন বলেই পদ্মা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বুঝলাম।

দোতলার খোলা বারান্দায় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার আলোয় পদ্মা তখন ডিনারের ব্যবস্থা করছে। লম্বা টেবিল, তার ওপরে সাদা চাদর বিছানো। দু' দিকেই লাইন ক'রে চেয়ার সাজানো। আর মুখোমুখি দু'দিকে একখানা করে দু'খানি চেয়ার। হোফট্-এর সামনে পদ্মা এবং তার বিপরীত দিকে আমি। আমার বাঁদিকে বসেছে মঞ্জু ও বাবু, ডান দিকে সুভাষ এবং তার ওপাশে গৃহকর্তা। চাঁদের আলোয় বসে বেশ ডিনার চলছে।

ওদের বাড়ীর সব-কিছুতেই জাঁকজমক। দুটি লোকের আহার পরিবেশন করছে চারজন লোক। আমিই একমাত্র ভেজিটেরিয়ান্ বলে সকলেই দুঃখিত। পদ্মা আমার মুখের দিকে এমন করুণভাবে তাকিয়ে আছে যেন সে দৃষ্টির তাৎপর্য হল— 'আপনি কি ডিমটিমও খান না?' খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল— 'আজকালকার দিনে খাওয়াদাওয়ার অত বাছবিচার নেই। সকলেই সব-কিছু খেতে আরম্ভ করেছে। আমি তো মনে করি ডিম খাওয়ায় কোনো দোষ নেই।'

পদ্মার কথার জবাব দিলেন ইনি! ইতিমধ্যেই নেশার ঘোরে তাঁর মাথা ঘুরছে, জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। 'ডিম হলেই কি তার মধ্যে প্রাণ থাকে? মঞ্জু তোর মা তো সায়ান্স পড়ে নি। কেউ যদি চেঁচাতে পারে তবেই সে মনে করে— হ্যাঁ জ্যান্ত বটে।'

বাবার কথা শুনে মঞ্জু হেসে ফেলল। পদ্মাকে দেখে মনে হল এইরকম আয়োজন-অনুষ্ঠানে নিরুপায় স্ত্রী অসীম সহিষ্ণুতা বজায় রেখে স্বামীর কথা শুনতে বাধ্য হয়। আর স্ত্রীর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বামী মহাশয় ইচ্ছা করেই মাতাল হওয়ার ভান ক'রে তাকে যা খুশী বলে নাকাল করে। কিন্তু পদ্মা যে আজ তাঁর এই সমস্ত কথার কিছুমাত্র আমল দিচ্ছে তা মনে হল না। স্বামীর সঙ্গে কথাও বলল না, তাঁর দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

বাপের কথায় মঞ্জুর হাসি দেখে পদ্মা খুব গম্ভীরভাবে আমার দিকে একবার তাকিয়ে মৃদু হেসে স্পুন হাতে নিয়ে আহারে মন দিল। তারপরে মিনিট-পাঁচেক একটি কথাও বলল না সে। পুনরায় সেই প্রসঙ্গ নিয়েই সে বলতে লাগল; 'সায়ান্স যা বলে আমিও তাই বলছি। ডিম দু' রকমের হয়। একরকম ডিমের মধ্যে প্রাণ থাকে, আর এক রকমে থাকে না। পোলট্রিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়। সেই প্রাণহীন ডিমে বাচ্চা জন্মে না। কাজেই সেই ডিম খেলে

কোনো পাপও হয় না।'

আমি বললাম, 'পাপ ব'লে নয়। অভ্যেস নেই বলেই আমি ডিম খাই নে।'

পদ্মা যে স্বামীর কথার পরে কথা না বলে মিনিট-পাঁচেক চুপ ক'রে ছিল, তার এই সাবধানতার কারণ হল— পদ্মার কথাকে কেউ যেন তার স্বামীর কথার উত্তর বলে মনে না করে। সঙ্গে সঙ্গে বললে তো স্বামীর সঙ্গে কথা বলা হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় পদ্মা তার স্বামীকে অতটুকু মর্যাদা দিতেও রাজী নয় এবং রাজী নয় বলেই সে বেশ-কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। কথাটা সত্যি। আমি আরও কয়েকবার লক্ষ্য করে দেখলাম— স্বামীর কথার পরে পদ্মা বেশ-কিছুক্ষণ নীরব থাকে। স্ত্রীর এই অবজ্ঞা বোঝার মতো ক্ষমতাও যার নেই, সেই বোকা লোকটি— আই অ্যাম সরি, সেই ভদ্রলোক— অন্যের কথার মাঝখানে যাহোক কিছু বলে ফেলেন। এইভাবে ব'লে ব'লে পদ্মার কথায় বারবার বাধা সৃষ্টি করতে তাঁর খুব মজা। মঞ্জু খুব চালাক মেয়ে। এই সমস্ত ব্যাপার সে বুঝতে পারে বলেই মাঝে মাঝে মুচকি হাসি হাসে। মঞ্জুর হাসিতে গর্ববোধ ক'রে তার পিতৃদেব খুব আনন্দ লাভ করেন। হায়!

সেই একবারই পদ্মাকে যেটুকু দেখেছি, তাতে তার সম্পর্কে আমার মনে উচ্চ ধারণা জন্মেছে। ছেলেমেয়েদের দিকে তার খুব লক্ষ্য। ডিনার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুভাষ ও বাবু একটি কথাও বলে নি। কখনও কখনও মঞ্জুর হাসির ছোঁয়া লেগে যদি তাদেরও মুখে হাসি দেখা দেয়, পদ্মা তখুনি, আমি যাতে বুঝতে না পারি এইভাবে, তাদের দিকে মুহূর্তের জন্য ফিরে তাকায়। তারপরে আর তারা হাসে না, চুপ ক'রে থাকে।

ডিনারের শেষে ব্যালকনিতে বসে যখন একটু কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন দুটি ভাই কেবল মায়ের কাছে 'গুড নাইট' বলে চুমু দিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে বাবাকে দূর থেকেই 'গুড নাইট' জানিয়ে ছুটে চলে গেল।

ছেলেরা যে তাঁর সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করে একথা কিন্তু তাঁর মনে জাগে বলে মনে হয় না। মঞ্জু আছে তাই. তা না হলে তার বাবার খুবই কষ্ট হত। মঞ্জু তার বাবার অবস্থাটা বুঝতে পারে বলে সব সময়েই তাঁর প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু সেই স্নেহের মর্যাদা উপলব্ধি করবার মতো জ্ঞানবুদ্ধি তাঁর আছে কিনা কে জানে। না থাকলেও মঞ্জুর স্নেহে যে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ তা বোঝা যায় একটি ব্যাপার থেকে। যে-কোনো বিষয়ে তিনি কথা বলবেন, তার মধ্যে বারে বারেই শোনা যাবে 'আমার মেয়ে মঞ্জু, আমার মেয়ে মঞ্জু।'

পদ্মাকে যখনই দেখা যায়, সঙ্গে একটি ট্রান্জিসটার। সিনেমার গান তার প্রাণ বললেই হয়। ডিনারের সময়েও কিংবা ব্যালকনিতে বসে কথাবার্তার কালেও পদ্মার পাশে ট্রান্জিসটারে অনুচ্চ সুরে সিনেমার গান চলতেই থাকে।

এত ব্যাপারের মধ্যে সে ঠিক গানের রস আদায় ক'রে ছাড়ে। ওই ধরনের কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেও পদ্মা কিন্তু নিজে যথাসম্ভব সরল ও অনাড়ম্বর ভাবেই থাকে। কানে ও নাকে যে গয়না দুটো দেখা যায়, তা নিশ্চয়ই হীরের তৈরি। তাও বেশ ছোটখাট কিন্তু সুন্দর। পদ্মা পান খায় প্রচুর। তবুও দাঁত-গুলি কী চকচকে। পদ্মা যে কেবল সিনেমার গল্প শুনতেই ভালোবাসে তা নয়, সিনেমা নিয়ে আলোচনা করতেও খুব পছন্দ করে। আমি যে ও-বিষয়ে কী কথা বলব তা তো জানি না। মঞ্জুও তার মায়ের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যখনই দুজনে একসঙ্গে থাকে, তাদের আলোচনার বিষয় হল সিনেমা। তবে পদ্মা নাকি সমস্ত ছবিতেই মঞ্জুকে নিয়ে যায় না। মঞ্জু নাকি সব ছবি দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না।

ব্যালকনিতে বসে যখন কথাবার্তা হচ্ছে— তখন রাত সাড়ে-আটটাও হয় নি। তখনই গৃহকর্তা সোফার ওপর হেলান দিয়ে দিব্যি নাক ডাকা শুরু করেছেন। আমি বেশ বুঝতে পারলাম পদ্মা মনে মনে চটে গেছে। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে ওই নাকের শব্দ যাতে আমার কানে না পৌঁছয় সেইভাবে ট্রানজিস্টারের শব্দ বাড়িয়ে দিল। আমিও পদ্মার তৃপ্তির জন্য তাঁর স্বামীর দিকে না তাকিয়ে পদ্মার সাথেই কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

আমি বেশ লেখাপড়া-জানা মেয়ে তা ছাড়া একজন অফিসার, এই কারণে আমার প্রতি পদ্মার শ্রদ্ধা রয়েছে মনে হল। তবু কিন্তু আমার প্রতি মুহূর্তেই এই একটা ভয় যে পদ্মা যদি জিজ্ঞাসা করে যে তার স্বামীর সঙ্গে আমার কীভাবে চেনা-পরিচয় হল, তবে? ভাগ্য ভালো! এ পর্যন্ত কেউ আমাকে ওরকম কোনো প্রশ্ন করে নি।

মঞ্জু ও আমি আজকাল তার বাবার বিষয়ে অনেক কথাবার্তা বলি। এই পনেরো দিনের প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আমি মঞ্জুর ঘরে গিয়ে বসি, তার সঙ্গে গল্প করি! তারপর আটটা সাড়ে-আটটার সময়ে উঠে পড়ি। সম্ভব হলে মঞ্জুর বাবাই আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যান। নইলে ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে আসে।

মঞ্জু তার বাবা ও মা দুজনকেই ভালো করে জানে। আমি বুঝেছি বাবার জন্য মঞ্জুর মনে বেশ একটু দুঃখপূর্ণ মমতা রয়েছে। মা যে বাবার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করে তাতে সে মোটেই খুশি নয়। কিন্তু একথাও সে বুঝেছে যে এর অন্য কোনো উপায় নেই। মঞ্জু আমাকে বলেছে যে তার মা মঞ্জুকে তার বাবার সঙ্গেও কোথাও যেতে দিত না, এমন-কি, বাপের সঙ্গে কথাবার্তা ও ঘনিষ্ঠতা এই মাত্র কয়েকদিন হল হয়েছে। তাও সন্তানদের মধ্যে এইটুকু প্রশ্রয় পেয়েছে মঞ্জুই। অন্য সন্তানেরা বাপের কাছে ঘেঁষতেই নাকি পারে না। এই সমস্ত কথা মঞ্জু যখন আমার কাছে একদিন বলল, আমার মনে হল এই ব্যাপারেও সে অসুখী। অবশ্য

তারপরে মঞ্জু আমাকে বলল যে তার মায়ের এই কঠোর শাসনের মূলে যুক্তি আছে।

একদিন যখন মঞ্জুর বাবা ঘরে বসে পান করছেন, হঠাৎ সেখানে সুভাষ এসে উপস্থিত। পিতৃদেব গ্লাসে খানকটা ঢেলে সুভাষকে বলতে লাগল— 'খা, খেয়ে ফেল, শরীরের পক্ষে খুব উপকারী।' তারপরে একথা সেকথা বলে ছেলেটাকে খাইয়ে মজা দেখার জন্য ছেড়ে দিল! হায় সরলমতি বালক! ঘূর্ণিত মস্তকে মায়ের ঘরে গিয়ে বমি ক'রে ফেলল। তারপরে এই বলে কান্না শুরু ক'রে দিল— 'বাবাই তো বলল— খা, খেয়ে ফেল, শরীরের পক্ষে উপকারী। তারপরে খাইয়ে দিল।' ...ন একটা বড় রকমের হাসির ব্যাপার তৈরি করেছেন এই মনোভাব নিয়ে সুভাষের বাবা পুত্রের পিছন পিছন এসে হো হো করে হেসে উঠল— মায়ের অবস্থা তখন কী রকম হতে পারে? তখনও নাকি পদ্মা তার স্বামীর কাছে একটি কথাও বলে নি। এমন-কি তার মুখদর্শন পর্যন্ত করে নি। সুভাষকে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চার ঘা নাকি বসিয়ে দেয়। কিন্তু হলে হবে কি, স্বামীর গায়ে তো আর হাত তুলতে পারে না। সেদিন সারারাত সুভাষের পিঠে কেটে-কেটে পড়া আঙুলের দাগগুলির উপর মলম দিতে দিতে পদ্মা নাকি খুব কেঁদেছিল। এই সব কথাই মঞ্জুর কাছে শোনা।

এইখানেই শেষ নয়, আরও আছে। মঞ্জুর বাবার কাছে একটি সন্ধ্যা মানে হাজারটি টাকা খরচ। ক্লাবে ফ্লাস খেলায় হেরে গেছে। নিজের হাতেও টাকা নেই, ওদিকে পদ্মার কাছেও চাইতে ভয়। অবশেষে আলমারী থেকে টাকা বের করে দেবার জন্য মঞ্জুকে তার বাবা অনুরোধ জানাল। 'শোন মঞ্জু, টাকাটা আজ রাতেই এনে দেব। তোর মা যেন জানতে না পারে. আমি ঠিক ফেরত দেব।'... এই সব কথা বলে মঞ্জু আমাকে জানাল— 'এখন সুভাষ ও বাবু যদি বাবার হাতেই শিক্ষা পায় তবে আমারই তো ভয় লাগে। আপনিই বলুন— হাউ মাশী ইজ রঙ!'

মঞ্জু যে আমাকে পছন্দ করে এবং প্রতিদিন তাদের বাড়ীতে আমাকে যেতে বলে, তার একটি মাত্র কারণ— আমি ওদের ওখানে যতদিন যাচ্ছি ততদিন ওর বাবা আর ক্লাবে যায় নি।

আমার এখন মোটামুটি তৃপ্তিকর অবস্থা। এই লোকটি তাঁর অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতার জন্য আমার জীবনটিকে নষ্ট ক'রে দিয়েছেন সত্য বটে, তবু আমি যদি আমার বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে এই লোকটির জীবনকে সৎপথে আনতে পারি, তবে আমি আরও খুশী হব। আমি তাঁকে একথাটা ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছি যে এখানে আমার আসার উদ্দেশ্যই হল— তাঁর ও আমার মধ্যেকার সম্পর্কটা ঠিক কী সেইটে দূর করা।

...রো বছর প... এই প্রথম দিনটিতে যখন আমার জন্য তিনি আইল্যাণ্ড

গ্রাউণ্ড-এ এসে অপেক্ষা করছিলেন, তখন তাঁর মনটা ছিল চাপল্যে ভরা। আমার সঙ্গে কথাবার্তার পরে, আমাকে ভালো ক'রে জানতে পারার পরে তাঁর সেই মানসিক চপলতা দূর হয়ে গেছে।

পদ্মার সঙ্গে তার স্বামীর আজ অনেক দিক থেকেই কোনো সম্পর্ক নেই। এক বাড়ীতে থেকেও তারা পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা। ফলে তিনি তাঁর কু-অভ্যাসের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। পছন্দসই নারী চোখে পড়লে তার পিছু নেওয়া, পল্লীবিশেষে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া—এই তাঁর কু-অভ্যাস। বস্তুত তিনি যে আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে পারছেন তার কারণ বোধ করি এই যে, তাঁর চাপল্য দূর করার মতো পরিচিত জায়গা রয়েছে। থাক্-না। তাতে আমার কী ক্ষতি।

কোনো কোনো সময়ে তিনি আমাকে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যে সোজা নিজের বাড়ীতে চলে যান একথা বলা যায় না! কারণ তাই যদি হয়, তবে গাড়ীর মধ্যে আগে থেকেই বোতল-টোতল সাজিয়ে রওনা হবেন কেন? তার মানে আমার বাড়ী থেকে অন্য কোথাও রাত কাটাতে যান। কিন্তু আমি ও-সম্পর্কে তাঁকে কোনো দিন কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। উনি যা খুশী করুন, আমার তাতে কী?

আমার তাতে কী ক্ষতি? আই-আইয়ো! এখনই আমার মনে এই ধিক্কার উদয় হচ্ছে? আচ্ছা মঞ্জু কী ভাববে! তার বাবা বাড়ী থেকে বেরোবার সময়ে যদি বলেন যে আমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই যাচ্ছেন এবং যদি পরদিন সকাল-বেলায় বাড়ী ফেরেন, তবে কি মঞ্জু আমার সম্পর্কেও খারাপ ধারণা পোষণ করবে না? ভাববে না কি যে তার বাবা কোথায় গিয়ে রাত্রিবাস করেন? ভাববে না কি আমার এখান থেকেই সকালে বাড়ী ফেরেন? অন্য সকলে যে যাই ভাবুক-না কেন, আমার তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মঞ্জু যে আমাকে খারাপ ভাববে তা আমার পক্ষে অসহ্য। আমি সে সুযোগ তাকে দিতে চাই না। সে যেন আমাকে ভুল না বোঝে। কাজেই এ বিষয়ে কি আমি 'আমার তাতে কী ক্ষতি' বলে চুপ ক'রে থাকতে পারি? এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই কথা বলা দরকার।

কী কথা বলা যায়? কীভাবে বলা যায়? ছি! এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে যাব? ভারি মুশকিলে পড়া গেল তো। আজ রাতে কি আমার খাওয়াদাওয়াও নেই? পেটের মধ্যে কি রকম খলখল করছে। কিন্তু না, আজ আমি মায়ের মনে ব্যথা দিয়েছি। আজ আমার উপবাসই প্রায়শ্চিত্ত। ঘুম আর আসছে না। কখন রে বাবা ভোর হবে। কখন একটু গরম কফি খেয়ে শরীরটা চাঙা করা যাবে?

আচ্ছা মায়ের মনে তো আজ অনেক কষ্ট দিয়েছি। এখন একটু তার কাছে গিয়ে, দু-একটি সান্ত্বনার কথা বললে হয় না? আহা! মা বসে বসে চোখের

জল ফেলছে— ভাবলে কেমন মায়া লাগে। না, আমার জিবটা এতক্ষণ কথা না বলেই কাটিয়েছে, এখন যদি একবার কথা বলতে শুরু করে, তবে না-জানি কী বলতে কী বলে ফেলবে!

ভোরবেলার দিকে একটু ঘুমের মতো এসেছিল। জেগে দেখি বাইরে রোদের আভাস। মা বোধকরি কফি তৈরি ক'রে রেখেছে। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এলাম, তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি— মা সেখানে নেই। এখনও উনোন ধরানো হয় নি। দুধটা ঘরে এনে যেভাবে রেখেছে সেইভাবেই পড়ে আছে।

সদর দরজা খুলে দেখি তো ব্যাপারটা কী! ব্যাপার ভালোই। বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগানো। মা কাছেই কোথাও গিয়ে থাকবে, এক্ষুণি ফিরে আসবে আর কি! ঐ যে এসেছে···গেট খোলার আওয়াজ পেলাম। আমার একটু রাগই হল মায়ের ওপর। মেজের ওপর পড়ে থাকা পেপারটা খুলে মুখটা আড়াল করে রাখলাম। তবু একবার ইচ্ছা হল দেখি, মা কোত্থেকে এল? দোকান থেকে কি? মুখের ওপর থেকে কাগজটা সরিয়ে দিতেই—

'হায় মা!' বলে আমি আমার মুখটা দুহাত দিয়ে ঢেকে ফেললাম।

পরনে একটা রঙ-ওঠা ভেজা কাপড়, ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে, গায়ে কোনো ব্লাউস নেই, মাথাটা মুড়ানো, আর সেই নেড়া মাথার ওপর ঘোমটা টেনে মা এসে দাঁড়িয়েছে।

খুব শান্ত কণ্ঠে বলল— 'এখন কী হল তোর? আমার তো এই বেশেই থাকা উচিত মা। আমার মা শাশুড়ী সকলেই তো এই বেশে ছিলেন। আমিও অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম— এই বেশেই থাকব। কিন্তু অদৃষ্টে ছিল— কথাটা তোর মুখ থেকে আসবে। ওরে, আমি একটুও রাগ ক'রে এ রকম করি নি। তবে সকাল সকাল গিয়ে আমার আরও আগে ফিরে আসা উচিত ছিল। দাঁড়া, দাঁড়া, আমি কফিটা বানিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে মা ভিজে কাপড়টা নিংড়োল।

মাকে এই বেশে দেখতে আমার কিন্তু কিছুমাত্র কান্না এল না, তবে দুঃখ পেয়েছি বৈকি।

14

কলেজ থেকে মঞ্জু বাড়ী ফিরে এল। আর আধঘণ্টা পরে গঙ্গা ও প্রভাকর এসে উপস্থিত হবে। সাধারণত মঞ্জুর পড়া শুরু হত রাত আটটার পরে। গঙ্গার এ বাড়ীর যাতায়াতের প্রথম দিকে তার আসার সঙ্গে মঞ্জুর লেখাপড়ার কোনো

সম্পর্ক ছিল না। আজকাল গঙ্গার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে বলে সন্ধ্যা ছ'টার সময়েই মঞ্জুর অধ্যয়ন শুরু হয়ে যায়। এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিল এই রকম : পড়তে বসে কোথাও কোনো সন্দেহ বা অসুবিধা দেখা দিলে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নেওয়ার মতো লোক বাড়ীতে না থাকায় মঞ্জু তার কোনো-না-কোনো বান্ধবীকে ফোন করত। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ঘুরে ঘুরে একঘণ্টা কথা বলার পরে আসল বিষয়টা ভুলে গিয়ে সেদিনকার পাঠ সেখানেই স্থগিত হয়ে যেত। এরকম ব্যাপার কেবল একদিন নয়, বেশ-কিছুদিন ধরে চলত।

এ বাড়ীর লোকজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লেখাপড়া জানে মঞ্জু। কাজেই পড়াশোনার বিষয়ে মঞ্জুকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার মতো কেউ নেই। গঙ্গা আসার পরে মঞ্জুর একটা কাজ হল যে যে-বিষয়ে বুঝে নিতে হবে সেই বিষয়গুলিকে মনের মধ্য থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে এক জায়গায় সংগ্রহ করে রাখা। মঞ্জু যত প্রশ্নই জমা ক'রে রাখুক, গঙ্গা সেগুলিকে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষিকার মতো খুব ধীরেসুস্থে দ্বিধাহীনভাবে বুঝিয়ে দেয়। একবারও তাকে এই বলে অপ্রস্তুত হতে হয় নি যে বিষয়টা তার জানা নেই। ক্লাসে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা যে-সব বিষয় বুঝিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে যদি কোনো অংশ অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, মঞ্জু তাও গঙ্গার কাছে জিজ্ঞেস করে বুঝে নেয়। হ'তে হ'তে এমন হয়েছে যে গঙ্গা আজকাল যেন মঞ্জুর ট্যুটরের মতোই এ বাড়ীতে যাতায়াত করে।

সন্ধ্যা থেকে মঞ্জু গঙ্গার আসার অপেক্ষায় থাকে। গঙ্গা এলে পরেই সে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে চলে যায়। গঙ্গা যতক্ষণ থাকে, তারই মধ্যে মঞ্জু পর-দিনের জন্যও কিছু প্রস্তুতি করে রাখে।

ও-বাড়ীর দোতালার তিনখানা ঘরের মধ্যে একখানা ঘরে পদ্মা, দ্বিতীয় ঘরে প্রভু এবং তৃতীয় ঘরে মঞ্জু থাকে। বাকীদের জন্য একতলায় আলাদা আলাদা ঘর রয়েছে। মঞ্জুর ঘরখানি বেশ গোছানো, পরিচ্ছন্ন একটি অধ্যয়ন কক্ষের মতো সুন্দর। প্রভাকরের ঘরখানি গঙ্গা কখনও কখনও বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখতে পায়। দেখলে মনে হয় ঘরখানি বড় বিশৃঙ্খল ভাবে সাজানো। কোনো কোনো দিন মঞ্জু তার বাবাকে পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার নানা উপদেশ দিতে দিতে ঘরখানি সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে আসে।

কেবল পদ্মার ঘরখানিই এয়ার-কণ্ডিশণ্ড্ করা। সর্বদাই বন্ধ থাকে বলে ঘরখানি কেমন সে বিষয়ে গঙ্গার কোনো ধারণা নেই।

গঙ্গাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়েই প্রভাকর স্নান করতে গেল। তার স্নান সেরে ড্রেস ইত্যাদি করতে এক ঘণ্টার মতো লেগে যায়। মাঝে মাঝে বাথরুমের টাবে বসে সে যে 'লো লো' শব্দ করে চিৎকার করে— গুণ্ডলো নাকি তার মতে গান— সেই শব্দ এখান থেকেও শোনা যায়। মঞ্জু উঠে গিয়ে বলে, 'একটু আস্তে

গান করো বাবা!'

মঞ্জুকে পড়াতে এবং তার সঙ্গে লেখাপড়ার বিষয়ে আলোচনা করতে গঙ্গার খুব ভালো লাগে। এন্‌শ্যেন্ট হিস্ট্রি এবং মডার্ন হিস্ট্রি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করার উদ্দেশ্যে গঙ্গা যখন মঞ্জুর সামনে লেক্‌চার দেয় তখন তার কলেজ জীবনের মধুর স্মৃতিগুলি পুনরায় রোমন্থন করার সুযোগ ঘটে।

চানটান সেরে ঘণ্টাখানেক পরে মদের বোতল হাতে নিয়ে প্রভাকর যখন ব্যালকনিতে এসে বসল, তার কিছুক্ষণ পরে গঙ্গা মঞ্জুর ঘর থেকে বেরিয়ে প্রভাকরের সামনে সসম্মানে উপস্থিত হল।

মঞ্জু তার ঘরে বসে কিছু একটা লিখছিল। হঠাৎ তার আসনে থেকে উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল— 'মিস্ গঙ্গা, একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে' এই বলে কিছু একটা অসুবিধার কথা বলল। তখনই গঙ্গা কিছু মনে না ক'রে উঠে গিয়ে মঞ্জুকে অসুবিধার জায়গাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল। বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় প্রভাকরের কাছে এসে বসল।

'মিস্ গঙ্গা, আর-একটা সমস্যা' এইভাবে মঞ্জু যখনই ডাকে গঙ্গার মন একটু সতর্ক হয়ে ওঠে— মঞ্জু কী জানতে চায়, কী তার জিজ্ঞাসা। আচ্ছা মঞ্জু যদি জিজ্ঞেস করে— 'আপনার সঙ্গে বাবার কী সম্পর্ক? কী ভাবে আপনি আমার বাবাকে চিনলেন?'— এই ধরনের কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেওয়া যায়— সেই কথা ভেবে বড়ই বিচলিত হয় গঙ্গা।

কিন্তু গঙ্গা একথাও বুঝতে পারল যে তার সম্পর্কে এবং এ বাড়ীতে তার আসা সম্পর্কে পদ্মা ও মঞ্জুর যে কথাবার্তা হয় তার মধ্যে গঙ্গা সম্পর্কে পদ্মার কোনো আগ্রহ নেই, বরং একটা ঔদাসীন্যের ভাব। গঙ্গার মাঝে মাঝে পদ্মার অবস্থায় নিজেকে বসিয়ে যখন কেউ দেখতে চায়, তখন কিন্তু নিজের সম্পর্কেই গঙ্গার একটা লজ্জা না এসে পারে না।

কিন্তু এই লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে যে রেহাই পাওয়া যাবে না গঙ্গা তা বেশ বুঝতে পারল এবং পারল বলেই সেই লজ্জা-অপমানের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করতে ত্রুটি করল না।

রবিবারগুলির বেশির ভাগ সময় গঙ্গা এখানে এদের সঙ্গেই কাটায়। তখন গঙ্গা ও মঞ্জু লেখাপড়া ও পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আরও অনেক বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করে। শপিং করবার জন্য বাইরে বেরোয়। কখনও বা রেডিওগ্রামে গান শোনে। আবার কোনো কোনো দিন এদের সঙ্গে সিনেমা দেখতেও যায়।

এই পরিবারের সঙ্গে এত মাখামাখি হওয়া সত্ত্বেও গঙ্গার ব্যাপারে পদ্মা নিজেকে কিছুমাত্র জড়িত না করে আলগা হয়ে থাকে। গঙ্গাও সেইভাবে এদের সকলের সঙ্গেই খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে, কথাবার্তা বলে। গঙ্গা একথাও ভাবে যে এদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করা তার উচিত নয়। র. কু. ব. লিখিত

গল্পের বিষয়ে অথবা গঙ্গা যে নিজেই একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে এসেছে সেই বিষয়ে, এই মঞ্জু যে র. কু. ব. নামধারী লেখকের রচনার খুব ভক্ত একথা যে গঙ্গা জানে সেই বিষয়ে— না কোনো প্রসঙ্গেই গঙ্গা নিজেকে প্রকাশ করবে না।

'আপনি কি র. কু. ব. লিখিত গল্পগুলি পড়েছেন? আমার খুব ভালো লাগে তার লেখা। অগ্নিপ্রবেশ পড়েছেন? ঐ একটা গল্পই আমার খারাপ লেগেছে। মিস্ গঙ্গা, আপনি কি জানেন, ওই লেখক আমাদেরই কলেজ লাইব্রেরির অ্যাটেণ্ডার?'

মঞ্জু হঠাৎ আমাকে র. কু. ব. সম্পর্কে কেন জিজ্ঞেস করছে বুঝতে না পেরে আমি একটু ভড়কে গেলাম। সেই অগ্নিপ্রবেশ গল্পটা সম্পর্কে অনেক কথা বলল মঞ্জু। ভাগ্য ভালো। গল্পটা মঞ্জুর পছন্দ হয় নি। মনে মনে ভাবলাম 'ও সমস্ত গল্প তোমার পছন্দ না হওয়াই ভালো। লেখক র. কু. ব. যে মঞ্জুদের কলেজ লাইব্রেরিতে চাকরি করে সে কথা আমি জানি, কিন্তু সেটা এখানে প্রকাশ করব কি করব না বুঝতে পারলুম না। আমিও যে ঐ একই কলেজে পড়েছি, একথা কি মঞ্জু জানে অথবা জানে না? জানা উচিত কি অনুচিত? ওর বাবার সঙ্গে কীভাবে আমার পরিচয় হল সেকথা কি তিনি বলেছেন মঞ্জুকে? জানি না।

'চুপ করে আছেন কেন? আপনি কি পড়েছেন সেই গল্পটা? আমাদের কলেজে তো এ নিয়ে ভীষণ কন্‌ট্রোভারসি? আমরা সকলেই তাঁর কাছে সোজা গিয়ে হাজির— প্রশ্ন করবার জন্য। কয়েকজন তো রীতিমত ঝগড়া করেছে তাঁর সঙ্গে। আচ্ছা ঐ গল্পটা কি কলেজে-পড়া মেয়েদের অপমান করে নি? তাও একটি উইমেন্‌স্ কলেজে চাকরি করেছে এমন একটি লোকের হাত দিয়ে কি না এই গল্প।— হাউ রিডিকুলাস!'

'হোয়াট ইজ রিডিকুলাস অ্যাবাউট ইট?' আমি এই প্রশ্ন করলাম বটে, কিন্তু প্রশ্নটা আমার কানেই যেন একটু রূঢ় শোনাল। যেন ক্লাসরুমে অন্যায়কারী কোনো স্টুডেন্টকে টিচার বকুনি দিচ্ছে! কিন্তু ব্যাপারটা যাতে সে বুঝতে না পারে আমি সেইভাবে সব কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলাম!

'মনে হয় পড়েন নি ঐ গল্পটা। সত্যি বলতে, কলেজের মেয়েদের পক্ষে খুবই অপমানকর ঐ গল্প।' মঞ্জু এই একটি কথাই বারবার জোর দিয়ে বলছে। আমি চুপ ক'রে না থেকে বললাম— 'গল্পটা পড়ি নি। কী আছে ওতে?' মঞ্জু তার নিজের ঢঙে গল্পটা বলতে আরম্ভ করল। বলবার সময়ে মঞ্জুর কথায় বোঝা গেল যে সে কাহিনীটাকে মিথ্যা বলেই মনে করে।

'ভয়ানক বৃষ্টির দিন। কলেজের সামনে বাস স্টপ। সব ছাত্রী চলে গেছে। কেবল একটি মেয়ে একলা দাঁড়িয়ে। তখন একটি লোক এলো গাড়ী চালিয়ে।

সে লিফ্‌ট দেবে বলল। মেয়েটিও গাড়ীতে উঠে বসল। কিছুই জানে না মেয়েটি। একেবারে নির্বোধ শিশু! তাকে কোথায় টেনে নিয়ে নষ্ট করল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে এসে সব কথা মায়ের কাছে বলে দিল। হোয়াট্‌ ননসেন্‌স্‌! এ সব কি এই যুগের ঘটনা? শো মি এ কেস্‌ লাইক হার।' এই বলে মঞ্জু আমার দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে দিল।

আমি নিতান্ত অজ্ঞের মতো হতবুদ্ধি হওয়ার ভাব দেখালাম।

কী সর্বনাশ! এমন সময়ে মঞ্জুর বাবা এসে দাঁড়ালেন। সব শুনেছেন নাকি তিনি? আমি যেন তাঁকে লক্ষ্যই করি নি এমন ভাব দেখিয়ে মঞ্জুকে বললাম, 'দেন্‌ হোয়াট? এইটুকু তোমার গল্প?'

তারপরে যা ঘটেছিল সেই বাকী অংশটুকু যদি তিনি বলতে আরম্ভ ক'রে দেন, তবে তো ভারি বিপদ। বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। উনি যদি সব কথা ফাঁস করে দেন তাহলে অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াতে পারে একবার ভেবে দেখছি: 'তারপরে কী হল জানো? মা ও দাদা মিলে সেই মেয়েটিকে বকল, মারল। তারপরে তার দাদা তার মাকে বলল—'তুমি তোমার মেয়ের হাত ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যেখানে খুশী চলে যাও'— এই বলে মা তো বোনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। তারপর ঐ দুটি স্ত্রীলোক কোথায় মেয়েটির মামাবাড়ীতে গিয়ে থাকল। সেই মেয়েটি পরে খুব লেখাপড়া শিখে, কয়েকটি পরীক্ষায় ভালো পাস-টাস ক'রে চাকরি করে। তবে বিয়েটা এখনও করে নি। অবশেষে একদিন তাকেই খুঁজে বার করল। কাকে? সেই যে পাজি লোকটা গাড়ীর মধ্যে মেয়েটাকে নষ্ট করেছিল— তাকে। ইতিমধ্যে দশ-বারো বছর কেটে গেল। এই আয়রনিটা কোথায় জানিস? এখন সেই পাজি লোকটার ডটার্‌ সেই মেয়েটির কাছে এসে বলে কিনা— 'শো মি এ গার্ল লাইক হার।' এর কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে মেয়েটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে কি বলে দিতে হবে উত্তরটা? বলো না কেন— 'এই যে সামনে দাঁড়িয়ে আছি. আমিই সেই মেয়ে গঙ্গা, চেয়ে দেখো।'

ইনি যদি এইভাবে বলেন তবে কেমন হবে ভাবছি। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ জাগে উনি বোধ করি ইতিপূর্বেই সব কথা বলে দিয়েছেন। মঞ্জু আমাকে গল্পটা শোনালো, সেই গল্প হতে-না-হতে ইনি এসে দাঁড়ালেন, তারপরে মঞ্জুর কথা 'ঐ রকম একটা মেয়ে আমাকে দেখান তো' এই বলে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মঞ্জু দাঁড়ালো— সমস্ত মিলিয়ে ব্যাপারটা যেন একটা নাটকের মতো মনে হল।

'কী গল্প? সিনেমার গল্প? তামিল সিনেমা, না ইংরেজী সিনেমা?' এই কথা বলতে বলতে মঞ্জুর বাবা এসে বসে পড়লেন।

'বাবা! ইউ জাস্‌ট্‌ লিস্‌ন্‌— শুধু শুনে যাও, কথা বোলো না। এখন আমরা

সাহিত্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি' এই বলে মঞ্জু তার বাবার মুখ বন্ধ ক'রে দিল। ইনিও কথা না বলে সিগারেট ধরিয়ে বসে রইলেন।

'দেখো বাবা! সেই র. কু. ব. লেখকটি তোমাদের আপিস ফাংশনে এসে বক্তৃতা করেছিল। আমরা বলেছিলাম— আপনার লেখা গল্প সম্পর্কে কিছু বলুন।'

উনি বললেন— 'বেশ বলেছে, না মঞ্জু? ইউ ওন্ট্ বিলিভ ইট। সেই আর. কে. বি. নামধারী লোকটি তোমাদের কলেজেরই একজন অর্ডিনারি পিওন। কিন্তু বলতে হবে, লোকটা গিফ্টেড সন্দেহ নেই'— এই বলে লেখকের প্রশংসা করতে গিয়ে একপ্রকার অদ্ভুত ইংরেজীতে বললেন— 'কিছু লোক জন্মায় মুখে রুপোর চামচ নিয়ে, কিছু জন্মায় সোনার জিব নিয়ে। তোমাদের কলেজে খুবই মর্যাদা। মঞ্জুর সুপারিশের জোরে তার সঙ্গে আমার পরিচয়।'

বাবার মুখে বারবার 'তোমাদের কলেজ, তোমাদের কলেজ' শুনে কিছুই বুঝতে না পেরে মঞ্জু একটু বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল। তারপর বলল— 'মিস্ গঙ্গা! আপনি আমাদের কলেজের স্টুডেন্ট?' মঞ্জু যেন কোনো নতুন আত্মীয়-স্বজন খুঁজে পেয়েছে। নিরুপায় হয়ে আমাকে স্বীকার করে বলতে হল, 'ইয়েস্।' মঞ্জু তখন আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন তুলে আমায় চেপে ধরল— 'তাহলে আপনি নিশ্চয়ই র. কু. ব.-কে জানেন। প্রায় কুড়ি বছর ধ'রে আমাদের কলেজেই কাজ করছে। তার পুরো নাম : আর. কে. বিশ্বনাথ শর্মা।'

'আমাদের কালে আমরা তাকে বিশ্বনাথ বলেই জানতাম। সে যে আর. কে. বি. একথা মাত্র কয়েকদিন আগে জানতে পারি। সে আমাদের কলেজ লাইব্রেরিতে কাজ কর[illegible]তাম। তুমি যে সেই কলেজেই পড়ছ তাও জানি। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে কানেক্ট্ ক'রে ভেবে দেখি নি। তার কোনো দরকারও ছিল না'— এইভাবে বেশ কৌশল ক'রে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে কোনোরকমে একটা জবাব দিয়ে আপাতত রেহাই পেলাম।

কিন্তু এখন কেবল একটা কথাই বারবার ভাববার চেষ্টা করছি— মঞ্জুর বাবার সঙ্গে আমার পরিচয়টা কীভাবে হল সেকথা কি তিনি বাড়ীতে বলে দিয়েছেন নাকি? ওই ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে রহস্যময় রয়ে গেছে। ওরা যদি এত ফ্রীভাবে কথাবার্তা বলায় অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তবে আমি কেবল কিসের ভয়ে নিজেকে এত লুকিয়ে রাখি? এই যে মঞ্জুর বাবার সামনেই মঞ্জুকে আমি জিজ্ঞাসা করছি : 'মঞ্জু, তোমার বাবা আমাকে কী ক'রে জানলেন সেকথা কি উনি বলেছেন তোমাকে?' মঞ্জুকে এই কথা জিজ্ঞেস ক'রে এবারে তার বাবার দিকে ফিরে ইংরেজীতে বললাম : 'হ্যাভ্ ইউ এভার টোল্ড হার অ্যাবাউট আওয়ার ফার্স্ট মীটিং?' হঠাৎ এরকম একটা কথা জিজ্ঞেস করার ফলে, কম্বলের ওপর দাঁড়ানো লোকের পায়ের নীচে থেকে কম্বল টেনে নিতে

থাকলে যে অবস্থা হয়, ওঁর দশাটাও সেই রকম হল। আমি তখন মঞ্জুর মুখের দিকে তাকালাম, তার মুখেও যেন আমাদের পরিচয়ের ঘটনাটা জানার জন্য একটা কৌতূহল ফুটে উঠল। সেই এক মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম— এ বাড়ীতে এ নিয়ে অল্প কিছু কথাবার্তা হয়েছে বোধহয়। এমন সময়ে ব্যাপারটাকে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মতো ক'রে মঞ্জুর বাবা বলে উঠলেন: 'কেন বলব? হোয়াই শুড আই? দিস্ ইজ্ মাই হাউজ। ফ্রেণ্ড বলে আমি জানিয়েছি। সেটাই কি যথেষ্ট নয়? প্রত্যেকটি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে একথাই বুঝি বলতে হবে— কী করে জানাশোনা হল, কোথায় কী ভাবে কবে দেখলাম? এটা কি সম্ভব? বাড়ীর সকলেই জানে আমার ডিসেন্ট ফ্রেণ্ডদেরই আমি বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আসি। অন্য সকলের সঙ্গে আমি গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করি।'

মঞ্জু আমার কানে কানে বলল— 'কেবল আপনাকে দেখার পরেই আমরা জানলাম যে বাবার ভালো বন্ধুও আছে।'

'এই মঞ্জু, তুমি আমার বিষয়ে কী বলছ ফিস্ ফিস্ করে? গঙ্গা, মঞ্জু তোমায় কী বলল?'

'সে কথা কেমন করে বলি? মঞ্জু আমার কাছে চুপিচুপি বলেছে, আমি কি তা জোরে বলতে পারি? তবে আমাদের মধ্যে কী করে পরিচয় হল সেটা আমি এখন বলতে চাই'— এই বলে আমি মঞ্জুর দিকে ফিরে বললাম:

'একদিন ভীষণ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কলেজে গেলাম। বাস আর আসে না। তোমাদের ঐ বড় গাড়ীখানা আছে না? সেইটে চালিয়ে তোমার বাবা এলেন। আমাকে লিফ্‌ট দিলেন... তারপরে আমি চলে গেলাম ডিব্রুগড়িতে। গেলমাসে একদিন কী একটা অফিসের কাজে উনি আমাদের অফিসে একেবারে আমারই ডিপার্টমেন্টে এলেন। কিন্তু উনি তো আমাকে চিনতে পারলেন না। তা ছাড়া মনেও নেই। আমার ঠিক মনে ছিল। পরিচয় হয়ে গেল। এই আর কি! এর মধ্যে গল্পটল্প কিছু নেই।'

আমার পিছন দিকে ওঁর মুখখানা ক্ষণে ক্ষণে কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল কে জানে?

'গঙ্গা! আমি বেরোচ্ছি। যাওয়ার পথে দরকার হলে তোমাকে ড্রপ ক'রে দিয়ে যেতে পারি। নাহয় তো এখানে থেকে তোমার সময়মতো যেয়ো।' এই বলে উনি খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে রওনা হচ্ছেন দেখে মঞ্জু জিজ্ঞেস করল: 'কোথায় যাচ্ছ বাবা? ক্লাবে?'

'নো, নো। অন্য কাজ রয়েছে। তবে ক্লাবে একবার গেলেও যেতে পারি। অনেক দিন হয়ে গেল যাই নি ওদিকে।'

'যাও, কিন্তু ওই তাসের খেলা-টেলা খেলবে না।'

'তা একটু খেলব।'

'বেশ, খেলো। কিন্তু আমার কাছে এসে টাকা চেয়ো না।'

'চাইব তো। এ কি তোমার বাপের টাকা নাকি?'

'বাপের টাকাই তো।' বলে মঞ্জু হাসল। ইনিও শিশুর মতো হেসে উঠলেন। যাকে রোজ রোজ অনেক রাত পর্যন্ত আমার জন্য বসিয়ে রাখতে আমার কষ্টই লাগে। আজ তাড়াতাড়ি ফিরব বলে স্থির করে বললাম—'ইয়েস, আমিও আসছি। বাড়ীতে কিছু কাজও রয়েছে'— এই বলে ওঁর সঙ্গেই রওনা হলাম। মঞ্জু আমার উদ্দেশে হাত নেড়ে বিদায় দিল।

15

ওঁর সঙ্গে আমার একটু নিরালায় কথা বলা দরকার। তাই উনি রওনা হতে ওঁর সঙ্গে চলে এলাম। আজকাল ওঁর সঙ্গে নির্জনে কথা বলার তেমন কোনো সুযোগ হয় না। অফিস থেকে আমাকে নিয়ে আসার সময়ে খানিকটা বলা যায়। কিন্তু ঐটুকু সময় যথেষ্ট নয়। কথা বলতে আরম্ভ করে তারপর বীচ্ এবং হোটেলে যেতে হয়। বাড়ীতে যাওয়া মাত্রই আমি মঞ্জুর ঘরে গিয়ে বসি। উনি যান স্নান করতে। তারপরে শুরু হয় ওঁর নিয়মিত পান। উনি যে সুরাপায়ী, কথাটা জানার পর থেকে আমার মনে হতে লাগল ওঁর কাছে সীরিয়াস কিছু বলায় লাভ নেই। একেই তো উনি বোকা ধরনের লোক, মদ খেলে তো কথাই নেই। সোফার উপর বসে অনর্গল আবোল-তাবোল বকে যেতে পারেন। তখন ওঁকে দেখলে আমার বেশ কষ্ট হয়। আচ্ছা লোকগুলো মদ খায় কিসের জন্য? ওঁকে দেখলে তো মনে হয় মদ-টদ খেয়ে উনি কিছুমাত্র সুখী নন। ফিজিক্যালি যে কষ্ট ভোগ করেন তা বোঝা যায় ওঁর কপালের দিকে তাকালে। কপাল থেকে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ে। চোখ দুটো লাল হয়ে যায়। জিবটা জড়িয়ে আসে। সেইসঙ্গে চলে প্রলাপ। কখনো-সখনো বমি করেও ভাসিয়ে দেন। শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। মনে হয় পানাসক্ত সকলেরই এই একই হাল। তবু যে কেন লোকে মদ খায়, মদের জন্য পাগল হয়, জানি না বাপু।

আমার কী মনে হয় বলি! মদখোরই বলুন, বিকারগ্রস্তই বলুন, আর পাগলই বলুন— এদের মধ্যে বেশি কিছু পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। মদ খেলে সুখ হয় মনে করে যারা মদ খায় তারা কি মায়ার জগতে বাস করে। মানুষের শরীর মদ গ্রহণ করতে চায় না— রিভোল্ট করে। তাই তো মদের মধ্যে সোডা মিশিয়ে, বরফ ঢেলে ঝাল-মিষ্টি নানারকম চাট সহযোগে মদ খেতে হয়। মদ শরীরকে তাজা রাখে—এও একরকমের মন ভোলাবার মন্ত্র। এত সব

আয়োজন করে মদকে উদরস্থ করতে হয়। তারপরেও ঐ দ্রব্যটি উদরস্থ হয়েও বেরিয়ে আসতে চায়। একেই বোধ হয় মাতালের দল মনে করে সুখ। হাউ ইগনোরেন্ট! এর চেয়ে বড় মূর্খতা আর কী?

যারা এই অ্যালকোহলের শাসনে থাকে, তাদের ওপর যে-কোনো বিষয় সহজেই শাসন চালায়। সংসারে যারা সুযোগ-সন্ধানী, স্বার্থান্বেষী, তারা নিজ নিজ মতলব হাসিল করবার জন্য ইচ্ছে করেই মদ্যপায়ীদের দুর্বলতার মুহূর্তে এসে হাজির হয়। কিন্তু যারা হিতৈষী, তারা কখনও মত্ততার সময়ে মত্ত লোকের কাছে কথা বলতে যাবে না।

আমি যে ওঁর সঙ্গে দরকারী বিষয়েও কথা না বলে চুপ করে থাকি তার কারণ এই একটিই নয়। আমি ঠিক জানি না, বুঝি না ওঁর সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে কিংবা কোন্ জায়গা থেকে শুরু করা যাবে। তবু ওঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা আমাকে বলতেই হবে। ওঁর এবং আমার মধ্যে অন্তরঙ্গতার আবশ্যকতা কী? আমার ক্ষেত্রে তো উনি সেরকম কোনো ব্যবহার দেখান নি। যদি তিনি মনে করতেন যে আমি একজন সামান্য অপরিচিত স্ত্রীলোক মাত্র, যদি আমার মর্যাদা-বোধকে তিনি সম্মান দিতে জানতেন তবে নিশ্চয়ই সেই ঘটনা ঘটত না। আমার ব্যক্তিগত জীবনে উপদ্রব সৃষ্টি করার মতো অধিকার যিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন, আজ তাঁর ক্ষেত্রে গৌরব মর্যাদা ইত্যাদি না দেখিয়ে আমি সব কথা বলব. বলতে আমাকে হবেই। আর সেইজন্যই আজ সন্ধ্যাবেলা ওঁর সঙ্গে হয় সমুদ্রতীরে অথবা যে-কোনো হোটেলে যাওয়া আমার একান্ত দরকার।

গাড়ীতে ওঠা থেকে শুরু করে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা কেউ একটা কথাও বলি নি— না উনি, না আমি। যে পথে উনি গাড়ী চালিয়ে নিচ্ছেন, সেই পথের দিকে তাকিয়ে মনে হল, উনি সোজা আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবেন। আজ বুঝি লোকটার স্পেশাল কোনো প্রোগ্রাম আছে। আজকের সাজগোজটাও একটু জমকালো ধরনের। এবং "পবিত্র জলপান"টাও বাইরে কোথাও হবে বলে মনে হয়। আমি এই শখের ব্যাপারটা 'স্পয়েল' করে দেব? কেন দেব না? আমার গোটা লাইফটাকেই যিনি স্পয়েল করে দিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে বেশি সৌজন্য প্রদর্শনের কোনো মানে হয় না। হোয়াই নট আই স্পয়েল হিজ ইভনিং? আমি নষ্ট করব। আজ ওর সন্ধ্যাবেলাটা আমি নষ্ট করব—। কেন নষ্ট করব না?

আপার-ট্রাঙ্ক রোডে গাড়ী মোড় ঘুরতেই আমি ওকে বললাম: 'আমার এখন ভারি কফি খেতে ইচ্ছে করছে।' কিছুই বুঝতে না পেরে উনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। কারণ, আমাদের কফি খাওয়ার অর্থ শুধু কফি খাওয়া নয়। এই সামান্য ব্যাপারও একটা অনুষ্ঠানবিশেষ হয়ে ওঠে। প্রথমে ঐ গাছতলায় গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে হোটেলের পরিচারককে ডাকা, তারপরে সেই পরিচারকের আবির্ভাব এবং জিজ্ঞাসা 'কী দেবো বলুন'—এতেই তো মিনিট-

দশেকের মতো লেগে যায়। অতঃপর সেই ছোকরার খাবার নিয়ে আসা, আমাদের আহার সমাধা, বিল পে করা ইত্যাদিতে লেগে যায় এক ঘণ্টা। যারা খুব ব্যস্ত লোক, তারা এখানে কফি খেতে আসে না। আজ উনিও খুব ব্যস্ত কারণ ওকে যে ক্লাবে যেতে হবে।

'কোথাও গিয়ে কিছু খেলে হয় না? আপনাকে আমার কিছু কথা বলার আছে। আর ইউ ইন এ হারি?'

গাড়ী এসে দাঁড়াল। আমি যে এইভাবে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সেই অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ভাবটুকু ওঁর মুখে ফুটে উঠেছে। হঠাৎ উনি চটপট গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। এর থেকে বোঝা গেল—আমার অনুরোধ রাখতে গিয়ে ওর যে-কোনো কাজের ক্ষতি হলেও আপত্তি নেই, বরং আমার ইচ্ছা চরিতার্থ করবার জন্য খুবই আগ্রহশীল উনি।

'আই অ্যাম সরি! বাড়ীতে কফি, টিফিন কিছুই খাও নি? খুব খিদে পেয়েছে না? তাই মুখখানা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে। হোয়াট অ্যান ইডিয়ট আই অ্যাম!' এইভাবে আমি ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছি ভেবে তিনি খুবই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন।

'নো, নো! সে রকম কিছু নয়।' আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম— 'আপনার সঙ্গে কিছু কথার দরকার ছিল বলেই বলেছি, নইলে খিদে আমার এমন কিছু নেই।' কিন্তু আমার কথা কানেই তুললেন না তিনি।

'কোথায় যাব বলো তো। ড্রাইভ ইন্? গাড়ীতে বসে খেতে হলে তো ওখানেই যেতে হয়। নয়তো অন্য কোথাও যেতে পারি।'

'ড্রাইভ-ইন-এ চলুন যাওয়া যাক।'

গাড়ী ছুটছে। আমি হোটেলের কথা বলতেই উনি যেন ওঁর সমস্ত প্রোগ্রামের কথা ভুলে-টুলে গেছেন। আমার উপর ওঁর শ্রদ্ধা আছে বলতে হবে। এরপরে যখনই বলব— এবারে আমার বাড়ী যাওয়া দরকার, উনি তখনই আমাকে আমার বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে আসবেন। আমার জন্য যদি ওঁর সমস্ত প্রোগ্রামও নষ্ট হয়ে যায় তবু উনি বিশেষ কিছু মনে করবেন না, আমার মন এটুকু বুঝে নিয়েছে। লোকটা বেশ নিরীহ বলতে হবে। পদ্মা যদিও খুব চতুর চালাক রমণী, তবু কেন যে সে এই নিরীহ স্বামীটাকে তার বশে রাখতে পারে নি জানি না। একটা লাইন টেনে যদি বলা যায়, আপনি এই লাইন পার হবেন না, আমার বিশ্বাস উনি সেকথা মেনে চলবেন। যদি তিনি লাইন পার হয়েও যান, তবে গণ্ডী লঙ্ঘনের জন্যই লঙ্ঘন করবেন তা আমার মনে হয় না। একবারের নিয়ম-ভঙ্গকে বড় করে না দেখে আবার তাঁকে লাইনের মধ্যে নিয়ে এলে তিনি কখনও আর নিয়ম নিষেধ অগ্রাহ্য করবেন না। কিন্তু পদ্মা বললে তিনি মানতেন কিনা সন্দেহ! কেন? এরকম কেন হবে? মঞ্জুর কাছেও যেটুকু নতি স্বীকার করেন,

পদ্মার কাছে তা করেন না। কিসের জন্য করেন না? মঞ্জু যখন বলে— 'বাবা তুমি যদি আরও খাও, তবে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না', তখন তিনি 'ঠিক আছে' বলে মঞ্জুর কথা মেনে নেন।

মঞ্জুরও তার বাবার ওপর খুব স্নেহ। আমাকে তিনি কলুষিত করেছেন বটে, তবু তিনি আমার (মামার কথামতো) স্বামী, সেই হিসেবে একটা শ্রদ্ধা আছে তাঁর ওপর। আবার তিনিও স্নেহমমতাশূন্য নন। কন্যারূপে মঞ্জুর প্রতি টান থাকা তো স্বাভাবিক। আমার প্রতিও স্ত্রী-হিসেবে একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে তাঁর। এটা কি শুধুই শ্রদ্ধা? না, তারও বেশি কিছু।

ড্রাইভ-ইন রেস্টোরেন্ট-এর কম্পাউণ্ডের মধ্যে গাড়ী এসে গেল। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম: 'আজকে আপনার অন্য কোনো প্রোগ্রাম আছে বলে মনে হচ্ছে। আমি কি আপনার সময় নষ্ট করছি?'

'উঁ' বলে আমার দিকে তাকালেন। মনের মধ্যে কিসের একটা চিন্তা যেন। কী মনে করে একটা অর্থহীন হাসি হাসলেন। গাড়ীটা এনে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে বললেন: 'আমার প্রোগ্রাম যত দেরি করে হবে, ততই ভালো জমবে। নাউ ইট ইজ টু আর্লি।'

এমন সময়ে সেই ওয়েটার এসে হাজির। উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন— 'কী খাবে?'

'আপনার ইচ্ছামতো যা হোক কিছু অর্ডার করে দিন।'

'সুইট?'

'তাই হোক।'

'কী হে, কী মিষ্টি আছে?' এইটুকু জিজ্ঞেস করে কিছু একটা বলে দিলে লোকটা চলে গেল।

আমি যে কথা ওর কাছে বলতে চাই, এখনই তা আরম্ভ করা দরকার। কী ভাবে যে আরম্ভ করব কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, ওই সব কথা (যা আমি ভেবে রেখেছি) ওর কাছে আমি বলব নাকি? ধুর...ধুর তাই কি হয়?

এতক্ষণে উনি মনে করিয়ে দিলেন— 'তুমি যেন কী একটা কথা আমাকে বলবে বলেছিলে, কী বিষয়?' আমি বোকা বনে গেলাম। মুখখানা একটু হাসবার মতো করলাম। ওর মুখে আমার সেই হাসি প্রতিফলিত হল।

'বিশেষ কিছু নয়'— এইভাবে শুরু করলাম। আহা, কী একটা বোকার মতো কথা বলার কিছু খুঁজে না পেয়ে তাকিয়ে আছি।

উনি তখন হাসতে হাসতে বললেন: 'আমাদের মঞ্জুর সঙ্গে মিশেমিশে তুমিও দেখছি তার মতো হলে। যে-কোনো একটা বিষয় আরম্ভ করা দরকার। তারপর 'কিছু নয়' বলে এড়িয়ে যাওয়া। ইউ নো— সী ট্রিট্স্ মি লাইক এ চাইল্ড! হ্যাঁ, আমাকে ও শিশুর মতো মনে করে, বাবার মতো নয়। আমাকে ভাবে

আমি যেন ওর ছোটো ভাই। 'এটা কোরো না, ওটা কোরো না, এখানে যেয়ো না, ওখানে যেয়ো না, এইভাবের কত অর্ডার ও অ্যাডভাইস। তুমিও সেই রকম কিছু-একটা বলতে আরম্ভ করেছ। থামলে কেন? বলো, বলো। এখন তুমিও আমার কাছে মেয়েরই মতো। ইয়েস্! মঞ্জুর মতোই তুমি আমার কাছে এখন।'

'আচ্ছা, এভাবে উনি কথা বলছেন কেন? আমার চোখদুটো ভিজে আসছে। আমার বাবাকে যে দেখেছি তা আমার মনে পড়ে না। ওঁকে দেখলে আমায় কেমন যেন সেই অদেখা পিতার স্নেহের মতো মনে হয়। ওঁর পাকা চুল, নিরীহ স্বভাব। হঠাৎ যেন অনেকগুণ বেড়ে গিয়ে একটা পরিণত মনের আভাস পাওয়া যায়। এই হলেন উনি। পরমুহূর্তেই আইসক্রীম কিনে উনি চুষতে থাকবেন। যে কথা বলতে এসেছি তাই বললাম— 'বিশেষ কিছুই নয়। কাল হঠাৎ একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে অন্য লোকের মনে অবশ্যই সন্দেহ জেগে থাকবে। আমাদের উচিত নয় সেই সন্দেহের অবকাশ রাখা।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'দাঁড়ান একটু। এই তো এখন বলতে আরম্ভ করেছি'— এই বলে এক মিনিট টাইম নিলাম। সেই সময়ের মধ্যে ওকে একটু খুঁটিয়ে দেখলাম। ওঁর এবং আমার মধ্যেকার সম্পর্কটা একটা গভীরভাবে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলাম। ওর কাছে দরকার হলে সব-কিছুই বলব আমি। অন্যান্য পুরুষ মানুষের মতো উনি আমার কাছে একজন পুরুষ মাত্র হবেন না। ওকে-আমাকে যুক্ত করে সকলেই নানা কথা বলাবলি করে। সে-সব কথা উনি জানেন কিনা জানি না। যদি জানেন তবে তার জন্য দুঃখিত অথবা ভীত হয়ে বারবার উনি ভাবছেন যে আমার জীবনটা নষ্ট করার কারণ না হলেই ভালো হ'ত। কিন্তু এখন কি আমাকে উনি উপেক্ষা করতে পারেন? নিশ্চয়ই নয়। এ ধরনের গভীর চিন্তাভাবনা করার মতো ক্ষমতা ওঁর নেই। তবু ওঁর দুঃখবোধ আছে। দরকার হলে যে-কোনো লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতেও জানেন। যদি এখন আমি ওঁর কাছে বলতে লজ্জা পাই বা সঙ্কোচ বোধ করি, তবে সেটা একটা কলঙ্কজনক ব্যাপার হবে। তাই এখন আমি বলবই ওঁর কাছে। এই যে আমি বলছি: 'আমাদের দুজনের সম্পর্কে সকলে কী বলাবলি করে আপনি জানেন কি?' এরকম একটা বিষয়ও যে ওকে জিজ্ঞেস করব একথা উনি ভাবতে পেরেছেন বলে মনে হল না। জিজ্ঞেস করলেন— 'সকলে মানে কে কে?'

'ধরুন— ঐ যে লোকটা এগিয়ে আসছে, আপনার আমার জন্য ট্রে-তে করে সুইট ও ঝাল হাতে নিয়ে, ওই পরিচারক; তারপরে ধরুন, ঐ রিটায়ার্ড জেন্টলম্যান, যিনি পাশের গাড়ীতে বসে আমাদের দুজনের দিকে এক নাগাড়ে চেয়ে আছেন, তারপরে ধরুন আপনি যখন রোজ রোজ অফিসে আমাকে পৌঁছে দিয়ে

আসেন, তখন যারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আমাদের সেই অফিসের কর্মচারীদল ; অতদূরে যেতে হবে কেন, রোজ রাত দশটার সময়ে যিনি দেখেন আপনি আমাকে বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে আসেন, আমার সেই মা ; গাড়ীতে মদের বোতল নিয়ে বাড়ী থেকে এই বলে বেরোন যে, গঙ্গাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসছি, কিন্তু ফেরেন পরদিন সকালে— এ ব্যপ্যারে যারা কষ্ট পায় আপনার সেই স্ত্রী পদ্মা বা কন্যা মঞ্জু···আর কত বলব ?'

লিখে রাখা তালিকা থেকে মুখস্থ ক'রে বলার মতো আমি যখন একে একে বলে যাচ্ছিলাম, সেই সময়ে পরিচারক আসছে দেখে আমি চুপ করে গেলাম। সেই পরিচারকটি চেঁচিয়ে বলল—'এই ছোঁড়া, ট্রে' সঙ্গে সঙ্গে খাকি সার্ট পরা এক ছোকরা দৌড়ে এসে গাড়ীর দরজায় 'ট্রে'-টা ঢুকিয়ে দিল। সেই পরিচারক সারি সারি সাজানো জিনিস হাতে নিয়ে একবার মাত্র জিজ্ঞেস করল—'কফি চাই স্যর?' উনি মাথা নেড়ে 'না' করে দিতেই লোকটি চলে গেল।

উনি মিষ্টি তুলে আমার হাতে দিলেন, নিজেও একটা তুলে নিয়ে কিছু-একটা ভাবতে ভাবতে মুখে পুরলেন। তারপরে আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন— 'ওরা বলে বলুক, আই ডোণ্ট কেয়ার।'

'আমরা কেয়ার না করেও থাকতে পারি। কিন্তু আমি বলছি কি, ওরা কে কী বলছে সেটা আমাদের জানা উচিত। জেনেশুনে যদি কেয়ার না করতে চান, না করুন। কিন্তু না জেনে কেয়ার করি নে বললে কেমন হবে?'

আমার দিকে চেয়ে বললেন—'কী, কী বলে লোকে?' আমিও তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম? কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললাম :. 'আপনি নাকি আমাকে রক্ষিতা হিসেবে রেখেছেন।'

'স্টুপিড! কে বলেছে একথা? বলে থাকলে জুতোপেটা করা উচিত।'

'আমার মা-ই তো এই কথা ভাবে।'

'সরি, গঙ্গা' বলে মাথা চুলকোতে লাগলেন। 'আই উইল এক্সপ্লেইন হার এভরিথিং। কবে কী বলেছেন? আমি গিয়ে তোমার মায়ের কাছে কথা বললে সব ঠিক হয়ে যাবে। ডোণ্ট ওরি।' ওঁকে দেখলে সত্যিই আমার কষ্ট হয়। খানিক পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম— "আপনার স্ত্রী পদ্মা কি কিছু না ভেবে পারেন?' আমার এই কথাগুলিকে উনি যেন হাওয়ার মধ্যে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট মুখ থেকে একটা ফুৎকার দিয়ে বললেন : 'ফুঃ'।

'মঞ্জু?'

'এই ভাখো! সী ইজ জাস্ট এ চাইল্ড!'

মনে মনে ভাবলাম— আপনার চেয়েও কি মঞ্জু শিশু? ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে আমি হেসে হেসে ইংরেজীতে বললাম— 'সো— আপনার দিক থেকে এ সম্পর্কে সমস্ত প্রবলেম সল্ভ্‌ড হয়ে গেছে। নয় কি? সো সিম্প্‌ল?

আপনি মনে করেন আমার মায়ের সঙ্গে আপনি কথা বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। পদ্মা সম্পর্কে তো 'ফুঃ'। আর, মঞ্জু তো ছেলেমানুষ। কেবল আমরা দুজনই যা একটু বুদ্ধিমান, কী বলেন?'

উনিও ইংরেজীতে উত্তর দিলেন—'আই ডোণ্ট নো। আমরা বুদ্ধিমান কি বোকা কিছুই জানি না। আমাদের যে-বিষয়ে কিছুই করার নেই, সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো কি বুদ্ধিমানের পরিচয়? আমার তো মনে হয় না। আমার কথা যদি বলো, আমি যে-সমস্ত কাজ করি তার জন্য আমি দায়ী নই। অত সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণের শক্তি আমার নেই। আই অ্যাম নট সো স্ট্রং। আমি আমার লিমিটেশন্‌স সম্পর্কে সচেতন। এই মূর্খতায়— না এই বুদ্ধিমানীতে আমার খুব সুবিধে। আমার বিষয়ে কে কী বলল না বলল— আর, কী আছেই বা নতুন ক'রে বলবার? বাট আই অ্যাম ওরিড অ্যাবাউট ইউ। তোমার সুনাম যাতে নষ্ট না হয় সেটা দেখতে হবে। মানুষের সুনাম নষ্ট হতে পারে, কিন্তু অকারণে নষ্ট হওয়া উচিত নয়। আই মীন তোমার সুনাম যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। ইট ইজ নট টু লেইট— গুজবে তোমার কিছুই নষ্ট হয় নি। তোমার জন্য একটি ভালো ছেলে দেখছি আমি। তুমি বিয়ে করো। সব ঠিক হয়ে যাবে— এভরিথিং উইল বি অল রাইট।'

আচ্ছা উনি মাঝে মাঝেই আমার বিয়ের কথাটা কেন তোলেন? ওঁর মনে এই বিয়ে ব্যাপারটা কি এতই সহজে করণীয় বলে মনে হয়? উনি কী ভাবছেন জানি না, কেই বা বর তাও তো জানি না। একটু জিজ্ঞেস করেই দেখা যাক-না! আমি বললাম, 'আপনি আমার বিয়ের কথা বলছেন বটে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। প্রথম বিষয়— বিয়ে করার ব্যাপারে আমি আদৌ সম্মত আছি কিনা। দ্বিতীয়ত, আমার বিষয়ে সকল ব্যাপার জানার পরেও কেউ আমাকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবে কিনা। এই সমস্ত গোপন রেখে বিয়েটা করলে তা কি ভালো হবে?'

'নো নো! দ্যাট ইজ নট রাইট। ওটা খুবই ভুল হবে। যদিও অনেক ছেলে আছে, আই ওয়াণ্ট ইওর কনসেণ্ট। তুমি এখন রাজী বললেই হল।'

মনে মনে বুঝলাম এটা খুব বিপজ্জনক পন্থা। এ নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া না করাই ভালো। একে অঙ্কুরেই শেষ করে দিতে হয়। আমি বেশ দৃঢ় স্বরেই বললাম, 'ও-সব ছাড়ুন। আমি আজ আপনাকে যে কথাটা বলতে চাই তা হ'ল এই: সংসারে আমাদের সম্পর্কে কে কী ভাবছে না-ভাবছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার মা অথবা আমার অফিসের সহকর্মীরা আমাদের দুজনের সম্পর্কে বলাবলি করলেও ও-সব আমার কাছে 'ফুঃ'; কিন্তু মঞ্জুর কথাটা ভাবতে হবে। সে যেন আর-সকলের মতো আমাদের সম্পর্কে না ভাবে। আমি এটা বিশ্বাস করি তার মনে এখনও কোনো খারাপ ধারণা নেই। কিন্তু হতে কতক্ষণ?

সেখানেই আমার ভয়। সময় হলে তাকে আমি আমার সম্পর্কে সমস্ত সত্য কথা বলব। কিন্তু সে-রকম সময় আসার আগেই তার মনটা যদি বিষিয়ে যায়, তখন বিষ দূর করে তার মনকে সুস্থ করতে গেলে হয়তো আমার অনেক সত্যই মিথ্যা বলে মনে হবে তার। সেইখানেই আমার ভয়। মঞ্জু যদি আমাকে শ্রদ্ধা করে তবেই হ'ল। সেইজন্যই আমি আপনার সাহায্য চাইছি।'

আমার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে উনি বললেন : 'ও-বিষয়ে আমি কী করতে পারি বলো।' কৈকেয়ী যেমন দশরথের কাছে বর প্রার্থনা করেছিল, আমিও তেমনি ওঁর কাছে সংক্ষেপে কিছু প্রার্থনা করব ভাবছি। আমি বললাম : 'আমাকে নিয়ে আপনি যখন বাড়ী থেকে বেরোন, তখন আমাকে আমার বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আপনি সোজা আপনাদের বাড়ীতে ফিরে যাবেন। তারপরে আপনার বাড়ী থেকে আপনি যেখানে খুশী যান। এটা খুব দরকারী কথা মনে রাখবেন।'

16

মাকে রাত দশটা পর্যন্ত বসিয়ে না রেখে তাড়াতাড়ি আমার বাড়ী ফেরা উচিত বলে কতদিন ভেবেছি। কিন্তু আজও রাত দশটা হয়ে গেল। ওঁর আর কী? রাত যতই বেশি হবে, ওঁর প্রোগ্রাম ততই ভালো জমবে। আমি যা জিজ্ঞেস করেছি তার তো উত্তর একরকম করে দিলেন। তাছাড়া, আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে ওঁর মনেই পড়ল না যে দেরি হয়ে যাচ্ছে কিংবা ওঁর কোনো পূর্বনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম আছে। কিছুক্ষণ আগে আমিই ওঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখনও তিনি নির্বিকার চিত্তে বললেন— 'দেরী হয়েছে তাতে কী? আমি তোমাকে তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসব।' আমি জোর ক'রে ট্যাক্সিতে উঠে ওঁকে বিদায় দিলাম।

ট্যাক্সি যখন আমাদের সদর দরজায় এসে দাঁড়াল, তখন ঠিক রাত দশটা। ট্যাক্সি বিদায় করে ভিতরে এলাম। অন্য দিনের মতো আজকে আর সদরে মাকে বসা দেখলাম না। দরজাটা খোলা! ওহো! তা হ'লে বেঙ্গুমামা এসেছেন। ঐ যে ঘরের মধ্যে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট মামা আমার দিকে তাকাল। আমিও চোখ খুলে তাকাতেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। হয়তো ভেবেছে তার তাকানোটা আমি লক্ষ্য কার নি।

মামা বরাবর যেমন আসে তেমনই কি এসেছে? না কি. মা চিঠি লিখে আসতে বলেছে? যেভাবেই আসুক-না কেন, আমার তাতে কী? তবে আমার ভারী দুঃখ হল যে আজকের দিনেই আমি ওঁর গাড়ীর বদলে ট্যাক্সি ক'রে

এসেছি। অন্যান্য দিন যা হয়, আজ আর তা হল না। আমি ফিরে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মামা যতই ক্রোধের সঙ্গে আমার সম্পর্কে মায়ের কাছে কথা বলুক-না-কেন, আমাকে দেখা মাত্রই সেই সমস্ত ক্রোধ গোপন ক'রে প্রফুল্ল সহাস্য মুখে বলে ওঠে— 'কে গঙ্গা নাকি? এসো, এসো, এসো।' যেন হামাগুড়ি দিয়ে চলা শিশুকে কোলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। আজ কিন্তু অভ্যর্থনার আভাস মাত্র পাওয়া গেল না।

আমার দিকে একবার ফিরেও চেয়ে দেখল না! যেন মনোযোগ দিয়ে কড়িকাঠগুলো দেখছে এমনিভাবেই গুম হয়ে বসে আছে। আর সামনেই মা মাথায় ঘোমটা-মুখসুদ্ধ ঢেকে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মুখ সম্পূর্ণ দেখা যায় না বলে মা যে কী মনে ক'রে অমন ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে বুঝতে পারলাম না। ঠিক আছে, এরা কী না কী ভাবছে তাতে আমার কী? আমাকে এখন এই সমস্ত ব্যাপারে কোনো ভাবনাচিন্তার পরিচয় না দিয়েই চলতে হবে।

মামাকে জিজ্ঞেস করলাম— 'কখন এলেন মামা?'

সঙ্গে সঙ্গে কথার উত্তর না দিয়ে মামা একবার আমার দিকে তাকাল। তার মুখ যেন ক্রোধে ফেটে পড়ছে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই উগ্রভাব সামলে নিয়ে একটি মাত্র শব্দে উত্তর দিয়ে দিল— 'দুপুর বেলা।' এরপরে যে কী জিজ্ঞেস করতে হবে বুদ্ধিতে কুলোল না। চুপচাপ আমি আমার ঘরে চলে গেলাম। মা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঘোমটা-দেওয়া মুখ-ঢাকা মায়ের মুখের দিকে তাকালে কেমন যেন ভয় লাগে। কিসের মতো লাগে জানি না। তবে মানুষের মুখের মতো নয়। আমি ঘরে গিয়ে কপাট বন্ধ করে দিলাম।

এখন আমার ঘরে আমি একলা— মনের পক্ষে বেশ তৃপ্তিকর। ড্রেস চেঞ্জ করার পরে দরজা খুলে বাইরে আসতে হবে, খেতে হবে, মা ও মামার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। ওদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। এরা একমাস ধরে যে-সব যুক্তি পরামর্শ এঁটেছে, সেগুলি শুনতে হবে। এদের উপদেশ সহ্য করতে হবে। মামা যে-সব সাহায্য করেছিল, তার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে গদগদ হতে হবে— এই সমস্ত ভাবতে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে আসতে কেমন ভয়-ভয় করছে।

এখন আমার মনে হল না যে শাড়ীটা বদলাতে হবে, মনে হল না যে বাথরুমে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে হবে, মনে হল না যে আমার ক্ষিদে পেয়েছে। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। যদি এইভাবেই ঘরের মধ্যে একটু নিরালায় থাকতে পারি, তবে বেশ খুশী মনেই ভোর হওয়া পর্যন্ত এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব। সামনে ঐ আলমারির আয়নায় আমিই আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।

আমার এই সমস্ত সাজ-পোশাক দেখে মামা কী ভাবছে? যখন সে আমার দিকে তাকালো, তখন সে আমার জামাকাপড়ের পারিপাট্য লক্ষ্য করেছে কিনা জানি না। মনে হয় এসব তার কাছে নতুন কিছু নয়, আগেও সে দেখেছে। মা কি শুধু তাকে আসতেই লিখেছিল? আমার তো মনে হয় আমার বিষয়ে সমস্ত কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল, কিছুই বাদ দেয় নি। কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ে মামা যে কোন্ লাইন ধরে এগোবে একথা আমি ছাড়া আর কেউ আগেভাগে বলতে পারবে না। দেখি মামা কী বলে। সে হয়তো ভাবছে যেমন করে হোক আমাকে তার মুঠোর মধ্যে ধরে রাখবে।

মিনিট পাঁচেক হয়ে গেল আমি আমার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছি। সেই ভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। এক এক করে সমস্ত ব্যাপারে কী না সাহসের পরিচয় দিয়েছি। অথচ মনের মধ্যে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছি! কাল সকালে অফিসের সময়ে উনি আমাদের বাড়ীতে আসবেন। তখন মামা তো তাঁকে দেখে ফেলবে। কিছু কথাবার্তা বলবে কি? না গুম হয়ে বসে থাকবে? কে জানে? মা হয়তো বলবে এই লোকটাই সেই অপরাধী শয়তান। অথবা মা এমন কথাও বলতে পারে যে সেই লোকটার নাম ক'রে আমি যে-কোনো পুরুষকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। কী বলবে কে জানে?

এভাবে দরজা বন্ধ ক'রে কতক্ষণ আর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? মা হয়তো ভাবছে কোনো-কিছুর জন্য ভয় পেয়ে আমি এসে ঘরের মধ্যে লুকিয়েছি। মামা যদি ভাবে ভাবুক-না, কী আসে যায় তাতে? আমার মাও হয়তো আগের মতোই ভাবছে। ঐ সমস্ত কথা ভেবেই তো মা তার দাদাকে চিঠি দিয়েছে। যেন মামা এসেই একটা খড়্গ তুলে ঘ্যাঁচ ক'রে আমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলবে। মা কি সেইরকম ভেবেছিল নাকি? মাথায় ঘোমটা দিয়ে মুখটা ঢেকে মা এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন তার দৃষ্টি এই কথাই বলল আমাকে—"দাদা এসে গেছে— তার কাছে সব কথা বলো।"

হ্যাঁ বলব। কোন্ কথা বলি নি মামার কাছে? এ কথাও বলব। যা করছি কিছুই অন্যায় নয়। অন্যায় কি ন্যায় তা নিয়েও আমাকে কথা বলতে হবে। ঠিক আছে। আই গুড ফেস হিম।

তাড়াতাড়ি ক'রে শাড়ীটা বদলে নিয়ে ধড়াস করে দরজাটা খুলে ফেলে বড়ো ঘরে এসে দাঁড়ালাম। মা আমার খাবার সাজিয়ে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালো।

মামাকে একবার সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'আপনার খাওয়া হয়েছে, মামা?'

'ও, ইয়েস্! তুমি গিয়ে খাও। সোয়া দশটা বাজতে চলল।' খুব নির্বিকার ও সাধারণ ভাবেই মামা আমার সঙ্গে কথা বলল। ভাবখানা এই :

"আসুক-না খেয়ে দেয়ে, তারপরে যা বলার বলব।" বোধ করি মনে মনে সমস্ত অভিযোগ পয়েন্ট বাই পয়েন্ট গুছিয়ে রাখছে। কী ক'রে আমাকে বাগে আনবে সেইজন্যই যেন ওৎ পেতে বসে আছে। হঠাৎ একবার ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর তাতেই আমি কুপোকাত হয়ে পডব— এই বুঝি মায়ের ধারণা? হায় মা! তুমি কি আর জানো যে আমি মামার কাছে যেমন শিখেছি, তেমনি শিখিয়েছি?

নীরবে মাথা নীচু ক'রে খেতে বসলাম। সন্ধ্যাবেলায় সেই রেস্টোরেণ্টে যা খেয়েছি, এখনও তা তেমনিভাবে পেটের মধ্যে রয়েছে! মা যে কী বাজে তেল দিয়ে রান্নাবান্না করে জানি না। ভাগ্য ভালো। আগের মতো মা আজ আর আমার কাছে বসে 'এটা একটু খেয়ে ছাখ, ওটা একটু খেয়ে ছাখ' বলে স্নেহের দাবি জানাচ্ছে না। আমি পাত্র ভরে ঘোল ঢালাঢালি ক'রে খেয়ে নিয়ে উঠে পড়লাম। মা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছে— 'মেয়েটা আজকে যেখানে খুশী গিয়ে যা-তা খেয়ে পেট ভরিয়ে এসেছে।'

বড় ঘরে মামার বিছানাটা বরাবর আমাকেই পেতে দিতে হয়। আজও দিতে হবে। 'রাত হয়ে গেছে মামা। আপনার বেড-টা এনে পেতে দিই?' বলে তার কাছে জিজ্ঞেস ক'রে আমার ঘরে ভাঁজ করে রাখা তার বিছানাটা আনতে গেলাম। মামাও উত্তর দিল— 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রাত হয়ে গেছে।' আমি তার বিছানাটা তুলে এনে ধপ ক'রে মেজেয় ফেলে ঝেড়ে পুঁছে পেতে দিলাম। মামার বিছানা রেডি, আমার কর্তব্যও শেষ হল। এবারে আমার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেব। তারপরে কাল সকাল পর্যন্ত আর কোনো চিন্তা নেই। বাঘ যেমন ক'রে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে আড়াল থেকে দ্বিগুণ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মামাও তেমনি নিঃশব্দে বসে আছে দেখে তার আক্রমণটা খুব জোরদার হবে বলে মনে হল।

এমন সময়ে মামার বিছানা থেকে একটা আরশুলা ছুটে গেল। অনেক দিন বিছানাটা নাড়াচাড়া হয় নি, তাই। আরশুলা দেখেই আমি ঘৃণায় সরে দাঁড়ালাম। মামা তখন ইজিচেয়ার ছেড়ে বিছানায় এল। আমাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে-বলল, 'বোসো এখানে', তারপরে পদ্মাসনে বসে চোখ বুজে মিনিটখানেক ধ্যানমগ্ন হয়ে রইল। মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'শম্ভু মহাদেব!' ধ্যান শেষ ক'রে দেয়ালে হেলান দিয়ে একটু আরাম ক'রে বসল। বাঁ পা ভাঁজ ক'রে তেলমালিশ করার মতো হাঁটুতে হাত বুলোতে লাগল।

'পা-টা একটু ধর না'— এই বলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ঠ্যাংটা। আমিও মামার কাছে খালি মেজের উপর বসে মামার পায়ে চাপ দিতে থাকলাম। প্রত্যেকটি চাপের সঙ্গে সঙ্গে 'অরে ব্বাবা' 'অরেম্ মা' বলে দীর্ঘশ্বাস-সহ আর্তধ্বনি করতে লাগল।

মা রান্নাঘরে শুয়ে পড়েছে, কিন্তু ঘুমোয় নি। ঘুমোতে পারে না। কারণ মামা কিছুক্ষণ পরেই আসামীকে জেরা করতে আরম্ভ করবে বলে মা অপেক্ষা করে

আছে।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ 'অয়েব্বাবা' 'অরেম্মা' ধ্বনির পরে মামা তার ভুরু দুটোকে ডলতে ডলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপরে চোখ খুলে একবার আমার দিকে তাকিয়ে কী জানি কী ভেবে হেসে উঠল। আমারও ভীষণ হাসি পেয়েছিল, কিন্তু হাসিটা চেপে গেলাম।

'হ্যাঁ, তোমার সব কাজের গতিকে আমাদের মাথা ধুলোয় লোটাচ্ছে। কী ব্যাপার বলো?' মামার এই প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে খুব দেরি হল না আমার। উত্তর দেবার জন্য আমার মুখ খোলার আগেই সে আবার বলে উঠল : 'তুমি কি এখন ছেলেমানুষ? তুমি নিজের দায়িত্বে যে-কোনো কাজই দরকার হলে করতে পারো। কে তোমাকে বাধা দেবে? ধর্ম, ন্যায়, সদাচার— প্রভৃতি বললে তা শোনার মতো জ্ঞান তোমার হয়েছে বলে মনে করি। যদি বলো 'ওসব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই', ঠিক আছে, তুমি যেভাবে খুশী চলাফেরা করো। কে তোমার কী করতে পারে? সেই বারো বছর আগে তোমার দাদা গণেশ তোমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন তোমার মা কি তোমায় তাড়িয়ে দিতে পারে? তোমার কাজকর্ম চলাফেরা যদি তার সহ্য না হয়, তবে সে তোমায় ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। তোমার মনে ভালো বুঝলে যা খুশী করো। মাঝখানে আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? তুমি নাকি তোমার মাকে বলেছ যে আমার কথামতোই তুমি সেই লোকটিকে খুঁজেপেতে নিয়ে এসেছ। আমি বলেছি একথা? তোমার কাছে বলেছি? তোমার কাছে আমি কী বলেছিলাম? বলেছিলাম যে, সেই লোকটিকে খুঁজে বার করতে পারলেও সে তোমাকে বিশ্বাস করবে না। তোমার সম্পর্কে তার কোনো উচ্চ ধারণা হতেই পারে না। আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে তাকে আবিষ্কার ক'রে আহ্বান ক'রে এনে নৃত্য করো?' এই কথা বলতে বলতে মামা আমাকে প্রহার করবার মতো ভঙ্গী করে পাখার ডাঁটটা সামনের দিকে তুলে ধরল। আমিও ছোটো শিশুর মতো মাথা নীচু ক'রে উত্তর দিলাম : 'সেদিন আপনিই তো মায়ের কাছে বলছিলেন— ওর যদি বুদ্ধি থাকে, তাকে খুঁজেপেতে ধরে নিয়ে এসে…'

মামা মাঝখানেই বাধা দিয়ে বলে উঠল : 'হুঁসিয়ার গঙ্গা, খুব হুঁসিয়ার মতো থাকবি। খুব ভালো ভাবে থাকবি।' আমি আমার কথা বন্ধ করে দিলাম। মামাই বলে চলল— 'আমি তোর কাছে কী বলেছি? তোর মা আমার কাছে কী সব বলছিল। আমি তার উত্তরে ওকে কিছু বলেছিলাম। তুমি সেই কথা আড়ি পেতে শুনে এখন এসে বলছ কিনা আমার কথাই তোমার এই সব কাজের মূল কারণ। কৌশল দেখালে বটে। অন্য পাঁচজন লোক কী বলে জানো? কার-না-কার সঙ্গে তুমি নাকি ঘুরে বেড়াও। এ যে সেই লোক তুমি কী ক'রে প্রমাণ করবে? অন্য লোক কী ক'রে বিশ্বাস করবে? কী কর্মফল?' এই বলে মামা

পাখাটা দিয়ে নিজের কপালে একটা বাড়ি দিল।

আমি তো চুপ করেই ছিলাম। মামাও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। কোথাও রেডিও-তে জাতীয় সংগীত শোনা যাচ্ছে। সংগীত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি মুখ খুললাম না। শেষ হতে-না-হতেই আমি ফট ক'রে জিজ্ঞেস করলাম : 'অন্য লোকের কাছে কেন আমি প্রমাণ করব? সেই লোকই যে এই লোক একথা অন্য লোক বিশ্বাস করলে আমার তাতে কী হবে?'

'অন্য লোক বলতে কি যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তাদের কথা বলছি?' এই বলে মামা একবার মাথাটা উঁচু করে রান্নাঘরের দিকটা দেখে নিয়ে খুব গুপ্ত কথা বলার মতো আমার কাছে এসে কানে কানে বলল : 'তোমার মা-ই তো বিশ্বাস করে না যে সে লোক আর এই লোক এক।' এই বলে একটা চোখ টিপল। আমার সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে এল। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি : 'আপনিই কেবল বিশ্বাস করেন না, কথাটা এই তো?' তারপরেই মনে হল কিসের জন্য এই জিজ্ঞাসা? মামা বিশ্বাস তো করেই না, ও সব নিয়ে তার কোনো উদ্বেগও নেই— এই হচ্ছে আসল কথা।

'তোমার মা চার পৃষ্ঠার একখানি চিঠি লিখেছে। তার খুব অপমান হয়েছে, মানসিক কষ্টও হয়েছে। লিখেছে 'তুমি এসে, দাদা, একটা উপায় ক'রে দাও।' কাল সকালেই সেই চিঠি তোমার হাতে দেব। তুমিই পড়ে দেখো। তোমার মায়ের অবস্থা বড়োই শোচনীয়।' এই কথা বলে আমার একটা হাত ধরে মামা তার অভ্যাসমতো আমার আঙুলগুলো মটকাতে লাগল। এবং আরও কাছে এগিয়ে এসে আমার গায়ে গা লাগিয়ে বসল। আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমার সমস্ত দেহটাকে এক্ষুনি গিলে ফেলবে। তার মনের মধ্যে কী পরিমাণ বদ্ বুদ্ধি খেলা করছে বুঝতে কষ্ট হল না। দেঁতো হাসি হেসে বলল : 'তুমি খুব বদলে গেছ। শরীরটা কত মোটা হয়ে গেছে।' এই বলে আমার হাতের উপর চাপ দিতে লাগল। কী ভেবে এই সমস্ত কথা বলছে বেশ বুঝতে পারছি। কানের কাছে মুখ এনে ইংরেজীতে চুপি চুপি বলল—'প্রিকশন্স্ নিয়েছে তো?'

'তার মানে?' প্রিকশন্স্ এগেন্সট হোয়াট্?'

আরেকবার চোখ টিপে বলল— 'এগেন্স্ট কনসেপশন্।' শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। পেটটা কেমন ঘুলিয়ে উঠল; মনে হল সদরে গিয়ে কাস দিয়ে থুথু ফেলে আসি। কিন্তু কিছুই করতে না পেরে মামার অশ্লীল কথাগুলো হজম করতে হল।

'নো'— বললাম বটে, কিন্তু আমার এই 'না' বলার যে কী অর্থ তা মামা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। মামা তখন আমার উরুতে চিমটি কাটছিল, আমি যে বলে উঠেছি 'নো' তা কি চিমটি কাটা রুখবার জন্য, না কন্‌সেপশন্ প্রিকশন্স্ ইত্যাদির জন্য তা বুঝতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে গেল। থাক্ বিমূঢ় হয়ে।

আমিও আর কথা বাড়ালাম না।

মামা আবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে লাগল— 'ডোণ্ট গেট ইন্‌টু ট্রাবল্‌স্‌'— আমি এ-কথারও কোনো উত্তর না দিয়ে তার হাতটাকে সরিয়ে দিয়ে বললাম : 'আমার ঘুম পাচ্ছে মামা। আপনি শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়ে গেল।' এই বলে আমি উঠে পড়লাম।

'একটু খাবার জল দিয়ে যাও না' এই বলে একবার উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল মামা। আমি ঘটিতে ক'রে জল ও গ্লাস এনে তার সামনে রেখে যখন মাথা তুলতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার হাত ধ'রে বলল : আই উড্‌ লাইক্‌ টু মীট্‌ দ্যাট্‌ জেণ্টল্‌ম্যান্‌।' বলে কী মামা ? সেই 'জেণ্টল্‌ম্যান্‌'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ?

মামা যে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চায় এতে কিন্তু খুব একটা আশ্চর্য হই নি আমি। কিন্তু মামার চোখে সেই লোকটি 'জেণ্টলম্যান্‌' ? আমার হাসি পেল। বস্তুত এই হল মামার কোয়ালিটি। কাছাকাছি কারও সঙ্গে দেখা হলেও, মামা তাকে খুব 'লজিকালি' অ্যাপ্রোচ করে। সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছিল, তখন সে এইভাবেই একটা লজিকাল অ্যাপ্রোচে আমাকে সাহায্য করে। এটা কিন্তু একটা সাধারণ কোয়ালিটি নয়। এত কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পর উনি যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন এই কথাটি জানামাত্রই মামা কিন্তু সাধারণ লোকের মতো ওর নিন্দা না ক'রে ওঁকে বরং জেণ্টলম্যান বলেছে। অযাচিতভাবে নিজেই ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। এই ধরনের কয়েকটি কোয়ালিটির জন্যই মামাকে আমি এখনও শ্রদ্ধা করি। তার কথার উত্তরে আমি বললাম : 'কাল সকালে আসবেন।'

'ও হ্যাঁ, রোজই যাতায়াত করে তোমার মা চিঠিতে লিখেছিল।'

আমি বড়ো ঘরের আলোটা নিভিয়ে নীল বাতিটা জেলে দিয়ে আমার ঘরে গিয়ে দরজায় ভালো করে খিলটা লাগিয়ে দিলাম।

ঘুম আসছে না। তবু আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মামার কাছে ঘুম পেয়েছে বলে এখন যদি ঘরের মধ্যে আলো জেলে রাখি, কাজটা কি ভালো হবে ?

অন্ধকারে সটান শুয়ে পড়লেও খোলা চোখ দুটো নিয়ে দিব্যি জেগে আছি। চোখের সামনে কেমন যেন একরকম মানসিক বিহ্বলতার ছায়া— কখনো ফুলকিরূপে, কখনো সলতেরূপে, উপরে নীচে উড়ে উড়ে ভেঙে যাওয়ার মতো তীরগুচ্ছরূপে সেই ছায়ার সঞ্চরণ। গাঢ় অন্ধকার এসে জমাট বেঁধে আমাকে চেপে ধরেছে। শ্বাস বুঝি রুদ্ধ হয়ে এল। এখন একবার আলোটা জ্বালতে পারলে ভালো হত মনে হয়। তবু আলো তো এখন জ্বালানো চলবে না। আচ্ছা তবে জানলাটাই খোলা রাখি।

উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। রাস্তা এবং রাস্তার

ওপাশের বাড়ীগুলি ঠিক ছবির মতো লাগছে।

আজ সন্ধ্যায় ওঁর সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছে সেগুলি একে একে মনে আসছে। কাছ থেকে দেখলে খুব কলঙ্কিত মানুষকেও কেবল কলঙ্কের চোখে দেখা ও ভাবা যে কত ভুল তা বোঝা যায়।

আজকে উনি নিজের বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। যত কথা বলেছেন, একটাই তার সার কথা : 'আমার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি অপারগ।' হাউ ডেঞ্জারাস্ ইট ইজ! যাদের সঙ্গে ওর মেলামেশা কেবল তাদের পক্ষেই নয়, উনি ওঁর নিজের কাছেই কী বিপজ্জনক!

17

আজ সন্ধ্যাবেলায় সেই রেস্টোরেন্টে এবং তারপরে বীচ-এ গাড়ীর মধ্যে বসে উনি আমার কাছে নিজের সম্পর্কে যত কথা বলেছেন সব এখন আমার একে একে মনে পড়ছে। নিজের কথা বলতে গিয়ে উনি ওঁর বাবার কথাও অনেক বলেছেন। বাবার ওপর গভীর স্নেহ লক্ষ্য করছি। যখন বাবার কথা বলছিলেন, তখন ওর মুখের দিকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। মাঝে মাঝে ওঁর চোখ দুটি চক্‌চক্ করছিল, তখনই বোধহয় ওর মনে পড়ছিল বাবাকে। সমস্ত পরিবেশকে যেন উনি ভুলে গিয়েছিলেন। এক সময়ে উনি বলতে লাগলেন :

'আমার মায়ের মুখখানা পর্যন্ত আমার মনে পড়ে না। দেন আই ওয়াজ টু ইয়ং। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা কিন্তু আর বিয়ে করলেন না। আমার জন্যই করেন নি। মাঝে মাঝেই কথাটা বলতেন তিনি। আমার কাছে কখনো বলেন নি। কেউ যদি তাঁর বিয়ের বিষয়ে কথা তুলত তিনি বলতেন : 'ওসব আবার কিসের জন্য বাপু? রাজার মতো একটি ছেলে দিয়ে গেছে! আমার তো এখন এর মুখের দিকে চেয়ে চেয়েই দিন কাটাতে হবে। আর-এক স্ত্রী গ্রহণ করলে সেও দুটি সন্তানের জন্ম দেবে। তখন এ পক্ষ ও পক্ষ মিলে 'এটা আমার, ওটা তোমার' এই বলে ঝগড়া করবে··· কেন আর এই ঝামেলা?' এখন ভাবতে গেলে বুঝতে পারি— আমার ওপর কতটা স্নেহ থাকলে আমারই জন্য দ্বিতীয় বার বিয়ে না করে তিনি জীবন কাটিয়ে গেছেন। লেখাপড়া তিনি তেমন জানতেন না কিন্তু খুব বিজনেস্ মাইণ্ডেড ছিলেন। একদিক থেকে দেখলে মাতৃহীন শিশুদের উপর ব্যবসায়ীদের অতখানি স্নেহ থাকা ঠিক নয়। একটা কথা বলব? আমি যে এভাবে নষ্ট হয়েছি, মানুষ হতে পারি নি, তার একমাত্র কারণ আমার বাবা। প্রথম জীবনে আমার ওপর বাবা যতটা স্নেহ করতেন, শেষ জীবনে আমার জন্য তিনি ততটাই কষ্ট পেয়ে গেছেন। ও! হাউ হি কার্‌স্‌ড মী! কী ভীষণ অভিশাপ

দিতেন! হয়তো সেই পাপের কথা স্মরণ ক'রে বাবা আমার পরলোকে চোখের জল ফেলছেন!'

রুমালখানা তুলে নিয়ে কপালের ঘাম মোছার মতো উনি চোখের জল মুছলেন। আমি তখন ভাবলাম, আহা, আমি কী জিজ্ঞাসা করলাম, আর উনি কিসের জন্য এই সমস্ত কথা শুরু করে দিলেন!

হ্যাঁ, একটু আগেই উনি বলেছিলেন— 'আমি যে-সমস্ত কাজ করি, সে-সব কাজের দায়িত্ব স্বীকার করতে পারি না। অতটা শক্তি আমার নেই। আই অ্যাম নট সো স্ট্রং।'

এই মনোভাব যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, সে-কথা আমি তাঁর কাছে বললাম— 'আপনার কাজের দায়িত্ব যদি আপনিই গ্রহণ না করেন, তবে তাতে কেবল অন্য লোককেই নয়, আপনাকেও অনেক কষ্ট পেতে হবে। কী দায়িত্বহীনভাবে এই কথাটা আপনি বললেন?' আমি এই কথা বললে অন্যায়কারী শিশুর মতো মুখখানি কাচুমাচু ক'রে উনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন। যাতে উনি ভালো করে বুঝতে পারেন, সেইজন্য ইংরাজীতে বললাম: 'ইউ আর অ্যান্ অ্যাডাল্ট। বড়ো ও ছোটোদের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ হল এই: শিশুরা কোনো ভুল বা অন্যায় করলে তার দায়িত্ব তাদের মাতা-পিতার। কিন্তু বড়োদের বেলায় তা খাটে না। শিশু যেমন মায়ের কাছে বলে— 'মা, আমার কাজের দায়িত্ব আমি নিতে পারি না', আপনিও ঠিক সেই রকম বলবেন?' — এই বলে আমি হাসলাম। তখন ওঁর মনে বুঝি মায়ের স্মৃতি জেগে উঠল।

ইতিমধ্যে বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমাদের চারিদিকে এখানে ওখানে ডিম্ করে জ্বালানো রঙীন আলো। গাড়ীগুলির উপর রঙীন বাতির আলো পড়ে চকচক্ করছে। কোনো কোনো সময়ে দু-একটা গাড়ী হেডলাইট জ্বালিয়ে মোড় ঘুরতে গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তখন উনি গাড়ীর মালিক বা ড্রাইভারের উদ্দেশে গালিগালাজ করতে থাকেন। ওর মুখে এই সমস্ত খারাপ কথা আসাটা নিতান্তই একটা সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। কী বলছেন তা না জেনেই কথাগুলি বলে ফেলেন। শুনতে পেলে কে বাপু আবার ঝগড়া বাধিয়ে বসে এই আমার ভয়। কখনো আবার উনি আমার অসন্তুষ্ট মুখ দেখে বুঝতে পারেন যে ওর গালাগালিটা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি, তখনই আমার কাছে খুব নম্রভাবে বলে ওঠেন— 'আই অ্যাম্ সরি।' তারপর কিছুক্ষণ সিগারেট ধরিয়ে কথা না বলে চুপ ক'রে কী ভাবতে থাকেন। তারপরে সেই ভাবনা থেকে দীর্ঘশ্বাস এবং তারপর থেকে তাঁর কথাবার্তার মোড় ফেরে। অ্যাশ্-ট্রে-তে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে উনি ইংরেজীতে শুরু করেন: 'দেখো আমি বড়ো হতভাগা। খুব জমকালো বাড়ী, গাড়ী ও টাকা থাকলেই হল বুঝি? ঐ সব ছিল বলেই এবং আছে বলেই তো আমি খুব হতভাগ্য হয়েছি। যদি তোমাদের মতো সামান্য পরিবারে জন্ম নিতাম তাহলে

আমি কত-না ভালো হতে পারতাম। সেই সময়ে, তখন আমি ইস্কুলের ছাত্র, বাবা রোজ আমাকে হাতখরচ বাবদ দশটি ক'রে টাকা দিতেন। তার আগে দিতেন প্রত্যহ একটি টাকা। একদিন বাবার অসাক্ষাতে আমি কিছু পয়সা চুরি করি। সেইটে জানার পরেই আমার হাতখরচ হয়ে গেল এক থেকে দশ! বাবা বললেন— 'যত টাকা লাগে আমি দেব. কিন্তু চুরি করবে না। শপথ করো যে আর কখনও চুরি করবে না!' এইভাবে বাবা আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন। গঙ্গা! ডু ইউ নো ওয়ান্ থিং?— একটা ব্যাপার তুমি জানো?' এই বলে আমার দিকে তাকালেন! আমিও অন্ধকারের মধ্যে ওঁর দিকে নজর ক'রে চেয়ে রইলাম! ওর চোখ দুটি চক্‌চক্ ক'রে উঠল। পিছন থেকে বিচ্ছুরিত নীল আলোয় ওর মাথার একটা ·দিকের চুল ও কানের পাশটা নীল নীল দেখাচ্ছিল।

'আমি তখনও চুরি করে যাচ্ছি। আমার টাকাই আমি চুরি করছি! হাউ আন্‌ফরচুনেট! আমি যেদিন প্রথম চুরি করি, সেদিন যদি বাবা আমার গালে চারটে চড় লাগিয়ে দিতেন, আমি শুধরে যেতাম। আমার স্বভাব চরিত্র সংশোধনের জন্য বাবার উচিত ছিল আমাকে প্রহার করা। কিন্তু তিনি তা করেন নি, এতই ভালোবাসতেন আমাকে। বারো বছরের ছেলে, কনভেণ্টে পড়ে, গাড়ীতে যায়, গাড়ীতে আসে. এমন ছেলের হাতে কি মাসে দশটা টাকা 'পকেট-মানি' দেওয়া উচিত? কথাটা বাবা ভেবে দেখেন নি। আজকালকার দিনেও, দেখো, পদ্মা আমার ছেলেপিলেদের বলে যে সে তাদের হাতে টাকাপয়সা কিছুই দেবে না।··· আমি কী করতাম জানো? সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হোটেলে যেতাম। খুব অহংকার হত ভেবে যে সকলকে খাওয়াচ্ছি। যেমন করে হোক, প্রতিটি দিন দশটা টাকা খরচ হয়ে যেত। কোনো-কোনো দিন তাতেও কুলোত না। একবার ভেবে দেখো কথাটা। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে দশটা টাকা কি কম কথা! তোমাদের মতো দিনের আয়ও হয়তো দশ টাকা ছিল না! অ্যাম্ আই রাইট?' এই বলে আমার মুখের সোজাসুজি তাঁর আঙুলটা বাড়িয়ে দিলেন।

বললাম— 'ইয়েস, ইউ আর রাইট।' সত্যিই তো, তখন আমাদের অবস্থা কী ছিল? এক মুহূর্ত ভেবে দেখলাম। পঁচিশ বছর আগে বাবা বেঁচে ছিলেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল মাত্র আশি টাকা। তারপরে চাকরিতে ঢুকল গণেশ, তখনও তার মাইনে মাত্র সত্তর টাকা। বাড়ী ভাড়া ছিল মাসিক সতেরো টাকা। ওই টাকা দিয়েই সংসার চালাতে কত কষ্ট পোহাতে হত মাকে। আহা!

উনি বলেই চললেন: 'সেই দশটা টাকা পুরো খরচ না ক'রে বাকি টাকা আমি নাকি জমাতাম। আমার বাবার কী গর্ব। কনর্কপিল্লের কাছে বাবার মুখে আমার কী প্রশংসা। আমাকেও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন— 'কী রে! তাই

নাকি ?' আমিও খুব মাথা নাড়তাম। তারপরে শুরু করলাম চুরি! এবারে আর দশে-দশে নয়, শয়ে-শয়ে। দামী দামী সব জিনিস কিনতাম। বাবার ধারণা— জমানো টাকা দিয়ে কেনা। খুব আনন্দ তাঁর। কারও জীবন যদি নষ্ট করতে চাও, তার হাতে টাকা দাও, চাইলেই টাকা। এক নয়, দশ নয়, প্রচুর টাকা। খরচ করবে ? করুক। আবার টাকা দাও। আবার খরচ, আবার টাকা! বাস্, দাও বন্ধ ক'রে টাকা দেওয়া। তোমার শত্রুকে যদি ধ্বংস করতে চাও, এর চেয়ে মারাত্মক অস্ত্র আর কিছু নেই। ওইভাবেই আমার বাবা আমার সর্বনাশ ক'রে গেছেন।'

আমি শুধু ভাবছিলাম— আচ্ছা উনি এত কথা বলেন, এত জানেন, তবে কেন এই ধরনের চালচলন ? আমি যে এইভাবে চিন্তা করছি তা যেন বুঝতে পেরেই উনি উত্তর দিলেন : 'আমার এই সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তা এখনই যা আসছে, তাও তোমার মতো ভালো লোকের সামনে। আজ কয়েকদিন ধ'রে তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি খুব দুঃখ পাচ্ছি। তুমি বলছ— যে কোনো কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত, তাই না ? আচ্ছা, তোমার ওপর যে কাজটা করেছিলাম, তার দায়িত্ব আমি কী ক'রে নিতে পারি ? কোনো উপায়ই নেই তার। তাই তো আমার কোনো কাজের জন্যই আমি দায়ী নই বলে সরে পড়ি। দায়িত্ব নেই বলে আমরা সরে পড়তে পারি। কিন্তু সেই পাপ আমাদের এমনি এমনি ছেড়ে দেবে কি না এখন সেই কথাটাই ভাবছি। কিন্তু একটা কথা। কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে আমি ওটা করি নি! তুমিও আমারই মতো ওটাকে একটা খেলা বলে নিয়েছ এই ছিল আমার ধারণা। ও রকম ভাবাটা যে কতটা ভুল তা আমি সেদিন বুঝতে পেরেছি। এতদিন পরে তোমাকে আমি কী ভাবে সাহায্য করতে পারি ? বাট্ আই শুড ডু সামথিং। এই যে এভাবে তোমাকে-আমাকে জড়িয়ে সকলকে কথা বলার সুযোগ দিলে··· আচ্ছা, তুমি যে কেন ইচ্ছে ক'রেই তা করতে দিচ্ছ আমি কিন্তু বুঝতে পারি না। তুমি যদি সত্যি সত্যি কোনো আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এরূপ করতে তবু তার একটা মানে হত। আমি ভালো করেই জানি, সেরকম কোনো ইন্‌টেনশন্ তোমার নেই। তাহলে কেন ? কেন এভাবে বদ্‌নাম কিনছ ? তুমি বলছ যে, আর আর লোক যা ভাবে ভাবুক, মঞ্জু যেন তোমার সম্পর্কে খারাপ কিছু না ভাবে। এখন হয়তো সে কিছু ভাবছে না, কিন্তু কালও যে ভাববে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ? দেখো, আমার কোনো ভাবনা নেই। কোনো বিষয়েই আমার কোনো দায়িত্ব নেই। আমি তোমার অবস্থায় থেকে দেখছি— তোমাকে আমার পক্ষে বুঝতে পারাই অসম্ভব।'

আমাদের চারদিককার গাড়ীগুলি এক এক ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে এখানে ওখানে দু-একটা দাঁড়িয়ে আছে। সেই খাকি শার্ট পরা ছোকরাটি এসে জিজ্ঞেস করল— 'ট্রে নিয়ে যাব, স্যর ?' উনি গাড়ী থেকে 'ট্রে'টা তুলে

দিলেন। মনে হচ্ছে এখানেই যেন আমরা অনেকক্ষণ ধরে রয়েছি। আমি ওঁকে বললাম : 'চলুন অন্য কোথাও যাওয়া যাক। এখানে বসে বসে 'বোরিং' লাগছে।' আমার কথায় উনি আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন : 'বীচের দিকে যাব ?'

'ও ইয়েস।'

18

গাড়ী ছুটলো। গাড়ী চালাতে চালাতে উনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— 'আজ কী হয়েছে তোমার ?' সাধারণত সমুদ্রতীরে অথবা হোটেলে যাব বলে ডাকলে আজকাল তুমি আসই না। আজ তুমি নিজের থেকেই বলছ এখানে যাওয়া যাক, ওখানে যাওয়া যাক। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার ?' কথাটা জিজ্ঞেস ক'রে আবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। উনি যখন এমনি ক'রে হাসেন, মনে হয় যেন একটি শিশু। মঞ্জুর কাছে ইনি সব সময়ে এমনি ভাবেই হাসেন। মঞ্জুও হাসে এমনি ভাবে। বাপ ও মেয়ের হাসিতেও বেশ মিল।

আমি মাথাটা নীচু করে হাসি মুখে উত্তর দিলাম, 'আমি বলেছি না আপনার সঙ্গে আজ আমার নিরালায় কিছু কথা বলার আছে।'

'ও। আরও কথা আছে ? আমি ভেবেছিলাম সব কথা বলা হয়ে গেছে। এনি মোর অ্যাডভাইস্ ?'

'নো নো ! সেরকম কিছুই নয়। দুজনেই মৌন হয়ে আছি। গাড়ীটা কেবল চলছে। ওঁর কাছে আমার আরও কী কী বলার আছে তাই আমি ভেবে দেখছি। উনি এই সময়ে অন্য কোথাও গিয়ে কারও সঙ্গে মদটদ খেয়ে বেশ ফুর্তিতে থাকেন বলেই আমার এত রাগ ? এতে আমার রাগ করার কী আছে ? আমি ওর কনকুবাইন, মিছিমিছি এই অখ্যাতি লাভের জন্যই আমি ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় করছি। উনি যদি কোথাও যান, তাতে আমার কী ? আমার সম্পর্কে মঞ্জুও যদি ঐ কথাই ভাবে আমার তাতে ক্ষতি কী ? কেন এই সব মিথ্যা সংস্কারে আমি জড়িয়ে পড়েছি ? 'এই-ই হচ্ছে যথার্থ রূপ'— আমি সেই রূপেই কেন নিজেকে দেখাতে পারব না ? হোয়াট ইজ রঙ ইন ইট ? উনি কখনও আমায় 'না' বলতে পারবেন না ! কী দুর্ভাগ্য। এখন এও একটি সমস্যা ? আমিই তো 'না' বলব। আমার কাছে আমার মামা যতটা লিবার্টিস্ নেয়, উনি তার কিছুমাত্র নেন না, নেওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করেন না। উনি কি সত্যিসত্যিই অতটা ভদ্র ? আমার ক্ষেত্রে ভদ্র হলেও অন্যান্য মেয়ের ব্যাপারে উনি কতটা কি ভদ্র অথবা অভদ্র তার কিছুই জানি না। কেবল এইটুকু জানি যে একটি দিনও উনি স্বগৃহে

রাত্রিবাস করেন না। তবে কি কেবল আমার ক্ষেত্রেই ওঁর এতখানি ভদ্রতাবোধ? কিন্তু কেন?

কিসের জন্য আমি এসব ভাবছি? আমি যে কী তা কি আমি বুঝি না? ওঁর জন্য কি কখনও আমার আকাঙ্ক্ষা হবে? ছি ছি! কী মিথ্যা ভাবনা! আমি কি আকুল হয়ে ভাবছি যে আমার জন্য ওঁর আকাঙ্ক্ষা হবে না? ওরকম যদি কিছু ঘটে, তা কি স্বীকার ক'রে নেব? আমার জন্য ওঁর, এবং ওঁর জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হওয়া দরকার। কিন্তু না, ওরকম কোনো আগ্রহ আমার নেই। ওঁরও কোনো আগ্রহ হবে না বলেই মনে হয়। হতে পারত। উনি যে ফোনে আমার আহ্বান পেয়ে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করতে আসেন, নিশ্চয়ই সেদিন কোনো আগ্রহ ছিল ওঁর মনে। আমিই সে পথ ঘুরিয়ে দিয়েছি। কাজেই এর পরে আর ও ধরনের চিন্তা তাঁর মনে আসবে না। তাঁর আর কী? হোয়েন্ দ্য মিল্‌ক্ ইজ্‌ সো চীপ্‌, হোয়াই গুড্‌ আই বাই এ কাউ? দুধ যখন সস্তায় পাওয়া যায় তখন আমি কেন গোরু কিনব?— এই ধরনের একটা প্রবাদ আছে না ইংরেজীতে? সেটা ওঁর ক্ষেত্রে খুব খাটে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে? আমার ওঁর সম্পর্কেও কোনো আগ্রহ নেই, অন্য কারও বিষয়ে কোনো দিন কোনো আগ্রহ জন্মাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু কেবল একটা জিনিস আমার নিশ্চিত মনে হয়। কেউ যদি আমার ওপর জবরদস্তি করে, লোকটা যেই হোক-না কেন, তবে আমি বোধ করি সম্মত হয়ে যাব বলে মনে হয়। আমাকে কেউ জোর ক'রে রাজী করাতে পারলে ভালো হয়। উনি ছাড়া আর কেউ যেন আমার ওপর জোর না করে— এই কথাটাই আমি ভাবি বলে মনে হয়। জোর জবরদস্তির ফলেই যদি আমাকে সম্মত হতে হয়, তবে আমার একান্ত ইচ্ছা সেটা যেন ওঁর কাছ থেকেই আসে। তাই তো আমি ওঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছি তা কেবল এইজন্যই নয় যে উনি অন্য পুরুষের হাত থেকে আমায় রক্ষা করবেন, আমার দুর্বলতা থেকেও উনি আমায় রক্ষা করবেন। অতঃপর আমার কোনো কাজের জন্য আমি দায়ী নই— একথা বলে আমিও কি সরে দাঁড়াব নাকি। ও! হাউ ডেঞ্জারাস্‌ ইট্‌ ইজ!

ঐ যে সামনে উঠছে মস্ত বড়ো চাঁদ। এখান থেকে দেখলে মনে হয় মাটি থেকে মাত্র এক বিঘত উঁচুতে উঠে এসেছে। সমুদ্রের জল দেখা যাচ্ছে না। কাল অথবা পরশু এলে বোধকরি পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যেত। আমি আগে লক্ষ্য করি নি হঠাৎ খেয়াল হল, উনি কখন এক সময়ে যথাস্থানে গাড়ী নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তা হলে এতক্ষণ বেশ গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম? মনের মধ্যে হাজারো চিন্তা জাগে। আমরা চাইলে বা না চাইলেও জাগে। চিন্তার বা স্মৃতির কোনো আগল আছে নাকি? এই সমস্ত বাধা ক্ষুদ্র চিন্তা ছাড়া আর কী?

'কী বলবে বলেছিলে না? বলো এখন'— এই বলে উনি গাড়ীর দরজা খুলে একটা পা তুলে গাড়ীর দরজার উপর রেখে সীটে হেলান দিয়ে সিগারেট

ধরালেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় কী মিষ্টি গন্ধ! একদিন একটা সিগারেট খেয়ে দেখতে হবে— কেমন খেতে। ভালো লাগবে কী? আমাদের হেডক্লার্ক মিসেস্ মানুবল সে খুব খায়। আমি বসে বসে দেখি। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে সে সিগারেট খায়। সমস্ত ঠোঁটে কালো দাগ পড়া। সিগারেট খাওয়া খুব ম্যান্‌লি ব্যাপার। আমি কি খেতে পারি? এমনি এমনি ভাবছি! না-হয় না খেলাম, ভাবাটাও কি অন্যায়? আমার এবং ওঁর মাঝখানে সীটের ওপর পড়ে থাকা ঐ সিগারেট প্যাকেকটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকে দেখি। কেমন একটা ফুলের গন্ধের মতো গন্ধ!

'এই গন্ধটা তোমার ভালো লাগে?' উনি জিজ্ঞেস করলেন।

'এতে ভালো লাগার কী আছে? কিছু লোক আছে যারা, দূরে বসে কেউ সিগারেট খেলেও, গন্ধে তাদের পেট খলবল করে। আমি সেরকম নই। এই আর কি!' বেশ সাহসের সঙ্গে একটু মিথ্যা ক'রে বললাম।

কিছু একটা বলতে হবে বলে মিসেস মানুবলের সিগারেট খাওয়া সম্পর্কে ওঁর কাছে বললাম। ওঁর কাছে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই আশ্চর্যজনক বলে মনে হল না। সিগারেট খাওয়া মেয়েদের পক্ষে এমন কী? ওঁর সঙ্গে বসে ব্রাণ্ডি, হুইস্কি খায় এমন মেয়ের সংখ্যাও তো কম নয়। আমার কথার দিকে লক্ষ্য না ক'রে উনি বসে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপরে এখন ভাবতে শুরু করেছেন আমার বিষয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— 'কত কী কথা বলার আছে বলে ডেকে এনে তারপরে কিছুই বলতে না পারায় নিশ্চয়ই আপনার খুব বোরিং লাগছে?'

'নো নো' বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন— 'বোরিং বলে কিছু মাত্র নয়, তবে এটা ঠিক যে তোমাকে আমি এখনও বুঝতে পারি নি। প্রথম দিন কিসের জন্য আমাকে ফোন করেছিলে? কিসের জন্য আমাকে আসতে বলেছিলে? আমার সঙ্গে তোমার নামটা জড়িয়ে তুমি নিজেকে কেন কলঙ্কিত করছ? তোমার ফ্যুচার সম্পর্কে তুমি কী যে মনে কর, আমি তো তাই ভাবছি। ইন্ হোয়াট্ ওয়ে আই ক্যান হেল্‌প ইউ?' এইভাবে ওঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখে আমার মনে হল ওঁকে এমনভাবে কষ্ট দেওয়াটা ঠিক হবে না।

উনি এইমাত্র আমাকে যে প্রশ্নগুলি করলেন, তার কী যে জবাব দেব বুঝতে পারলুম না। কিন্তু কোনো বৃহৎ পরিকল্পনার পূর্বচিন্তারূপে এই সমস্ত করছি বলে যেন আমার মনে হল। একদিন সন্ধ্যাবেলা যেমন উনি কিছুই না ভেবেচিন্তে আমাকে গাড়ীর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন— সেই কাজের ফলাফল সম্পর্কে কিছুমাত্র না ভেবে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমিও সেইরকম মানসিক চাপল্যের বশে ওঁকে ধরে টেনে নিয়ে এসেছি!

অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে হঠাৎ আমি ওকে আমার অজ্ঞাতেই যেন একটা সত্য

উক্তি ক'রে ফেললাম : 'কয়েক দিন ধরে আমার একটা ভয়। কেউ যেন আমাকে 'রেপ' করবে বলে আমি সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকি। ওরকম ভাবে যদি কেউ জোর ক'রে আমাকে নষ্ট করতে আসে, আমি কী যে করব সেই ভয়। সেই ভয়ে বিচলিত হয়েই আমি আপনার কাছে এসে লুকিয়ে থাকি'— এই কথা বলা মাত্রই আমি বুঝতে পারলাম যে কথাটা আমার বলা উচিত হয় নি এবং তক্ষুনি লজ্জায় ঠোঁটটা কামড়ে ধরে মাথাটা নীচু করলাম। সমস্ত শরীর আমার থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

আমাকে উনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— 'ডোণ্ট বি সিলি। তুমি কি এখন সেই বারো বছর আগেকার মতো ছোট্ট শিশু নাকি? আমাকে যে তুমি বলেছ, সেই রকম— আর ইউ নট অ্যান্ অ্যাডাল্ট্? তুমি লেখাপড়া-জানা মেয়ে, একজন অফিসার মানুষ। কে এসে তোমার কী করতে পারে? তাও তোমার ইচ্ছা না হলে··· ইট ইজ এ বেসলেস ফিয়ার! অনাবশ্যক ভয় পোষণ কোরো না।'

আমি কেঁদে ফেললাম। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল— মনের অপবিত্র জল। আমার মনটাই যেন অপবিত্র হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে গাল দুটো মুছে ফেললাম। মুছতে মুছতে বললাম : 'একবার ওরকম হয়ে যাওয়াতে আমার ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই। ওভাবে কেউ যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে কিছু করতে চায় সেই ভেবে আমার ভয়। আমার কপালে যদি লেখাই থাকে ওরকম কিছু আবার ঘটবে, তবে সে যেন অন্যলোক না হয়ে আপনিই হন— এইজন্যই আপনাকে আমি খুঁজে বের করেছি।···'

'ডোণ্ট টক সাচ ননসেন্স। আমার জীবনে এর পরে আর আগের মতো একদিনও ঘটবে না'— বেশ দৃঢ় কণ্ঠে উনি ইংরেজীতে বললেন। আমি চোখ তুলে ওঁর দিকে তাকালাম। 'তুমি কি জানো, আমি বড়ো-একটা সৎ লোক নই, ভদ্র লোকও নই। যেখানে যে মেয়েকে পেয়েছি, তাকে নিয়েই গিয়েছি। কিন্তু একটা কথা। কোনো মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত আমি কাউকে স্পর্শও করি নি। সেরকম একটা অন্যায় আমি কেবল তোমার ক্ষেত্রেই করেছি। তাও এই ভুল বিশ্বাস নিয়ে যে তুমি তাতে সম্মত ছিলে। আর তারই ফলে তোমার বেলায় ওরকমটা সম্ভব হয়েছিল। তুমি ভেবে দেখো। আচ্ছা, সেদিন কি আমি তোমায় কম্পেল্ করেছিলাম? আমি কিন্তু একথা বলছি না যে কাজটা ভালো হয়েছে। আমি বলতে চাই যে সেই অন্যায় ঘটনা ঘটবার মূলে ছিল একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস···।' উনি যেন অনেকক্ষণ ধরে মনে-মনে চিন্তাভাবনা করেছেন সেইভাবেই ইংরেজীতে বলছিলেন।

'তখনই আমি মোটামুটি নষ্ট চরিত্রের লোক। কিন্তু তখনও পক্বতা মানে ম্যাচুরিটি আসে নি। সেই অভিজ্ঞতার ফলেই আমি দেখেছি যে আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলে কেউ প্রত্যাখ্যান করে নি। আমার পরিবেশে ঐ রকমেরই ছিল। ইউ

নো আই ওয়াজ ..' এই কথাটা বলার সময়ে ওঁর গলাটা আটকে এল— গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন— 'আই ওয়াজ প্যেরেলট অ্যাট মাই টুয়েলফ্‌থ ইয়ার ! ইয়েস্, তখন আমার বয়স মাত্র বারো !' শুনে আমার মনের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। এর পরেও উনি সবিস্তারে কী বলতে যাচ্ছেন ভেবে আমার সমস্ত দেহমন সংকুচিত হয়ে এল। ভাগ্যক্রমে সেই ব্যাপারটা ওখানেই শেষ ক'রে সিগারেট ধরালেন। মুখখানাকে সুঁচালো ক'রে কিছু একটা ভাববার চেষ্টা করছিলেন। উনি যা চিন্তা করছেন, সেই কথাটাই ভাবতে গিয়ে আমার যেন কী রকম ভালো লাগছে।

আমি কি মনে-মনে আমাকেই এই বলে ভর্ৎসনা করছিলাম যে আমি কিসের জন্য ওকে এই ধরনের কথাবার্তার মধ্যে টেনে এনেছি। কিন্তু এই ভর্ৎসনা যে সত্য নয় সে কথা মনের মধ্যে আর-একটা বক্তব্য চোখ টিপে যেন জানিয়ে দিচ্ছে।

একই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ও সিগারেটের ধোঁয়া বের ক'রে দিলেন উনি। এখন ওকে দেখলে মনে হয়ে ওর শ্বাস মানেই ধোঁয়া। এই পরিমাণেই উনি অনবরত সিগারেট মুখে দিয়ে থাকেন।

'আমি মাতৃহীন সন্তান ছিলাম বলেই আমাকে লালনপালন করত একজন আয়া। যখন মায়ের কথা মনে করি তখনই সেই আয়ার স্মৃতি মনে জাগে। মাত্র বছর-দুই হল তার মৃত্যু হয়েছে। তার একটি মেয়ে আছে। এখন তার বয়স পঞ্চাশের ওপর। নাতি-নাতনী নিয়ে কোথায় থাকে জানি। তুমি কিছুক্ষণ আগে তোমার ভয়ের কথা বলছিলে না ! আমিও সেইভাবে— আই ওয়াজ রেপড্‌ বাই হার্ ! খুব অল্প বয়সেই আমার চরিত্র কলুষিত হয়ে গেল। তবু আমি বলব যে আমি কোনো নষ্ট করি নি, নষ্ট করেছে টাকা, টাকা। দ্যাট্ ইজ দি ডেভিল !... নইলে কোনো হাইস্কুলের ছেলে কি কখনও কলেজ লেভেল্-এ গার্ল ফ্রেণ্ডস্ পায় ? আমার গাড়ী থামিয়ে লিফ্‌ট্ দেওয়ার জন্য কত মেয়ে বলত ! আমি কেবল এই চিন্তা নিয়েই ঘুরে বেড়াতাম যে লাইফ-এ দুটো জিনিস হচ্ছে রোমান্সের রাজা— আইসক্রীম ও ম্যাটিনি শো। সেইজন্যই তো তোমাকেও তাদের মতো ভেবে-ছিলাম। কিন্তু আমি বাড়িতে নষ্ট করি নি। এখনও আমি ওইভাবে রাত্রিবাসের জন্য সারা শহর চষে বেড়াই— কিসের জন্য ? যখন জানতে পারলাম যে আমার কাছে আসাটাও পদ্মার পছন্দ নয়, তখন থেকেই সে আমার কাছ থেকে আলাদা। সে তো আমার স্ত্রী, তাই বলে কি আমি তার ওপর বলাৎকার করতে পারি ? আই ক্যান্ নট্ রেপ এনি ওয়ান্ : নো, আই ক্যান্ নট'— এই বলে উনি দাঁত কড়মড় করতে লাগলেন।

ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। গলার শিরাগুলো ব্যথা-ব্যথা করছে। এখন একটু কাঁদতে পারলে ভালো হত। কিন্তু কান্না যে আসছে

না! আমি মনে-মনে হাসলাম। সেই হাসির অর্থ কিন্তু আনন্দ নয়: আচ্ছা, আমি না চাইতে একবার নষ্ট হয়েছি। এখন দেখছি, আমি চাইলেও আর-একবার নষ্ট হওয়ার মতো অদৃষ্ট আমার নেই। ওকে আমি ভালোবাসতে পারব না, যারা চায় না তাদের ওপর উনি জবরদস্তি করতে পারেন না— আমরা এহেন দুটি নরনারী কাছাকাছি এসে পড়েছি। কী অদ্ভুত সংকট!— এই কথা ভেবেই নিরানন্দের হাসি হাসলাম।

ওঁরই মতো দাঁতে দাঁত লাগিয়ে আমিও মনে-মনে বললাম— 'আই ক্যান্ নট লাভ ইউ।' তারপর ওকে লক্ষ্য ক'রে বললাম: 'আমি কাউকে ভালোবাসতে পারব না।' 'তাই নাকি?' এই বলে উনি আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বললেন: 'আই সি। কাউকে ভালোবাসার মতো ক্ষমতা তোমার নেই বলে তুমি ভাবছ। কেবল তাই নয়। তুমি অত্যন্ত ভুল করে ভাবছ যে, কোনো পুরুষ তোমার ওপর জোর-জবরদস্তি করে যেতে পারে। সেইজন্যই ওরকম কিছু একটা ঘটবে বলে তোমার উদ্‌বেগ। ইউ গুড নো ওয়ান থিং— দ্যাট ওয়াজ নট এ রেপ। বারো বছর আগে গাড়ীর মধ্যে যে ঘটনা ঘটে, তা তোমার সম্মতি নিয়েই ঘটেছিল। পরমুহূর্তেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ব্যাপারটা তোমার ভালো লাগে নি। কিন্তু তার আগে, তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি যে তাতে সম্মত ছিলে সে কথা মিথ্যা নয়। তোমার সম্মতিদানের একটা কারণ হলেও হতে পারে তোমার অজ্ঞতা। আমি তখনই তা বুঝেছিলাম। কিন্তু তার জন্য সেই ঘটনাকে 'রেপ' বলে মনে কোরো না। তুমি তাই ভেবেছিলে বলেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমার মায়ের কাছে গিয়ে বলেছিলে। অ্যাণ্ড দেয়ার দ্য ট্রাবল্ স্টারটেড— সমস্ত দুর্ভোগের কারণই হচ্ছে এইটি। ঐ রকম মিথ্যা কল্পনায় তোমাকে আর কষ্ট পোহাবার প্রয়োজন নেই। এত কথা তুমি আমার কাছে বলছ। আমি যদি অন্তলোকের মতো অভদ্র, অসৎ হতাম, তবে তোমার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমি কি এখনও তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতে পারতাম না? আমি তোমাকে বলছি তোমার মন থেকে এই দুর্বলতাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে।'

আমি মনে মনে ভাবলাম: 'হায় নির্বোধ! এই যে আমি তোমার কাছে সমস্ত কথা বলছি, একে তুমি দুর্বলতা মনে ক'রে যাতে তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারো, সেইজন্য বুঝি? এই কথাটি তুমি বুঝেছ নাকি?'

হঠাৎ আমাদের ওপর লাইট এসে পড়ল। একটা গাড়ী আসছে। আমি চোখ বন্ধ করলাম। গাড়ীটা কাছে আসা মাত্র আমি দেখলাম 'এল্' বোর্ড ঝোলানো রয়েছে। গাড়ীটা চালাচ্ছিল একজন ব্রাহ্মণ রমণী— মাথা ভরতি তার মল্লিকা ফুল। তার পাশেই বসে আছেন তার পতিদেবতা। গমপেষা কলের মতো একটা ভয়ংকর গর্জন ক'রে ঐ গাড়ীটা আমাদের গাড়ীর কাছেই এসে দাঁড়াল।

পতিদেবতা দাঁত কড়মড় ক'রে এমনভাবে হাত তুললেন যেন এখনই একটা মারধোর হয়ে যাবে। তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন : 'ইউ ফুল ! গিয়ার বদলাবার সময়ে ক্লাচের ওপর পা দিতে হবে একথাটা আর কতবার বলব ?' স্ত্রীর মাথায় যেন একটা ঘুষি দিল। আমাদের গাড়ীতে যে আমরা দুটি প্রাণী বসে আছি ভদ্রলোক লক্ষ্য করেন নি। ভদ্রমহিলার অবস্থা দেখে সত্যিই খুব কষ্ট হল। হঠাৎ সে আমার দিকে তাকাল। আমি এমনভাবে মুখটা ফিরিয়ে নিলাম যেন তাদের লক্ষ্যই করি নি। আমার কেবল ভয়, উনি আবার হো হো ক'রে হেসে না ওঠেন। ভদ্রমহিলা গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। ঐ গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে উনি আমাকে বললেন : 'ড্রাইভিং শেখো, আমি তোমায় শেখাবো, আমাদের সুভাষ ঐ তো অতটুকু ছেলে, পা-ও পর্যন্ত পৌঁছয় না, অথচ এতবড়ো গাড়ীটাকে ঠিকমতো চালিয়ে নেয়। পম্পা তো ড্রাইভিং ভালোই জানে। মঞ্জুকে শিখিয়ে দেব বলে ডাকলেও সে আসে না। তুমি এসে যোগ দিলে মঞ্জুও শিখবে।' খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে গেলেন কথাগুলি।

আমি বললাম : 'আগে আগে আমি সকাল সন্ধ্যা দু' বেলাই বেড়াতাম। আজকাল সেই বেড়াবার সময়টুকুও নেই।' উনি পরামর্শ দিয়ে বললেন : 'সকাল-বেলা উঠে সমুদ্রতীরে গেলে বেশ হয়, তাই না ? মঞ্জুকেও টেনে আনতে পারলে আরও ভালো হয়। ওকে তখন বিদ্যাটা শেখানো যেতে পারে। অমনি বীচ রোড ধরে খানিকটা ওয়াকিং মানে বেড়ানোও চলে।'

আমি একটু না হেসে পারলাম না। হেসে হেসেই বললাম— 'সকালবেলা বলে যে একটা সময় আছে তা কি আপনি জানেন ?'

'কী বলছ তুমি ? হোয়াট আর ইউ টকিং ? আমি প্রায়ই তো ঐ সময়ে বাড়ী ফিরি। আর আমি বাড়ীতে থাকলেও এই সময়েই ঘুম থেকে উঠি। আমি নেশায় ঘুমিয়ে পড়ি, আর নেশাটা কেটে গেলেই ঘুম ভেঙে যায়।'

হঠাৎ ওঁর হেলথ-এর কথা ভেবে আমার দুঃখ হল। উনি যে কী যন্ত্রণা প্রকাশ না ক'রে চুপ করে থাকেন। ঘুম— যে জিনিসটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের কাছে আসে, ওঁর সেই ঘুমও একটা কৃত্রিম অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে প্রত্যহ সারাটা দিন মদে চুর হয়ে থাকেন। এই সব কারণেই ওঁর দেহের মধ্যে নানারকম জটিলতা হয়েছে। হঠাৎ একদিন এসে হয়তো বিছানা নিতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম— 'আপনি আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কন্সাল্ট্ করেছিলেন ?'

'ও ইয়েস ! ডাক্তার কেবলই বলে— মদটদ ছাড়ুন। মদ ছেড়ে দিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মদ খেয়ে মরে যাওয়াই ভালো আমার কাছে। ইট ইজ অল রাইট।' এই বলে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে উনি একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন।

আমরা দুজনে মিলে স্থির ক'রে ফেললাম, রোজ সকালে উঠে সমুদ্রতীরে

বেড়াতে যাব। আমি আসব বললে মঞ্জুও আসবে বলে মনে হয়। এই-যে এখন আমরা যেখানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে বসে আছি, এর ভেতরকার দিকের রাস্তায় উনি মঞ্জুকে ড্রাইভিং শেখাতে পারবেন। আমি গান্ধীমূর্তি থেকে আয়রন্ ব্রিজ পর্যন্ত হাঁটা শুরু ক'রে ফিরে এখানেই এসে পৌঁছব। তারপরে সকলে মিলে 'ড্রাইভ-ইন্' হোটেলে গিয়ে কফি খাব। আটটার সময়ে উনি আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবেন। তারপরে বেলা দশটায় অফিসে যাওয়ার সময় হলে আবার এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমাকে রেডি হয়ে থাকতে হবে।

এই তো রাত দুটো বাজল। নাঃ, ঘুমোতে হবে বলে নিজেকে নিজে টেনে নিয়ে ধপ ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ ক'রে রইলাম। কখন যে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাই নি। সদরে হর্নের আওয়াজ শোনা গেল। উঠে আলো জ্বালালাম। আয়নায় একবার মুখটা দেখে নিলাম। ঘুমিয়েছি বলে তো মনে হয় না। জানালা দিয়ে দেখলাম মঞ্জু গাড়ীর মধ্যে বসে আছে। মঞ্জু এই প্রথম আমাদের বাড়ীতে এলো। তাকে একবার ভেতরে ডেকে এনে বসাব না? জানালা দিয়ে তাকাতেই মঞ্জু আমাকে দেখে বলে উঠল— 'গুড মর্নিং।'

'কী ব্যাপার? এখনও ঘুমুচ্ছেন? সাড়ে পাঁচটার মধ্যে তৈরী থাকবেন বলেছিলেন না? নাউ ইট ইজ সিক্স।'—গাড়ীতে বসেই মঞ্জু চেঁচিয়ে বলল। আমি তাড়াতাড়ি ক'রে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে জুতো পরে দরজাটা খুললাম।

মামা তার বিছানায় উঠে চোখ বুজে বসে আছে। জপ হচ্ছে। এই তার জপের সময়। এমন ভাবে বেরিয়ে যাব যাতে মামার চোখে না পড়ি। আচ্ছা, মঞ্জুকে একবার বাড়ীর মধ্যে ডাকবো না? ফেরার সময়ে দেখা যাবে।

রান্না ঘরে বসে মা আগুন ধরাবার জন্য উনোনে হাওয়া দিচ্ছিল। হর্নের আওয়াজ কানে যেতেই কেউ যেন এসে মাকেই ডাকছে এইভাবে সে বড় ঘরে ছুটে এসে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। মামাকে বোলো। আটটার মধ্যে আমি এসে যাব।' এই বলে সদর দরজাটা খুলে বাইরে এলাম। ঐ যে সকলে আমার দিকে চেয়ে আছে— পাশের বাড়ীর আঙিনায় আলপনা দিচ্ছে ভদ্রমহিলা. আর-এক বাড়ীর সামনে দুধ দোয়াবার জায়গায় বাসন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর এক মহিলা… এক-এক করে সামনের বাড়ীর জানালাগুলো খুলে গেল। আমাকে দেখবার জন্য সকলেই উন্মুখ।

আমি গাড়ীতে উঠে পিছনের সীটে বসলাম। মঞ্জু বলল, 'আপনার বাড়ীটা বেশ ছোটখাটো ও সুন্দর।'

'ভেবেছিলাম তোমায় ভিতরে ডাকব। কিন্তু এখনই তো লেট হয়ে গেছে।

ফেরার সময়ে তোমাকে ভিতরে নিয়ে যাব।'

'ও ইয়েস্, আমার ভালো লাগে এই রকমেরই ছোট ছোট বাড়ী আমাদের বাড়ীটা দেখুন। যেন 'বীস সাল বাদ' টাইপের বাংলো বাড়ী। বাবা, আমরা এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আমাদের অডৈয়ার-এর বাড়ীতে চলে গেলে কেমন হয়!'

'ও সব কথা তোমার মায়ের কাছে বোলো'—গাড়ী চালাতে চালাতে বেশ নীরসভাবে কথাটা বললেন উনি। মুখে ওঁর ধোঁয়া উড়ছে।

'তাহলে আর কখনও হবে না। মা যাবে এই বাড়ী ছেড়ে?'

'তবে চুপ ক'রে থাকো না কেন?'

আমি একটু পরিহাস ক'রে বললাম— 'কেন মঞ্জু, তোমার মা না গেলেন তো না গেলেন। বিয়ের পরে তুমি যখন স্বামীর ঘর করতে যাবে তখন একটা ছোট ও সুন্দর দেখে বাড়ী দেখে নেবে।' আমার এই পরিহাসে মঞ্জু কিছুমাত্র লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হল না। সে বলল— 'সে কী? আমি কি বিয়ের পরে মাদ্রাসেই থাকব নাকি? এক বছরের জন্য হানিমুন করতে যাব। সুইজারল্যাণ্ড হোক, প্যারিস হোক, যে-কোনো জায়গায় গিয়ে থাকব। না বাবা?'

'ও ইয়েস। তোমার বাবাও কি তোমার মাকে নিয়ে যাবে না?' এই বলে উনি হাসলেন। মঞ্জুও তার বাবাকে ক্ষেপাবার জন্য বলল— 'বাবা, তুমি ও মা বিয়ের পরে হানিমুনের সময়ে কোথায় গিয়েছিলে?'

উনি খুব সাধারণভাবেই জবাব দিলেন— 'গিয়েছিলাম তো উটি— উটকামণ্ড। কোথায় গিয়ে কী হবে? ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। ফেরার সময়ে দুজনে ঝগড়াঝাঁটি করেই ফিরে এলাম।'

গাড়ী এসে আই. জি. অফিসের সামনে দাঁড়াল। একটু বেড়াব বলে আমাকে এখানে নামিয়ে দিলেন। আমি গাড়ী থেকে নেমে নীচে এসে দাঁড়াতেই মঞ্জুর মাথায় একটা নতুন আইডিয়া এল। বলল— 'বাবা! আমরা তিনজনেই একসঙ্গে বেড়াই না কেন? তারপরে নাহয় ড্রাইভিং শিখব। তাছাড়া ড্রাইভারের কাছেও শিখে নিতে পারি। একটু বেড়ানো তোমার পক্ষে খুব উপকারী। তোমার তো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ বলতে কিছুই নেই। কাম্ অন্!' এই বলে মঞ্জু তার বাবার হাত ধরে টানতে লাগল। পরে উনি ছোট শিশুর মতো চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন— 'আই-আই-য়ো! আমার দ্বারা ওসব হবে না বাপু। এখান থেকে আয়রন্ ব্রিজ পর্যন্ত? মাই গুডনেস্! নো, নো, দরকার হলে তুমি যাও।'

আমি বললাম— 'না। মঞ্জু ইজ রাইট। একটু বেড়ালে ইউ উইল এন্জয় ইট।' কিছুক্ষণ কী ভেবে 'আচ্ছা, ঠিক আছে' বলে সিগারেট নিয়ে নীচে নেমে এসে গাড়ী লক্ করতে যাচ্ছিলেন।

'নো সিগারেটস' বলে আমি ওঁকে সিগারেট গাড়ীর ভিতরে রেখে যেতে

বললাম। শুনেই ওঁর মুখখানা কেমন বদলে গেল। তবু আমার কথাটা ন্যায্য মনে করেই ভিতরে সিগারেট রেখে গাড়ীটা লক্ ক'রে দিলেন!

পেভমেন্ট-এ একজন জাপানী ভিখারী বসে। আই অ্যাম সরি— ভিখারী নয়, জাপানী। সে কারও কাছে পয়সা চায় না। চোখে চোখ পড়লে একটু মাথা নেড়ে হাসে। উনি ওঁর পার্স থেকে জাপানীকে কিছু দেবার জন্য হাত বাড়ালে, সে তা নিয়ে নিল। মঞ্জু ঠাট্টা ক'রে বলল— 'সকালবেলায় প্রথম কাজ মনে হয়— ধর্মকর্ম করা।'

'কেন? এতে দোষ কী দেখলে? এর পরে রোজ সকালে আমার প্রথম কাজ হবে এখানে এসে একে কিছু পয়সা দেওয়া। তারপরে যেমন কাজই করি-না কেন, দিনের প্রথম কাজটা ভালো হলেই ভালো।' বাপবেটী দুজনের মধ্যে বেশ আলোচনা শুরু হয়ে গেল। মঞ্জু বলল— 'আমার এতে বিশ্বাস নেই বাবা।' উনি উত্তর দিলেন— 'এতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কী আছে?' মঞ্জু বলল— 'এভাবে ভিক্ষা দিতে গেলে বড় রকমের পুণ্য হতে পারে, কিন্তু তাতে অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো সুরাহা হবে বলে বিশ্বাস করি না।'

'হু সেড সো? ধরো তোমার বাড়ীতে একটা লোক এল। তাকে কফি দিতে বললাম। সে কি কফি খায় নি বলে আমাদের বাড়ীতে এসেছে? এ সব হল ম্যানার্সের কথা। একজন বন্ধুকে দেখলে তাকে কফি খেতে ডেকে আনি, তেমনিই একজন... একজন গরীবকে দেখলে এইটুকু সাহায্য করি...'

'শহরে কত গরীব আছে জানো? সকলকেই দাও না গিয়ে।'

'বেশি আরগু্য কোরো না। মনে হয় তুমিই সব জানো। সকলেই সকলকে এভাবে দিয়ে থাকে। এতেই সব ঠিক হয়ে যাবে সে কথা কে বলেছে? আমার দেওয়া আর ওর নেওয়া—এর চেয়েও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার আরগু্যমেন্ট। পৃথিবীর যে-কোনো বিষয় হোক না, আরগু্য করা এ যুগের একটা ফ্যাশন।'

'আপনারা যত খুশী আরগু্য করুন। আমি তাতে 'না' বলব না। তবে বেড়াবার সময়ে নয়। হাঁটাটা একটু জোর করুন তো, যাতে ফিরে আসার সময় খুব ঘাম ছুটে যায়। তবেই তো বেড়াবার সুফল।' হাসতে হাসতে বললাম।

আমরা তিনজনেই খুব দ্রুতবেগে হাত ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে ওয়াকিং শুরু ক'রে দিলাম।

19

বেঙ্কটরাম আইয়ার একা একা প্রাতঃভ্রমণ শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে এসেছে। এসে স্নান ক'রে কপালে বিভূতি মাখিয়ে নানারকম আচার-অনুষ্ঠানের পরে কফি খেয়ে হাতে পেপার নিয়ে বড় ঘরে এসে বসল। কাল সন্ধ্যায় গঙ্গার বাড়ী ফেরা পর্যন্ত বৃত্তান্ত বলতে বলতে গঙ্গার মা কনক অর্ধপথেই ছেড়ে দিয়েছিল। এখন আবার থামের পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বাকী অংশ শুরু করল। কিন্তু বলবে কী? দিনরাত ওই মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে মনটা এমন বিকল হয়ে গেছে যে কথা বলার জন্য মুখ খুলতে গেলেই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলতে লাগল: 'দাদা, তুমি যাওয়ার আগে একটা উপায় ক'রে দিয়ে যাও। ঘরের বাইরে আর মুখ দেখানো যাচ্ছে না। এই মেয়ের জন্য যে অপমান সহ্য করেছি তাই কি যথেষ্ট নয়? গঙ্গার কাছে আমি কিছুই বলতে পারি না। গণেশটা এসে এসে আমায় এমন সব কথা শুনিয়ে যায় যে তার কী বলব? ওর কাছেও আমি মুখ খুলতে পারি না। আমার অদিষ্টটা দেখলে? এইরকম একটা মেয়ে ও ছেলের মা হয়ে কোনোটাকে নিয়ে একটু সুখ পেলাম না। লোকের কথা শুনে, অপমানিত হয়ে— এরকম জীবনের কী প্রয়োজন?'

কথা বলতে বলতে মায়ের মনে দুঃখ বেড়ে যায়, কথা অস্পষ্ট হয়ে আসে, অবশেষে নিরুপায় হয়ে কাঁদতে থাকে। বিষম কান্না। দাদা বেঙ্কটরাম আইয়ার হাতে পেপারটা নিয়ে নীরবে বোনের দিকে তাকিয়ে রইল। কনকের দুর্দশায় তার দাদার মনে আপসোসের সীমা নেই। কিছু একটা সান্ত্বনা দিতে হবে, তাই বলল— 'শোন্, তুই কাঁদছিস কিসের জন্য? কান্নাকাটি, হা-হুতাশ ক'রে কী হবে? কাঁদলেই কি কপালের লেখন বদলানো যায়?'

বুকের ওপর হাত দু'খানি রেখে কনক কাঁদো কাঁদো সুরে বলল— 'কী একবার বুদ্ধি বিগড়ে গিয়ে কিছু একটা করে ফেলেছিল। তবু তো আবার মাথা উঁচু ক'রে বলতে পেরেছিলাম— আমার মেয়ের মতো কটা মেয়ে আছে?'

বেঙ্কটরামের এমন বিশ্বাস নেই যে তার বোন-ঝিকে বলে বোঝাতে পারবে, কাজেই সেও অনেকটা অসহায়ের মতো উত্তর দিল— 'কী করতে পারি, বল্। আগের মতো কি শিশু আছে এখনও? ধর, ওর কাছে ভালো ভালো কথা বললে বলবে— ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারপরেও ও নিজের পথে একগুঁয়ে হয়ে থাকলে আমরাও আমাদের পথ দেখব...।'

'তা বলে কি মেয়েটা আমাদের মাথা ডুবিয়ে দেবে? ভেবে দেখো, ওর জন্যই কত কষ্ট ক'রে বাড়ীঘর ছেড়ে কত লোককে শত্রু ক'রে ওকে নিয়ে চলে এলাম। তুমি কত সাহায্য করলে। এই কি তার প্রতিদান? তোমার ওপর শ্রদ্ধা কই?

কৃতজ্ঞতা কই ? এই অন্যায়ের কৈফিয়ত মানুষের কাছে না দিলেও চলতে পারে, কিন্তু দেবতার কাছে চলে না। ভগবানই ওর কাছে কৈফিয়ত চাইবে।' এইভাবে কনক যখন আত্মহারা হয়ে দুঃখে ও কান্নায় গলার স্বর উঁচিয়ে কথা বলছিল, দাদা বাধা দিয়ে বলল : 'এই ছাখ কনক ! ও-সমস্ত কথা বলতে নেই। পেটের মেয়ে তোর, ভুল করলে মারতে পারিস, শাস্তি দিতে পারিস, কিন্তু শাপাশাপি করতে নেই…' এই বলে বোনকে শান্ত করল।

'তুমি তো বললে। কিন্তু আমি কী করব ? গায়ে জ্বালা ধরে যায়। আমি কী পাপ করেছিলাম গো যে, দিনের পর দিন এই সমস্ত কাণ্ড চোখের ওপর দেখতে হচ্ছে ? এই তো আটটা বাজতে চলল। এক্ষুণি আসবে। তুমিই দেখো না। সেই লোকটা আর তার মুখটা… 'এখনই দেখো না কেন, মুখে আগুন ধরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখলে তোমারও হাড় জ্বলে যাবে বলছি।' এই পর্যন্ত বলে তার পরে দাদার একটু কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বেশ গোপনে বলল : 'তাও যদি আমাদের জাতের হত, ভাবনা ছিল না। বিয়ে করেছে করুক। ওর প্রথম স্ত্রীর হাতেপায়ে ধরে ওর হাতেই দিতাম মেয়েটাকে। এই হতভাগাকে দেখলেই মনে হয় কোনো ছোটো জাতের লোক। মেয়েটাও দিনে দিনে কেমন বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যাচ্ছে দেখেছ ? তুমি বললে কিনা ওর মতিবুদ্ধির কোনো স্থিরতা নেই। দেখো, সেই বারো বছর আগে মেয়েটার এই ভয় ছিল যে ওর দাদা গণেশ কী বলবে। এখন আর কী ? তুমি একটু ওকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বোলো। আমি ভেবেছিলাম, কাল রাতে তুমি আরও কঠোরভাবে ভৎসনা করবে। তা তো করলে না।… এই তো এখুনি আসবে— সঙ্গে সঙ্গে নচ্ছারটাও আসবে। তোমাকে বলছি তুমিই এ বাড়ীর কর্তা, মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেছে কে ? তুমিই। সেই অধিকারেই তুমি বলব। লোকটাকে এই বলে শাসিয়ে দেবে— সে যেন আর এ বাড়ীর সদর দরজায় পা না দেয়। গঙ্গাকে এমনভাবে বকবে যাতে সে বুঝতে পারে যে তার এই সমস্ত চালচলন সমস্ত মানমর্যাদা নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। লোকটা বুঝি ভেবেছে— এ বাড়ীতে কোনো পুরুষ মানুষ নেই। তুমি যদি ভর্ৎসনা করে দাও, দেখবে বাছাধন এদিকে আর ফিরে তাকাবে না।' এইভাবে কনক মনের ঝাল মিটিয়ে দাদার কাছে বলতে লাগল।

বোনের বোকামি দেখে বেঙ্কটরাম মনে মনে হাসল। কিছুক্ষণ চোখ দুটো বন্ধ ক'রে চিন্তা করল। তারপরে একটু স্মিতহাস্যে চোখ খুলে একবার কনকের দিকে তাকিয়ে কিছু-একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাবে, এমন সময়ে বাইরে গাড়ী থামার শব্দ শুনে দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইল. কথা আর বলা হল না। কনক ভিতরের দিকে চলে গেল।

মর্নিং ওয়াক্ শেষ ক'রে ফেরার সময়ে উনি 'ড্রাইভ-ইন' হোটেলের দিকে

গাড়ী ঘোরাতেই আমি 'না' বলে উঠলাম। অবশ্য আমাদের ওরিজিন্যাল প্ল্যান ছিল তাই— ভ্রমণ শেষ ক'রে হোটেলে কফি খাওয়া। কিন্তু মঞ্জু আজ প্রথম দিন দিন আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিল, তাকে সদর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া দেওয়া ঠিক হবে না। কাজেই আমি প্রোগ্রাম পালটে দিয়ে বললাম, 'আমাদের বাড়ীতে গিয়ে সকলেই একসঙ্গে কফি খাব। উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'তা বেশ, তা বেশ।' মঞ্জুরও আমাদের আমাদের বাড়ীর ভেতরটা দেখবে বলে ভারি কৌতূহল মনে হল।

আমরা যখন এসে পৌঁছলাম, তখন মামার কাছে দাঁড়িয়ে মা কতক্ষণ ধরে কত কথাই বলছিল, হঠাৎ গাড়ীটা দেখেই মুখটা ঘুরিয়ে ভিতরে চলে গেল। কী কথা বলছিল এতক্ষণ? কী আর বলবে? ঘুরে ফিরে সেই আমারই কথা।

মামা হাতের পেপারটা ভাঁজ করে এই জেণ্টলম্যান-এর অভ্যর্থনার জন্য ঠে দাঁড়াল। উনি আমার বাড়ীতে একজন নতুন লোক দেখতে পেয়ে এক মুহূর্ত একটু সংকোচ বোধ করলেন। ওঁর এই অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমি ধীরে ধীরে যেন উনিই কেবল শুনতে পান এইভাবে বললাম: 'আমার মামা, দেশ দেশ থেকে এসেছেন।'

মামা এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন সে আমার এবং ওঁর সম্পর্কে কিছুই জানে না, যেন সে কোনো বিয়েবাড়ীর সদরে থেকে হাসিমুখে অতিথি-অভ্যাগতদের স্বাগত-সুস্বাগতম্ করছে। আমি মামার কাছে ওঁর পরিচয় দিয়ে বললাম: 'মামা, ইনি আমার ফ্রেণ্ড্ মিস্টার প্রভাকরন্। আর এই হল ওর মেয়ে মঞ্জু।'

মামা বেশ খুশী হয়েই ওঁদের আদর-অভ্যর্থনা ক'রে বলল— 'আসুন, আসুন।' মঞ্জুর বিষয়ে প্রশ্ন করল— 'মেয়ে আপনার কলেজে পড়ে? বেশ, বেশ।' তারপরে সকলকে বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল— 'বসুন, বসুন।' আমি এক ফাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে কফির কথা বললাম। মুখে কোনো কথা না বলে সে কফি তৈরী করতে লাগল।

তারপরে আমি বড়ঘরে এসে মঞ্জুকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলাম, মামা ও উনি মর্নিং ওয়াকের উপকারিতা নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, উনি পাঠ-শালার ছাত্রের মতো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বসে মামার সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন।

মঞ্জু আমার ঘরে এসে আমার বই-এর আলমারি দেখতে দেখতে বলল— 'আপনাদের বাড়ীটা আমার খুব ভালো লাগছে! এরকম ছোট্ট বাড়ী, ছোট্ট রুম আমার খুব পছন্দ। আপনি কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন।... আচ্ছা, আপনি বুঝি খুব পি. জি. ওডহাউসের লেখা পছন্দ করেন? আপনার মতো সুশিক্ষিতা ওডহাউস পড়েন মনে হয় নি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' 'আমি ভেবেছিলাম আপনি শুধু সীরিয়াস্ বই পড়তে ভালোবাসেন।' আমি একথার কোনো উত্তর দিলাম না! মঞ্জু হাতে একখানি বই নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই

পড়তে আরম্ভ করল। আমি বললাম— 'তোমার দরকার হলে তুমি বইটা নিয়ে যেয়ো-না।'

'থ্যাঙ্কস্' বলে মঞ্জু বেশ খুশী মনে বইটা বন্ধ করে বলল— 'আপনার কাছে যে এত বই রয়েছে তা আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি।' এই বলে সে ধপ ক'রে আমার খাটের উপর বসেই 'আই অ্যাম সরি' বলে উঠে পড়ল।

'নো, নো! ইট ইজ অলরাইট!' এই বলে মঞ্জুকে আমি খাটের ওপর বসালাম। বললাম— 'আমিই কেবল রোজ রোজ তোমাদের বাড়ীতে যাব! এর পরে তুমিও এখানে আসবে! অনেক গল্পগুজব করা যাবে দুজনে মিলে।' 'ও ইয়েস'— এই বলে মঞ্জু আবার বইটা খুলল।

এই সময়ে কফি রেডি হয়ে এল প্রায়। কফি তৈরি হওয়ার মতো শব্দ শোনা যাচ্ছে— চায়ের পটে চামচ দিয়ে চিনিটা নেড়েচেড়ে মেশাবার শব্দ। আমি ভিতরে গিয়ে দেখি মা কফি ঢেলে গেলাসগুলো সারি সারি সাজিয়ে রেখেছে। আমি সেগুলি ট্রে-তে তুলে রাখলাম। জিজ্ঞেস করলাম— 'মামার জন্য হয় নি?'

মা বলল— 'এই তো এইমাত্র সে খেয়েছে।'

'ঠিক আছে। আর এক গেলাস দাও তার জন্য।' সব গেলাসগুলো বসিয়ে থালাখানা হাতে তুলে আমি বড় ঘরে এলাম। মনে হচ্ছিল কারা যেন আমার সম্বন্ধ দেখতে এসেছে আর আমি তাদের চা পরিবেশন করছি— কথাটা ভাবতে নিজেই মনে মনে হাসলাম।

ইতিমধ্যে মঞ্জুও আমার ঘর থেকে বেরিয়ে বড় ঘরে এসে বসেছে। 'আচ্ছা, মা কেন বাইরে না বেরিয়ে রান্নাঘরটার মধ্যেই বন্ধ হয়ে আছে?' এই কথা ভাবতে ভাবতে মঞ্জুর পাশে সেই সোফার ওপর বসে কফি খেতে লাগলাম।

ওদিকে মনে হচ্ছে মা রান্নাঘরের দরজার পাশে কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। এদের সঙ্গে মা যে আলাপ-পরিচয় করতে চায় না সে তো সহজেই বোঝা যায়। মায়ের ধারণা মামা এখন আমাদের কাছে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে এবং সেই সব প্রশ্নোত্তর শোনার জন্যই মা ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি— মামা এখন কোনো প্রশ্নই জিজ্ঞেস করবে না। এখন কেন? কখনোই মামা ওকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে বলে আমার মনে হয় না। সাধারণ বিষয়ে দু-চারটে কথা হবে মাত্র।

আমি মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে গোটা বাড়ীটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। প্রথমে গেলাম ওপরে, ব্যালকনিতে দাঁড়ালে পাড়ার সমস্ত বাড়ীগুলিই চোখে পড়ে। আমি এখানে দিনে দুপুরে কখনো আসি না। মঞ্জু বেশ খুশী মনে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, এই বয়সে সকলের মনেই খুব খুশী-খুশী ভাব।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সাড়ে আটটা বাজে বোধ হয়। এখনও তো আমার

চানটান হল না। আজ সোমবার। অফিসে যেতে হবে না? মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলাম— 'আজ তোমার কলেজ নেই মঞ্জু?' পাশের একটা বাড়ীতে বড়ি দিচ্ছে দেখে মঞ্জু সেই দিকেই চোখ রেখে বলল— 'যাব দুপুরবেলায়।'

'দুপুরে কেন?'

দুপুরে টেস্ট্। এখন পর্যন্ত কিছুই প্রিপেয়ার করতে পারি নি। গিয়ে পড়তে হবে।' বলে মঞ্জু রওনা হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম— 'কাল সারাটা দিন বসে কী করলে?' জিজ্ঞেস করেই ভাবলাম— আমার কি মঞ্জুকে এই প্রশ্ন করবার মতো এতটা অধিকার আছে?

মঞ্জু বেশ বিনীতভাবে উত্তর দিল— 'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তো আপনি ছিলেন, তাই না? তারপরে পড়ব বলে গিয়ে বসলাম। এমন সময়ে মা রওনা হল সিনেমা দেখবে বলে। 'কাল পড়াশুনো হবে' বলে আমিও সঙ্গ নিলাম মায়ের। আজ সকালে এই তো এলাম মর্নিং ওয়াক ক'রে। আমি যাচ্ছি।' এই বলে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। আমিও তার পিছনে পিছনে এলাম। 'মঞ্জু, মিট মাই মাদার' বলে তাকে রান্নাঘরের দিকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কী জানি এই কোন্-না-কোন্ জাতের মেয়েটা রান্নাঘরেই ঢুকে পড়ে এই আশঙ্কায় মা দরজায় যেন পথ আটকাবার জন্যই এসে দাঁড়াল। মঞ্জু খুব ভয়ভীতি সহকারে হাত জোড় ক'রে মাকে নমস্কার করল। মা একটু কষ্টে হাসি হাসল।

'বাবা! যাবে না কি? আমার যে টেস্টের পড়াশোনা আছে।' মঞ্জু কখন এসে ডাক দেবে এই অপেক্ষাতেই যেন বসেছিলেন উনি। মামা ওদেরকে বিদায় দিতে গিয়ে বলল— 'আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই আনন্দ হল।' আমি তাকিয়ে ছিলাম মায়ের মুখের দিকে। মামা যে সারাক্ষণটা এইভাবে কাটিয়ে দেবে মা যেন তার কিছুই বুঝতে পারল না! এই দশটি মিনিট ধরে মামা ওকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্টাডি করেছে। এই কারণেই সে বলেছিল যে ওর সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার।

সন্ধ্যাবেলায় অথবা রাত্রিতে মামা আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাদাভাবে কথা বলবে মনে হয়। তা সে যে উদ্দেশ্যেই বলুক-না কেন, তাতে আমার সুবিধাই হবে।

ওদেরকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমি কম্পাউণ্ড গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। গাড়ী স্টার্ট দেওয়ার সময়ে উনি আমাকে বললেন— 'রেডি থেকো। দশটার সময়ে আসব।'

মঞ্জু হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেল! আমি গেট বন্ধ ক'রে হুকটা লাগিয়ে আসব এতক্ষণ মামা সদরেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে ফিরতে দেখে তাড়াতাড়ি আমার আগেই ভিতরে এসে বড় ঘরের মধ্যে বসে আমার কাছে কিছু একটা বলবার উদ্যোগ করতেই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। অন্য কোনো কারণে নয়,

কারণটা এই যে. এখন যদি মামা কথা শুরু ক'রে দেয় তবে দশটার মধ্যে আমি তৈরি হতে পারব না। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি স্নানের জন্য তৈরি হই। মামা তার কথা শুরু ক'রে দিলেও আমি তার মধ্যে নিজেকে না জড়িয়ে এড়িয়ে চলার জন্য আত্মগোপনকারীর মতো বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

মা রান্নাঘরে রান্নার আয়োজন করছে। এদিকে বড়ঘরে মামার কানে যাতে পৌঁছায় এমনিভাবে চেঁচিয়ে কথা বলছে মা। গলা প্রায় ভাঙবার উপক্রম। এত উচ্চস্বরে মাকে কোনোদিন কথা বলতে শুনি নি। কখনও কখনও আমার দাদা গণেশ এলেও মায়ের গলা চড়ে যায়। কিন্তু মামা যখন থাকে তখন তার ওর ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে বলেই মা চেঁচামেচি করে না। কিন্তু আজ করছে। মামা যে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসঙ্গে বসে কফি খেয়েছে এটা মায়ের সহ্য হয় নি। মায়ের চিৎকার সমানে চলেছে। আমি গায়ে জল ঢেলে সাবান টাবান না মেখে মা কী বলছে সেই দিকে কান পেতে রইলাম।

মা বলে চলেছে: 'আমাকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে বলে যাও। ছেলেটাকে পেটে যখন ধরেছি সে দুটো ফেনাভাত না দিয়ে পারবে না। এই মেয়েটার জন্যই তো ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এলাম। আজ কোন্ মুখে গিয়ে সেখানে নিজের বলে দাবি করব? খালি হাতে গিয়ে গণেশের ওখানে উঠলে ওর বৌ কি আমাকে ছেড়ে কথা কইবে? গঙ্গাকে বড় করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, এখন যেন পঞ্চাশটা করে টাকা আমার মুখে ছুঁড়ে মারে— সেই কথাটা বলে যেয়ো দাদা। সম্ভব হলে গণেশের সঙ্গেই থাকব, না হলে অন্য কোথাও একলা থাকব! আমি কি এমনি ফেল্না নাকি যে এখন এইসব যার তার জন্য কফি ক'রে দেব? ঘরে-বাইরে মান-মর্যাদা তো আর রইল না। যার যার মানসম্মান তার তার কাছে। আমার আর কি মানসম্মান আছে? ইচ্ছে করে জিভটা টেনে বার করে মরে থাকি। এটা কি বেশ্যা বাড়ী নাকি জিজ্ঞেস করি। তোর যা খুশী ইচ্ছা তাই কর্ মা! আমি আর এ-বাড়ীতে এক মুহূর্তও না। তুমি আসবে. ভেবেছিলাম তোমার কথায় সব ঠিক হয়ে যাবে। বৃথা আশা। এখানকার ভাব-সাব দেখলে আর মুখ ভুলে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না? তুমি তো সন্ধ্যাবেলায় রওনা হয়ে যাবে, আমিই চিরকাল এখানে বসে এই সব কলকারখানা দেখি আর কি? তোমাকে আর আমার উপায় ক'রে দিতে হবে না। আমার পথ আমিই দেখব। এই বারো বছর ধরে মেয়েটা আমার ওপর যত অসম্মান চাপিয়েছে সব মুখ বুজে সহ্য করেছি। যত ভুল ও করেছে, তার কলঙ্ক আমার ওপর? আজ কত বছর হল একবার মুখ ফুটে 'মা' বলে ডাক দেয় না। ও বাড়ীতে এসে একটা কথাও কি আমাকে বলে? কিসের জন্য আমি এসব সহ্য করে ছিলাম? ও ভদ্র হবে. সৎ হবে এই আশায় তো। এখন ওর ভদ্রতার নমুনা দেখে এই রাস্তাসুদ্ধ লোক উপহাস করে! ওর যত-কিছু হম্বিতম্বি আমার কাছে। তুই অফিসার আছিস, আছিস। লেখাপড়া

শিখেছ, টাকা রোজগার করছ বলে তুমি যা খুশী তাই করবে নাকি ?'

মা সহজে থামবে না, কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে নেমেছে। আমার ওপর মায়ের ঘৃণাবিতৃষ্ণার আর শেষ নেই। ইচ্ছা হয়েছে ছেলের বাড়ীতে গিয়ে কিছু দিন থাকবে। এখন তাকে বোঝাতে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আর কিসের জন্যই বা তাকে বুঝ দেব ? সে তো বলে বেড়াবে আমিই নাকি তার অসম্মান করেছি। আমার কাজের সমস্ত কলঙ্ক আমিই বহন করব। আমার সম্পর্কে আমার মা যে কত লজ্জাকর ভাবে কথাবার্তা বলে, ভাবনা চিন্তা করে। আমার মধ্যে কী বেশ্যাবৃত্তি সে দেখেছে ? খোয়াবার মতো মান মর্যাদা আর আছে নাকি ? আমি তার কোন্ মর্যাদা নষ্ট করেছি ? এই ত্যাখ সেই ত্যাখ ক'রে বারোটা বছর যেন ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। জীবনের প্রতি হতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। আর কত বছর এভাবে বসে থাকব ? মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে আমার জীবনটা কি এইভাবেই কাটবে ? আমাকে একটি মেয়ে হিসেবেই ওরা কেন আমার কথা ভেবে দেখবে না ? উনি আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কত না চিন্তাভাবনা করেন। অথচ যিনি আমার জন্মদায়িনী মা, আমার সম্পর্কে তাঁর কিছুমাত্র চিন্তা নেই কেন ? আমি যতদিন পুরোপুরি সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করছিলাম ততদিন মা বেশ সুখে শান্তিতেই ছিল। এই আজকালই এমন কী হল ? এখনও যে কিছুই হয় নি সেকথা আমি মায়ের কাছে কেন প্রমাণ করতে বসব ? সত্যি যে ওঁর সঙ্গে আমার কিছুই হয় নি এখন কি সেইটেই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ? ন্যায়ত দেখতে গেলে আমি ওর উপপত্নী— কনকুবাইন ? এই আমার যোগ্য নাম। আমার মায়ের চোখে এটা গ্রহণযোগ্য মনে হবে তা আমি বলছি না। কিন্তু আমিই বা দিন কাটাবো কেমন ক'রে। এই হল আমার বিধি-নির্দিষ্ট জীবন। এই জীবনকে মেনে নিতে পারো ভালো, যদি না পারো তবে চলে যাও তোমরা আমাকে ছেড়ে— একথা বলার কোনো দরকার আছে কি ? সত্যি যদি সেরকম কিছু ঘটে, তাহলে আমাকেও সেইভাবে বলতে হবে। কিন্তু সত্যি সত্যি সেরকম কিছু ঘটছে কি না ঘটছে মায়ের সমস্যা তা নয়। ইট্ ইজ অল্ রাইট। আমার অদৃষ্টলিপি বোধ হয় এই যে— জীবনে আমার কেউ থাকবে না, চলতে হবে একাকীই। তবে তাই হোক, লেট মি অ্যাকসেপ্ট্ দিস চ্যালেঞ্জ। রাগের কথা নয়, দুঃখের কথা নয়, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এই সিদ্ধান্তই যথার্থ বলে মনে হয়। আমার জীবনটাকে আমি বড় জটিল ক'রে ফেলেছি। কারণ আর তো কোনো কিছুই করার উপায় ছিল না। এই জটিলতা আমি ইচ্ছে করেই সৃষ্টি করেছি। এবং এতে আমার এক প্রকার তির্যক আনন্দের উপলব্ধি জন্মে। কিন্তু অন্য সকলকে যুক্ত ক'রে মাকে আমার কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না। মায়ের মনের কথা, তার রাগ দুঃখ আমি বুঝতে পারি, তার মূল্য দিয়ে থাকি। মায়ের ওপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি আছে বলেই তো সে যেখানে খুশী যেতে চাইলেও আমি তাতে সায় দিতে পারি না।

স্নান শেষ করে আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। মা তখনও কথা বলে যাচ্ছে। আমি আমার ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় পরে নিলাম। বেলা তখন সাড়ে নটা। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মামাকেও খেতে ডাকলাম। দুজনেই এক-সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। মা কোনো কথা বলছে না। মামাও মৌন হয়ে আছে।

খেয়েদেয়ে হাত ধুতে গিয়েছি, মা আবার শুরু করল তার পাঁচালী। আমি তার দিকে একবার ফিরে তাকালাম। তার চোখমুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছে। আমারও কান্না এসে যাচ্ছে, কিন্তু সামলে নিলুম কোনোমতে। একে 'মা' বলে ডাকলে কী হবে? ভেজা হাতটা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলাম!

আমার মন এখন ধীর, সুস্থ ও নির্মল। মায়ের ওপর এখন আর আমার রাগও নেই দুঃখও নেই। আচ্ছা এতবছর কাল কেন আমি একে 'মা' বলে ডাকি নি? এই ভেবে কি যে আমার মাকে আমি 'মা' বলে ডাকার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছি? এখনই আমি একে 'মা' বলে ডাকব। এই যে ডাকছি— 'মা'। মা আমার দিকে মাথা তুলে তাকালো। তার সমস্ত শরীর বুঝি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, চোখ থেকে নেমে এল জলের ধারা!

'মা, কেন বৃথা কাঁদছ তুমি? তোমার ইচ্ছামতো তুমি যা খুশী তাই করো। পঞ্চাশ টাকা কেন, মাসে তোমাকে একশো টাকা ক'রে দেব। তুমি যদি চাও তোমার ছেলের ওখানে গিয়ে থাকতে পারো। অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারো। যখন তোমার আসার ইচ্ছে হবে চলে এসো! এটা তোমারই বাড়ী।' মাকে এই কথা বলতে মা মুখ ঢেকে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। হাত দুটো বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল: 'এই কি তোর ভালো মনে হয়েছে? এই কি তোর ন্যায়ধর্ম?'

আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম— 'ভালো কি মন্দ জানি না। তবে আমার যা ন্যায্য মনে হয় তাই করি।' মা চিৎকার করে উঠল— 'ঐ যে শয়তান, ও তোকে কী ওষুধে বশ করেছে বল্।'

'মা, খারাপ কথা বলে মুখ খারাপ কোরো না'— এই বলে আমি বাইরে চলে এলাম। সদরে গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে, হর্নের আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম— বেলা তখন দশটা।

20

এক সপ্তাহ হয়ে গেল মা গণেশের বাড়ীতে চলে গেছে। গণেশ এসে মাকে নিয়ে যায়। সেদিন বাড়ীতে একটা কাণ্ড হয়েছিল বটে।

গণেশ এগিয়ে এসেছিল আমাকে মারবার জন্য। এমন সময়ে মা এসে

ঠেকিয়ে ওকে টেনে নিয়ে যায়। 'গণেশ যদি মারতে চায় মারুক-না। বেশ করে মার দিক। ওর হাতে কি আমি মার খাই নি নাকি? মারবার অধিকার নেই নাকি ওর?' এই সব ভাবছিলাম আমি, একটি কথাও না বলে, হাত দুটো বুকের ওপর রেখে! যখন ছোট ছিলাম আমি, তখন আমাকে খেলতে যেতে দেবে না বলে মারতে আসত। বড় ভাই না? আমি কাঁদতে কাঁদতে গালি দিয়ে বলতাম— 'যা তুই এখান থেকে।' সেই সব কথা নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। ব্যাপারটা এই :

অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি— মা, মামা ও গণেশ যে-সব কথাবার্তা বলছে তার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না আমার। কোনো অজানা ভাষার সিনেমা দেখার মতো কেবল ভয়ংকর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আর বুঝতে পারছিলাম তাদের ক্রোধ, ক্ষোভ ও জ্বালা। আমি কিছুই বললাম না। যা ঘটবার ঘটে যাক ভেবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার কিন্তু দুঃখ বা রাগ বা কান্না কিছুই আসছিল না। তাদের রাগের কারণ আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলাম, তবু তার জন্য আমার মনে এতটুকু দুঃখ নেই।

আমি অফিস থেকে ফিরে সদরে পা দিতেই গণেশ এসে বড় ঘরে দাঁড়িয়েছে। মামা দেশে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি। কেবল আমার আসার অপেক্ষা করছে : আমি যে ট্যাক্সি ক'রে এসেছি, এই ট্যাক্সিতেই মামা স্টেশনে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য, ট্যাক্সি ফেরত দেওয়া হল। মনে হল এইসব গোলমালের মধ্যে সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাওয়াটা ঠিক নয় বলেই মামা ভেবেছে। আমার আরও মনে হল গণেশ আসার পর থেকে না বসে কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গলাবাজি করছে। মা কাঁদছে আর বড় একটা কাপড়-চোপড়ের পেটী শক্ত ক'রে বাঁধছে। কোনো গান গাওয়ার মতো ভঙ্গি ক'রে মা যখন কাঁদতে কাঁদতে পোঁটলা বাঁধছিল— সমস্ত দৃশ্যটা দেখে দেখে আমার পেটের মধ্যে যেন কেমন করে উঠছিল। আমি ভিতরে এসে মায়ের দিকে চেয়ে রইলাম।

পাষণ্ড গণেশ আমার দিকে ফিরে দাঁতে দাঁত ঘষে কী যেন চিৎকার ক'রে বলল। কিছুই আমার বোধগম্য হল না। কেবল বোঝা গেল তার রাগটা। মা মুখ মুছতে মুছতে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল। কিছু বলল সে, কিন্তু মায়ের কথাও বুঝলাম না। এই মুহূর্তে আমার যে কী ভাবে কী করা উচিত তাও কিছু মাথায় এল না। আমি কেবল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এত বছর যাকে 'মা' বলে ডাকিনি, আজ সকালেই তাকে ঐ নামে ডেকে-ছিলাম, আর আজই কি সেই মায়ের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে?— দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম। একবার কি জিজ্ঞেস করব— 'মা, আমাকে এই ভাবে একলা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছ তুমি?' একবার কি কেঁদে বলব 'মা, আমাকে ছেড়ে কোথাও যেয়ো না তুমি।' এরা সকলেই আশা ক'রে

আছে আমি হয়তো এই কথাই বলব। কিন্তু বললেই সব সমস্যার সমাধান হবে কি? এরপরেই এরা আমার ওপর শর্ত দিয়ে বলবে— ওঁর সঙ্গে আমি যেন আর দেখা না করি, ওঁর বাড়ীতে যেন আমি না যাই, উনি যেন আমাদের এখানে না আসেন ইত্যাদি।

এই সব কথাই ভাবছিলাম। মা যে আমাকে ছেড়ে যাবে সেটা আমার পক্ষে মোটেই আনন্দের বা সুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু এ-কথাটা বুঝলাম যে আমাকে ত্যাগ করাটাই এখন মায়ের পক্ষে যুক্তিযুক্ত কাজ। মা চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে, হলেও সে কষ্ট আমি সহ্য করব। মায়ের চোখের সামনে আমি ওঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াবো—এতে মায়েরও কি অমর্যাদা হবে না? এই ব্যাপারে মাকেও জড়িয়ে অন্য লোকদের স্বতই মনে হবে যে মায়ের চোখের ওপর গর্হিত কাজ করা হচ্ছে।

এই সব কারণেই ওদের কোনো যুক্তি আমি কানে তুলি নি। 'মা, তুমি যেয়ো না' বলে মাকে ঠেকাই নি। কথাটি না বলে আমি আমার ঘরে চলে গেলাম। বড় ঘরে তখন গণেশের চিৎকার সমানে চলেছে। মামা তাকে ধমক-ধামক দিয়ে শান্ত করছে বলে মনে হল।

কিছুক্ষণ পরে আমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এলে মামা আমাকে বলল, 'গঙ্গা, গণেশ যা বলছে তাতে তো মনে হয় তুমিই যেন তোমার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ। তোমার মা তো সকাল থেকেই যাব যাব ক'রে কাঁদছে। এখন তো তুমি গণেশকে একথা বলতে পারো— 'মা এখানেই থাকবে। অতঃপর আর কিছু ঘটবে না।' এইভাবে মামা আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করল।

আমি ঠোঁটটা কামড়ে ধরে একবার মামার দিকে তাকালাম। মা যেন মামার কথায় আপত্তি প্রকাশ করছে এইভাবে পোঁটলা কাঁধে তুলে রওনা হতে উদ্যত হল। আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে ডেকে বললাম— 'মা, তোমাতে আমাতে কিসের ঝগড়া? কেন তুমি রাগের মাথায় এত তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ? আমার ঘরে এসো। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।' এই বলে আমি মায়ের হাত ধরে আমার ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে এলাম। তাকে কিছুই বলতে হল না। শিশুর মতো আমার মুঠোর মধ্যে হাত রেখে নিঃশব্দে আমার সঙ্গে এল।

গণেশ কী যেন একটা কথা বলে মাকে ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল। মা তার কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই মা আমার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলাম। দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পরে আমার মনে হল আমরা দুজন যেন একটা স্বতন্ত্র জগতে এসে পড়েছি যেখানে ভালো-মন্দ মান-অপমান স্তুতি-কলঙ্ক সব-কিছু অতিক্রম ক'রে আমরা দুটি রমণী মাত্র— মা ও মেয়ে।

আমার মা, সে কি প্রথমেই মা হয়ে জন্মেছিল? সেও কি একদিনমেয়ে ছিল না? একটি মেয়ের অবস্থা তার ভালো মন্দ— এসব কি মা বোঝে না? এ সব কি তাকে বলে দিতে হবে? এ সব কথা কি বলা যায়? তাও এক মেয়ে বলবে এমন এক মায়ের কাছে যে না বললে কিছুই বুঝতে পারে না! আমি মায়ের দিকে তাকালাম, মাও আমার দিকে চেয়ে রইল। দুজনেরই চোখ ছলছল করছে।

মায়ের পিছন দিকে দরজা বন্ধ! মা এমনভাবে কাঁধে পোঁটলাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে আমার কথা শেষ হওয়া মাত্রই সে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যাবে! অথচ মায়ের কাছে আমার যত কথা জমা হয়ে আছে তা একটা পুরো দিন বসে বললেও শেষ হবে বলে মনে হয় না। মা মুখে কিছু বলছে না বটে, কিন্তু তার দাঁড়াবার ভঙ্গী যেন বলে দিচ্ছে— 'কী বলবি বল্।'

'মা, আমি তোমায় তাড়িয়ে দিচ্ছি না মা, তবে আমি ভাবছি তুমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকলে তোমার মর্যাদা হানির ভয় নেই। আমি যে একথা বলছি তুমি আবার এর অন্য কোনো অর্থ কোরো না। আমি কোনো খারাপ পথে যাব না মা। আমি ইচ্ছে করেই এরকম নাম নিয়েছি। পত্নী না হতে পারি, একটা উপপত্নী হওয়ার মতো নামও কি আমার জীবনে দরকার নেই? আর কেউ না করুক তুমি আমার মা, তুমি অন্তত আমার কথা বিশ্বাস করবে বলেই বলছি— প্রভাকরনের সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক থাকবে বলেই স্থির করেছি। স্বামী-স্ত্রীর জীবন আমার কাছে অর্থহীন মা! সেরকম জীবন যাপনের অধিকার তাঁরও নেই আমারও নেই। এ ভাবে না থেকে অন্য কোনো ভাবে থাকা— যেমন তোমার সঙ্গে আছি— আমার কাছে ঠিক বলে মনে হয় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তুমি অন্য কোথাও গিয়ে কারও গলগ্রহ হয়ে থাকবে। এই বাড়ী, এই আমি, আমার রোজগার— সবই তোমার মা! তুমি কারও মুখপেক্ষী হয়ে থেকো না মা। যখনই তোমার মনে হবে, তুমি এখানে এসে তোমার ইচ্ছামতো যে-কোনো জিনিস নিয়ে যাবে। গণেশ আজ আমার বিরুদ্ধে রাগের মাথায় তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছে বটে, কিন্তু মা এই কথাটি মনে রেখো, আমারই জন্য যে তুমি ওদের সঙ্গে শত্রুতা করে চলে এসেছিলে সেকথা খোঁচা দিয়ে দিয়ে বলতে কসুর করবে না। গণেশ না বললেও বৌদি তো বলবে। গণেশও বলবে দেখে বৌদি তাকে দিয়ে বলাবে। দাদা বৌদি বললেও দোষ নেই কারণ আমি তো এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু তাদের কথায় তুমি দুঃখ পাবে বলেই বলছি। আমার ওপর রাগ ক'রে বা আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি আমার ইচ্ছামতো থাকি বলে সেটা তোমার পছন্দ নয়, তাই তুমি তোমার ছেলের বাড়ীতে যাচ্ছ। এতে কান্নার কী আছে, ঝগড়া চেঁচামেচিরই বা কী আছে? যাওয়ার সময়ে তুমি খালি হাতে যেতে পারো না। দাদার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে

আছে'— এই বলে আলমারী থেকে টাকা পয়সা বের ক'রে মায়ের হাতে দিলাম। কত দিলাম সে আর গুণে দেখি নি, মায়ের কাছে ভেবে ভেবে কথা বলতে বলতে প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর লেগে গেল।

মা আমার কোনো কথারই জবাব দেয় নি। কেমন যেন বিভ্রান্ত চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কথা শুনছিল। তারপরে কী জানি কী ভেবে চোখটা জলে ভরে এল। আমার দেওয়া টাকা পয়সা যথাস্থানে রেখে দিয়ে এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যার অর্থ হল : 'এই তো তোমার কথা ? না আরও কিছু আছে ?'

একটু পরে আমি বললাম— 'মামা তার দেশে চলে যাচ্ছে যাক, তুমি তাকে কিন্তু বাধা দেবে না। আমার পক্ষে রান্নাবান্না ক'রে অফিসে যাওয়া খুব ঝামেলার ব্যাপার। মামার দিকে দৃষ্টি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে এখান থেকে বিদায় দিয়ে তারপরে তুমি যেয়ো। কোথায় আর যাবে— এই তো ট্রিপ্লিকেনে ? মামা এখানে এলে পরে আমি তোমায় খবর পাঠাব। তখন তুমি আসবে তো ?' এই কথা জিজ্ঞেস করতে করতে খুব সহজভাবেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

আমরা বেরিয়ে আসতেই গণেশ একেবারে মায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল : 'গজার কাছে আবার কী কথা এত ?' মা তার উত্তরে কিছু বলে ওকে ঠাণ্ডা করল। তারপরে বলল— 'দাদা দেশে যাচ্ছে, সেকথাটা ভুলে গিয়ে আমরা কি পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে রওনা হতে পারি ? একটু দাঁড়া, তোকে কফি তৈরি ক'রে দিচ্ছি। দাদা তুমি খেতে এসো।' মায়ের গলাটা যে কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেল তা কেবল আমিই বুঝতে পারলাম।

বাঁধা পোঁটলাটা সোফার ওপর পড়ে আছে। মামা খেতে গেল। মামা এখন খাঁচার বাঘের মতো শান্ত হয়ে আছে। আমি এ ব্যাপারে যে কী করব তা সে এখনও বুঝতে পারে নি। তাছাড়া আমার মনে হয় প্রভাকরন্-এর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের পরে মামার মনে কী রকম একটা কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে। মামা এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে এই ব্যাপার নিয়ে আমার মায়ের মতো রাগ করা অথবা ঝগড়া করায় কোনো লাভ নেই। সেই জেণ্টলম্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায় নি মামা। মা যে আমায় ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছে, মামার কাছে ব্যাপারটা যেন ভালোই মনে হচ্ছে। তা না হলে সে অন্তত দু-চার কথা বলে মাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করত। মামা সেরকম জোর দিয়ে বললে মা তা অগ্রাহ্য ক'রে যেতে পারত না। মামা বোধকরি মনে করেছে মা চলে গেলে আমি তো একা থাকব, সেইটেই মামার পক্ষে খুব সুবিধাজনক।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় মামা চলে গেল। যাওয়ার আগে আমার ঘরে এসে আমার

কাঁধ দুটোকে চেপে ধ'রে, আমি প্রণাম করতে নীচু হলে আমাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে আশীর্বাদ করার ভঙ্গীতে বলল— 'তুমিই খেলায় জয়লাভ করলে— ইউ হ্যাভ ওয়ন্ দি গেম্। কিন্তু সাবধানে থাকবে। তোমাকে অনেক কথা বলার আছে আমার। আগামী সপ্তাহে আমি আসছি। তখন বলব। এখন আসিগে। সাবধান. খুব সাবধান' এই বলে আমার গালে চিমটি কেটে বিদায় নিল।

আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মায়ের কাছে এসে বলল : 'তোমার মনের শান্তির জন্য কিছু দিন গিয়ে গণেশের ওখানেই থাকো। আমি শীগগিরই এই ব্যাপারটা দেখছি। গণেশের সঙ্গেই বা তোমার কিসের শত্রুতা। মেয়েও যেই ছেলেও সেই। গণেশ, আমি চললাম।'

মামা গণেশের সঙ্গে বেশি কথা বলল না। কারণ গণেশ মামার মানসম্মান রেখে কথা বলতে জানে না। সেই বারো বছর আগে গণেশ যখন আমায় ঘর থেকে বের ক'রে দেয় তখন মামা এসেছিল আমাদের নিয়ে যেতে। গণেশ তখন কী ভাবে যে অপমান করেছিল মামাকে।

মামার রওনা হয়ে যাওয়ার খানিক পরে মা ও গণেশও চলে গেল।

এই এক সপ্তাহ যাবৎ আমি নিঃসঙ্গ। আমি জয়লাভ করেছি বটে, কিন্তু তার ফলে পেয়েছি এই একাকিত্ব। একা একা থাকা খুবই কষ্টকর, সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আমি তো সব সময়ে একাই থাকি আমাকে নিয়ে। তাহলেও এই বাইরের একাকিত্ব, 'একাকী আছি' এই শূন্যতাবোধ কেমন যেন ভয়ভাব জাগিয়ে দেয়। এই ছোট্ট বাড়ীতে আমার ঘরখানিতে ঠিক মধ্য রাতে অন্ধকারে ঘূর্ণ্যমান পাখাটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে এই যে শুয়ে পড়ে থাকা— এই একাকিত্ব বড়ই শোচনীয়।

জানালা দিয়ে যে আলো আসছে তাতে দেখতে পাচ্ছি. সামান্য এক টুকরো ন্যাকড়া পাখাটায় আটকে গিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। সটান শুয়ে পড়ে সেই দিকেই তাকিয়ে রইলাম। আমার পাশে একটা লম্বা বালিশ, পায়ের দিকে আরেকটা। পাশের বালিশটার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মনে হল ও বুঝি আমারই শিশুসন্তান। হাসলাম একটু।

যদি আমি যে-কোনো উপায়ে একটি সন্তানের জন্ম দিই তাতে ক্ষতি কী? বয়স তো তিরিশ হতে চলল। আজ আমার মা বেঁচে আছে ঠিকই, কিন্তু কতদিন সে বেঁচে থাকবে? মায়ের পরে আমার কে আছে? আমি কার জন্য এত টাকা রোজগার করছি? গণেশের ছেলেপিলেদের জন্য? গণেশের ছেলেদের মধ্যে একজনকে পোষ্যপুত্র হিসেবে নিলে কেমন হয়! গণেশই বোধহয় রাজী হবে না আচ্ছা আমি যদি একটি ছেলের জন্ম দিই, কেমন হয়? আমি? ওঁকে দিয়ে?

ছি ছি !··· তা না হলে আর কী ভাবে ? শিশু আর সেক্স্‌ এই দুটো জিনিস যদি পরস্পর যুক্ত না হত, কত ভালো হত ! আজকাল তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর জোর প্রচার চলছে। এ তো তাই। সেক্স্‌ বস্তুটি আলাদা হয়ে থাকবে। তা দিয়ে সন্তান তৈরি হবে কি হবে না তারই নাম পরিবার পরিকল্পনা। অর্থাৎ সেক্স্‌ চাই, সন্তান চাই না। এ ব্যাপারে আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম : সেক্স্‌ চাই না, সন্তান চাই। এ কি সম্ভব ? কেন নয় ? নিশ্চয়ই এটা সম্ভব হতে পারে। এ যুগ কি সেই যুগ নয় যখন বিজ্ঞানের বলে সব কিছুই হচ্ছে ? নিঃসন্তান দম্পতীরা সেই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে পারে। একটি ইন্‌জেকশন দিয়ে গর্ভসঞ্চার করা যায়। জীবকোষ ভাণ্ডার তৈরি থাকবে। একটি কুমারীর দেহে সুই ফুটিয়ে সেই কোষ ঢুকিয়ে দিলেই হল। সেও আর পাঁচজনের মতো গর্ভধারণ করে যথাসময়ে সন্তানের জন্ম দেবে। সেরকম কিছু করলে··· এখানে বিশ্বাস করবে কি ? আমি যদি সেরকম কিছু করি তাতে কার কী ? তখনও লোকে এই কথাই রটাবে যে আমি এ সন্তান পেয়েছি প্রভাকরের অনুগ্রহে। রটাক না। আচ্ছা, সকলকে বোকা বানিয়ে দেওয়ার জন্য এই একটা কাজ নাকি ? ও, হাউ ফ্যান্টাস্‌টিক !···

···এই সব কত কী ভাবছি শুয়ে শুয়ে। এইভাবে একা একা ছ-সাত ঘণ্টা শুয়ে থাকতে হবে। তারপরে দুধওয়ালা আসবে, তার কাছ থেকে দুধ রেখে, মঞ্জু ও তার বাবার আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করে থাকব। তারপরে মর্নিং ওয়াক্‌। ফিরে এসেই তাড়াতাড়ি করে রান্না করা। পরন্তু একটা কুকার্‌ কিনে আনার পর থেকে রান্নার ব্যাপারটা আর কোনো প্রবলেম নয়— ম্যাটার অব মিনিটস্‌।

সেদিন সদর দরজায় তালা লাগিয়ে যখন মর্নিং ওয়াকে বেরুলাম, উনি জিজ্ঞেস করলেন— 'বাড়ীতে তোমার মা আছেন না ?' আমি বললাম, 'মা তার ছেলের বাড়ীতে গেছে।' কাল আবার জিজ্ঞেস করলেন— 'কোনো ঝগড়া হয়েছে নাকি ? তোমার মা কি রাগ করে চলে গেছেন নাকি ?' 'না, সেরকম কিছু নয়।' তবু উনি ব্যাপারটা বুঝলেন, বেশ চতুর লোক বলতে হবে।

আগামী রবিবার মঞ্জু ও তার বাবাকে আমাদের বাড়ীতে আসতে বলেছি। গত রবিবার, এমন-কি কালও আমি ওদের ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাল কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। পদ্মাকে কোনোদিন ঘরের বাইরে আসতে দেখিনি, অথচ কাল তাকে মাঝেমাঝেই বাইরে দেখা যেতে লাগল। কিন্তু আমার সঙ্গে কোনো কথা নয়, দেখলে একটু মৃদু হাসি মাত্র ! তাও বোধ করি ভদ্রতার খাতিরে। তার মুখ দেখে আমি এইটুকুই বুঝতে পারলাম যে, যে-কোনো কারণে হোক, আমাকে সে পছন্দ করছে না। পছন্দ করবেই বা কেন ? তখনই মনে হল— আমি রোজ রোজ এদের বাড়ীতে এসে এইভাবে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা ডেরা পেতে থাকি, তা

হলে সেটা ভালো নয়। তাই ভাবলাম— মঞ্জু ও তার বাবাকে আমাদের বাড়ীতে এনে আলাপ-সালাপ করা যাবে। তাই বললাম— 'নেক্স্ট্ সানডে আমাদের বাড়ীতে আমরা মীট করব। মঞ্জু তুমি আসবে কিন্তু।' মঞ্জু খুব খুশী হল আমার নিমন্ত্রণে।

উনি জিজ্ঞেস করলেন— 'এমনি এমনিই ডাকলে? নাকি ভোজ-টোজ আছে?' মঞ্জু বলল— 'বেশ তো, ভোজের দরকার হলে আমরা কোনো হোটেলে চলে যাব।' আমি বললাম— 'কেন? আমাদের বাড়ীতেই ভোজ হবে। আমিই সব তৈরি করব। মঞ্জু, উইল ইউ হেল্প মী?' মঞ্জু সানন্দে বলে উঠল— 'ও ইয়েস। আমি আপনার সঙ্গে থেকে সবরকম সাহায্য করব দেখবেন। বাবার ভাষায় ভোজ মানে 'নন ভেজিটেরিয়ান', তাই আমি হোটেলের কথা বলেছিলাম।' আমি দু হাত উল্টে বললাম— 'খুবই দুঃখিত। আই ক্যান্ নট হেল্প ইট।'

উনি তখন বলে উঠলেন— 'নো নো। তোমার বাড়ীতে খাওয়া হলে আমি কি মাছ-মাংস-ডিম চাইব নাকি? গঙ্গা যদি নিজের হাতে রান্না করে, তবে যেমন জিনিসই হোক, তাই আমার পক্ষে ভোজ।'

কেবলই চিন্তা। ঘুম আর আসছে না। আগামী রবিবারের এখনও পাঁচ দিন বাকী। রবিবারের ভোজের জন্য কী কী আয়োজন করা যেতে পারে আমি তাই ভাবতে শুরু করে দিলাম।

21

সকালবেলা গোয়ালার শব্দ শোনা পর্যন্ত বিছানাতেই পড়ে থাকতে হবে এই ভেবে চাদরটা ভালো ক'রে গায়ে দিলাম। সন্দেহ হচ্ছে এখনও রাত দুপুর। উঠে যে ঘড়িটা দেখব তাতেও কুঁড়েমি। আর দেখেই বা কী হবে? ভোর কি তাড়াতাড়ি হবে?

হঠাৎ একটা চিন্তা জাগল: সদর দরজা বন্ধ ক'রে তাতে খিল লাগিয়েছি। পিছনের দরজাটাও ওইভাবে বন্ধ করেছি তো? খিল লাগাতে কি ভুলে গেছি? আচ্ছা এখন গিয়ে একবার দেখে আসব? কোনো দরকার নেই। সময় তো হয়ে এল। গোয়ালা এসে হাঁক দেবে. তখন উঠে দেখলেই হবে। কোনো চোর এসে রান্নাঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যাবে? যাক না। আমি যে এ বাড়ীতে একলা আছি এ ব্যাপারটা পাড়াময় ছড়িয়ে পড়েছে। আজ না হলে কোনো একদিন এ বাড়ীতে চোর আসবে কি? এসে যা খুশী তুলে নিয়ে যাক। কেবল আমার এই ঘরে এসে না ঢুকলেই যথেষ্ট। এ ঘরে আসবেই বা কেন? যে চুরি করতে আসে, সে তো যথাসাধ্য মানুষের চোখ এড়িয়ে যা পায় তাই নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। দরজায় টোকা দিয়ে কপাট খুলতে বলে চোর আসে নাকি?

কেন আজ চোর নিয়ে এত ভাবনা? একা একা বাড়ীতে থাকি বলেই বোধহয় এতকাল যে ভয়ডর ছিল না, তা এসে দেখা দিয়েছে। মা যখন ছিল, তখন কোথায় ছিল এই সব চিন্তা? মাকে বাদ দিয়ে আমি একাই যেন এই বাড়ীর ভার বহন করে চলেছি। কেবল বহন করা ছাড়া কিছুই আমার নিজের বলে বোধ হচ্ছে না। একটুখানি হিং-এর জন্য তাকের ওপর সারি-দেওয়া সমস্ত কৌটোগুলি খুলে দেখতে হয়। এখন ভালো ক'রে মনে পড়ছে কোথায় আছে হিং-এর কৌটো। কিন্তু মেথির কৌটোটা ভুলে গিয়েছি। না, কোন্ কৌটোয় কী আছে কাগজে লিখে লিখে সব কৌটোর গায়ে লাগিয়ে দিতে হবে।

রান্নার জন্য কোনো বয়স্ক বামুনের মেয়ে পাওয়া গেলে রাখা যেত। আমি কোথায় গিয়ে খোঁজ করব? তাছাড়া অমন একজন পেয়েও যদি রাখি, মায়ের মনে ভারি অশান্তি হবে। সহ্য হবে না তার। একদিন, দুদিন, তিনদিনের দিন মা এসে তাকে তাড়িয়ে দিলেও দিতে পারে। যাহোক, একবার চেষ্টা করে দেখব নাকি? মায়ের রিঅ্যাকশনটা কী রকম হয় অন্তত সেইটুকু জানাবার জন্যও যদি বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ কন্যাকে পাওয়া যায় রেখে দেব। আচ্ছা মায়ের কাছে বলে একজন রান্নার লোকের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়! ট্রিপ্লিকেন এলাকায় নাকি অনেক মেলে। মাকে জানাতে পারলে কাউকে-না-কাউকে পাওয়া যাবেই। ইট ইজ এ গুড আইডিয়া। কাজে কাজ হবে, সঙ্গীতে সঙ্গী হবে। নইলে মামা যদি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়ে এখানে থাকতে চায়, তাহলে তার জন্য রান্নাবাড়া করা, ফাইফরমাস খাটা, হাত-পা টিপে দেওয়া— ওরেব্ বাবা এই একলা বাড়ীতে সেকথা ভাবতেও যেন কেমন লাগে। ঘরের মধ্যে চোর ঢোকার মতো ভয় হচ্ছে আমার। আজ ভোর হলেই মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে এই বিষয়ে কথা বলে একটা লোকের ব্যবস্থা করা দরকার।

মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরার সময়ে বলে আসব। ওর গাড়ীতে চড়ে গণেশের বাড়ীর সামনে নামা? ছি ছি! কক্ষনো নয়। গণেশ হয় এই কথা ভেবে চিৎকার করতে থাকবে যে তাকে খুব 'ইনসাল্ট' করা হয়েছে। সদর দরজায় আমার এই বেশবাস দেখে হয়তো বলে উঠবে— 'কীরে, এখানে এসে আমার মানমর্যাদা খোয়াতে চাস?' চাই কি আমাকে মারধোরও করতে পারে। বেড়ানো শেষ ক'রে আসার সময়ে পাইক্রফ্ট্স্ রোডে নেমে যেতে হবে। নেমে আমিই গণেশের বাড়ীতে যাব? বারো বছর পরে সেই বাড়ীতে আমি যাব? গিয়ে সদরে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেই মা বেরিয়ে আসবে। আসামাত্রই তার কাছে ব্যাপারটা বলে দিয়ে চলে আসতে হবে। হেঁটে না গিয়ে পাইক্রফ্ট্স্ রোডে একটা ট্যাক্সি ধরে গণেশের বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে ডাকতে হবে। সামনের দিকটাই ওদের। জানালা দিয়ে বৌদি, গণেশ অথবা মা নয়তো গণেশের কোনো ছেলে চোখে না পড়ে পারে?

রাত এখন কটা বাজে? ভোর কি আর হবে না? রাত্রি মানে কতটা সময়? একটা দিন মানে যতটা সময় ততটাই। নটার সময়ে শুয়েছি। 5টা পর্যন্ত হিসেব করলে দাঁড়ায় 8 ঘণ্টা। এই সময়টা দিন হলে আরও কত কাজ করা যেত। কোনো কাজকর্ম না ক'রে সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকা কী ভীষণ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর। বিনা ঘুমে শুয়ে থাকলে রাত্রিই বা কী, আর দিনই বা কী। সবই সমান।

মনে হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন প্রায় ভোর হওয়ার সময় হয়ে এল। ঐ যে স্পার্টাং রোডে বাস চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হয়তো কোনো লরী। এই যে এদিকে কাক ডাকছে। মাদ্রাস শহরের কাক যে-কোনো সময়ে ডাকে। রাত্রি ন'টার সময়েও আমি এখানে কাক ডাকতে শুনেছি। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। গোয়ালা গোরু মোষ তাড়িয়ে নিয়ে আসছে, তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দুটো-তিনটে বাড়ী ছাড়িয়ে গোয়ালা ডাকছে—'মা দুধ নিন' সেই ডাক এই পর্যন্ত ভেসে আসছে। কোথাও সদর উঠোনে জল ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও শক্ত মাটির ওপর নারকেলের শলার ঝাড়ু দিয়ে ঝাঁট দেওয়ার শব্দ কানে আসছে। আমি বিছানায় উঠে এসে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছি। এখনও সামান্য অন্ধকার রয়েছে। তবু ভোর তো হয়ে আসছে। কটা বাজে? লাইট জ্বালিয়ে দেখলাম— পৌনে পাঁচটা।

সকালবেলাটা মনের পক্ষে খুব উৎসাহজনক। রাতে আমার ঠিকমতো ঘুম হয় নি। তবুও শরীরে কোনো ক্লান্তি বোধ করছি না। আমি উঠে আমার ঘরের দরজা খুলে বড় ঘরে এসে আলোটা জ্বালালাম। প্রথম কাজ হল পিছনের দরজাটা দেখা। না, ভালো করে বন্ধ করেই খিল দিয়েছি। তবু কী রকম একটা অর্থহীন সন্দেহ ও ভয়। আমি মনে মনে নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করলাম। বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলাম। রাতের এঁটো বাসনগুলো পড়ে আছে। তার মধ্যে কেবল দুধের বাসনটাই মেজে ধুয়ে নিলাম।

এই যে গোয়ালা এসে গেছে। দুধটা নিয়ে আসব বলে রাস্তার দিকের দরজাটা খুললাম। বেশ রোদ এসে পড়েছে। সামনের বাড়ীর সদরে আলপনা আঁকা হচ্ছে, আমিও দুধটা রেখে এসে পুরো আলপনা দিতে না পারি গোটা-দুই লাইন এঁকে দেব। এই সমস্ত কাজের জন্য মা কি একজন ঝি রাখতে পারত না? কী কষ্ট! সমস্ত কাজ একজন স্ত্রীলোক করতে পারে না কি? এখন আমাকে বেরোতে হবে একটি ঝিয়ের খোঁজে। এই এক সপ্তাহ ধ'রে আমিই তো সব কাজকর্ম করে আসছি। সাত দিন নাহয় চলল কোনো মতে। সর্বদা করতে গেলে ভারি কষ্ট। এই সমস্ত কাজ তো বরাবরের জন্য। তেঁতুল গুলতে গুলতে জীবনটাই যে গুলিয়ে যাচ্ছে— মায়ের কাছেই এসব কথা শোনা। তার

ওপর আমাকে তো আরও কাজকর্ম করতে হবে! বাইরে বেরোনো, অফিস যাওয়া...।

দুধ ঢালতে ঢালতে গোয়ালা জিজ্ঞেস করল— 'দিদিমণি, মা কি এখনও আসেন নি?'

'না। সে তার ছেলের বাড়ীতে গিয়েছে কয়েক দিনের জন্য।'

মনে হল গোয়ালাও কিছু একটা বুঝে নিয়ে থাকবে। ওই রাস্তার কত বাড়ীতেই তো সে দুধ দিতে যায়। কত লোক কত রকম কথা বলে। তাও আবার লোকটা যে আমাদের বাড়ীতেও দুধ দেয় একথা জানতে পেরে এর কাছে কি নানা রকম খোঁজ খবর না নিয়ে পারে?

দুধটা নিয়ে আসার সময়ে খবরের কাগজটা এল। দুধটা নিয়ে ঢেকে রেখে কাগজটা পড়ব বলে বড় ঘরে এসে সোফায় বসে পেপারটা খুললাম। বাইরে গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। উনিই এসেছেন মনে ক'রে উঠে দেখি— আই সি! ওঃ কী দুর্গতি! আমার মামা মহাশয় এসেছেন— হাতে তাঁর লেদার ব্যাগটি। ও হো! মনে পড়ে গেল, বলেছিল না যে আগামী সপ্তাহে আসবে। ঐটুকু মনে ছিল বটে, কিন্তু আগামী সপ্তাহটা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে সেই কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম। কী দুর্ভোগ! আজই মাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

মামা খুব হৃষ্টচিত্তেই এলেন। 'কাল সন্ধ্যাবেলায়, বুঝলে কিনা, রওনা হয়ে পড়লাম! ধাঁ ক'রে পাঁচটা চল্লিশে এনে ফেলে দিল এগ্‌মোর স্টেশনে। কুছ পরোয়া নেই। সামান্য ভাড়া।... তারপরে? ভালো-টালো আছো তো?' এই বলে মামা আমার হাত ধরে বলতে লাগল: 'ভাগ্যিস এসে পড়েছি। ভেবেছিলাম যদি তুমি ইতিমধ্যেই কোথাও বেড়াতে গিয়ে থাকো, তবে তো আমাকে এসে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'

'বসুন মামা। কফি নিয়ে আসছি।' এই বলে তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রান্নাঘরে এলাম। বাসনকোসন মাজাঘসা করছি! মামা বড়ঘরে বসে বসে পেপার পড়ছে।

আমি ভালোভাবেই জানি, মামার এখন মাদ্রাস শহরে কোনো কাজই নেই। আমার সঙ্গে একা একা থাকবার সুবিধা হবে এই আশা নিয়েই লোকটি ছুটে এসেছে তাঞ্জোর থেকে। হ্যাঁ, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। এই এক সপ্তাহ আমি এই বাড়ীতে একা আছি। মাকে গণেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি প্রভাকরের সঙ্গে বেশ মজা লুটছি— মামা প্রতিটি দিন কল্পনায় এই সব চিন্তা ক'রে নিশ্চয়ই খুব দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। দিন গুণে গুণে আর সহ্য করতে না পেরে কাল সন্ধ্যাবেলায় রেলগাড়ীতে উঠে বসেছে। খুব ভোরে এসে পৌঁছলে নির্ঘাৎ দেখতে পাবে প্রভাকর আমার বাড়ীতেই রয়েছেন। মামার মন আমি জানি তো।

বাসনকোসন মেজে কফি তৈরি করে এনে মামার কাছে রাখলাম। মামা

এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল যেন আমার সমস্ত অঙ্গ মেপে মেপে দেখছে। এক সময়ে জিজ্ঞেস করল— 'কনক সেদিন তো চলে গেল, তারপরে আর আসে নি?'

'না। আমিই আজ গিয়ে দেখা করব।' মামা আমার কথার উত্তরে কিছু না বলে চুপ ক'রে কফি খেতে লাগল। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছি আর প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছি মামা কী জানি কী বলবে। মামা কী বলবে জানি নাকি? বলবে— 'তুমি কেন সেই বাড়ীতে যাবে? দরকার হলে তোমার মা-ই আসবে।' ঠিক যা ভেবেছি সেই ভাবে বলতে আরম্ভ করল মামা 'গণেশ তোমাকে 'বেরিয়ে-যাওয়া মেয়ে' বলেছিল, তারপরে আর তাদের বাড়ীতে যাওনি তুমি, কেমন কিনা?'

'না যাইনি '

'সেই গণেশটাই কেবল তোমার বাড়ীতে আসে, কেমন কিনা?'

হ্যাঁ, তার মা এখানে ছিল, তাই মাকে দেখতে আসত। তাছাড়া ঠাকুমাকে দেখবার জন্য তার নাতী নাৎনীরাও আসত।'

'ওঃ! সেইভাবে বুঝি তুমিও এখন তোমার মাকে দেখতে যাচ্ছ, কী বলো?'— বেশ একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কথাটা বলে মামা তার কফির গেলাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি গেলাসটা হাতে নিয়ে বললাম— 'আমি গণেশের বাড়ীর মধ্যে ঢুকব না। বাইরে দাঁড়িয়ে কেবল একটা হাঁক দিয়ে বলব— মা, মামা এসেছে, বাড়ীতে এসো। ব্যস এইটুকু বলেই চলে আসব।' এই বলে আমি রান্নাঘরে গেলাম। মনে হল মামা যেন আমার পিছন পিছন উঠে আসছে। রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলল— 'তাহলে, আমার জন্যই তুমি এখন সেখানে যাবে?'

'হ্যাঁ, মা সেদিন যাওয়ার সময়ে বলে গেছে যে আপনি এলে যেন তাকে খবর দিই।'

'কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে চাই বলেই এখন এসেছি।'

আমি যেন মামার দুরভিসন্ধি কিছু বুঝতে পারি নি এমনি নিরীহভাবে বললাম— 'তাতে কী মামা? আমরা কি একা একা কথা বলতে পারব না? মা কি সর্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে? যা বলবার মা-ই তো আপনার কাছে বসে থাকবে নাকি?'

মামা হাসল। কেন এই হাসি! বেশ ইচ্ছে করেই দেঁতো হাসি হাসল। বলল— 'তুই খুব ফাজিল মেয়ে হয়েছিস... অ্যাঁ' এই বলে গালে চিমটি কাটার জন্য আমার কাছে এগিয়ে এল। ঠিক এমনি সময়ে শোনা গেল হর্ন।

'মামা, আপনি স্নান সেরে আসুন। গরমজল চাপিয়ে দিয়েছি। একটু

দাঁড়ান! দরজাটা বন্ধ করে দেবেন। আমি যাব আর আসব।' এই বলে আমার ঘরে গিয়ে মাথার চুলটা আঁচড়ে চপ্পল পায়ে দিয়ে আমার ঘরে তালা লাগিয়ে মামাকে 'টা-টা'-র ভাবটুকু দেখিয়ে রওনা হলাম। মামা কী উত্তর দিল কিংবা কেমনই বা পরিবর্তিত হল তার মুখের ভাব সে দিকেও আমার খেয়াল রইল না।

মা এসে গেছে। সকালবেলায় আমার প্ল্যান মতোই পাইক্রফ্‌ট্‌স্‌ রোড থেকে একটা ট্যাক্‌সিতে গিয়ে গাড়ী থেকে না নেমে ব্যাপারটা জানিয়ে চলে এলাম। গণেশের মেয়ে শান্তা— শান্তাটা এখন কত বড় হয়ে গেছে।— সেই শান্তা আমাকে দেখেই 'পিসি' বলে ছুটে এসে গাড়ীর মধ্যে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে 'এসো পিসি, এসো' বলে টানছিল। কিন্তু শান্তার স্নেহে আমি তেমন সাড়া দিলাম না। বললাম— 'ডাক তো তোর ঠাকুমাকে।' 'ঠাকুমা, ঠাকুমা, পিসি এসেছে'— এই বলে চীৎকার করতে করতে শান্তা দৌড় দিয়েছে তাতে আমার খুব ভয় হল এই ভেবে জামাকাপড়ে জড়িয়ে হুঁচোট খেয়ে পড়ে না যায়।

চিনি না কারা আমাকে দেখবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। আগের লোকজন অনেকেই বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, তাদের জায়গায় নতুন ভাড়াটে এসেছে। বেশির ভাগই অচেনা মুখ। মা এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। দেখে মনে হচ্ছে মা যেন কী হয়েছে কী ব্যাপার এই ভয়ে সন্ত্রস্ত। গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল— 'কীরে কী?'

'কিছুই নয়। মামা এসেছে। সকালবেলাটা আমি কোনোমতে সামলে নিয়ে অফিসে চলে যাব। দুপুরবেলা তুমি বাড়ী এসো।' মায়ের মুখেচোখে একটা গর্বের ভাব। যেন এই কথাই বলছে— 'দেখলি তো, আমি না হলে তোদের চলে না।' তারপরে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল— 'আমি তোকে এখনই বলে দিচ্ছি। একদিন হোক, দুদিন হোক, আমি যতদিন থাকব, ওরা যেন না আসে। কী বলিস, তাহলে আমি আসতে পারি।' মা একটা শর্ত আরোপ করে দিল। আমি অসহায়ের মতো বললাম— 'ঠিক আছে। তাই হবে।' এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম— এই শর্তের ব্যাপারে মামা একটা নির্বোধ তৃপ্তি লাভ করবে।

মামা একটু নিরাশ হল। এসেই আমি খুব ব্যস্তসমস্তভাবে কুকার-এ সমস্ত রান্নার জিনিস চাপিয়ে স্নান করতে গেলাম। স্নানটা সেরে এসেই তাড়াতাড়ি ক'রে মামাকে খেতে দিলাম। মামা আমার রান্নার খুব প্রশংসা করল। তারপর বলল— 'অফিস থেকে আজ ছুটি নাও না।' 'আই-আইয়ো। কী যে বলেন মামা? অফিসে আজ ভীষণ কাজের চাপ, আমার না থাকলেই নয়।' এই ভাবে মিথ্যা কথা বলে রওনা হলাম।

উনিই এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন মামা বাইরে এসে ওঁকে 'উইশ' করেছিল। উনিও খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে গাড়ী থেকে নেমে মামাকে 'গুড মর্নিং' ব'লে 'কবে এলেন?'— ইত্যাদি কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করলেন। তারপরে মামার কাছে বিদায় নিয়ে আমাকে গাড়ীতে চড়িয়ে যাওয়ার সময়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— 'আচ্ছা, তোমার মামা আমার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করেন নি? কোথা থেকে কে একটা লোক এসে আমাদের ঘরের মেয়েটিকে মাঝে মাঝে গাড়ীতে ক'রে নিয়ে— এইসব জিজ্ঞেস করেন নি?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম— 'হী নোস্ এভরিথিং— আমাদের সম্পর্কে সব কিছুই জানে। আপনি কে, কী ইত্যাদি সব— সব।' কথাটা শুনে উনি যেন একটা শক পেলেন মনে হল। 'কী বলছ তুমি? হোয়াট ডু ইউ মীন?'

'আই মীন হোয়াট আই সে'— এই বলে তারপরে তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য বললাম— 'সো হোয়াট? জানলেই বা কী? সে কথা জানার পরে তারা যেমন ভদ্রভাবে থাকেন আমরাও তেমনি ভদ্রভাবে থাকব। তারা যদি ডেয়ার-ডেভিল্ হয়ে বসে আমাদের কিছু বলেন, তখন আমরাও সেইভাবে 'হাঁ' বলে সাহস করে এগিয়ে যাব।'

উনি একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন— 'তা কী ক'রে হয়?'

'কেন হবে না? আপনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক, নয় কি? তাই তো মামা আপনার সঙ্গে সমীহ ক'রে চলে। মামাও সভ্য। সুশিক্ষিত। কাজেই আপনাকে ওসব নিয়ে কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারে না।'

আমি এখন অফিস থেকে ফিরে এসে রান্নাঘরে কাজকর্মের শব্দ পেলাম। বুঝলাম মা এসে গেছে। মা বলল— 'তোর এই কুকার-পুকার্ দিয়ে আমার চলে না বাপু!'

অফিস থেকে কখন বাড়ী ফিরে আসব মামা যেন তারই অপেক্ষায় ছিল। সকালবেলা রওনা হওয়ার সময়ে বলে দিয়েছিল— 'তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু।' আমিও সেই কারণে আজ প্রভাকরকে আসতে হবে না বলে নিজেই ট্যাকসি করে এলাম। আজকাল আমি আর বাসে যাতায়াত করি না! আমার আজকালকার সাজপোশাকও বাসে চলাচলের উপযুক্ত নয়। বাড়ী ফিরতেই মামা অভ্যর্থনা ক'রে বলল— 'এসো, আজ ঠিক সময়েই এসেছ, একটুও দেরি করো নি...।'

মা টিফিন তৈরি করেছে। উপ্‌মা-র গন্ধ বেরিয়েছে। মা বাড়ীতে আছে জেনে অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। মামা ও আমি বড় ঘরে বসে টিফিন খাচ্ছিলাম। খাওয়ার পরে মামা আমাকে ব্যালকনিতে ডেকে বলল— 'এসো না এখানে। উপরে একটু হাওয়ায় বসব। তোমার সঙ্গে আমার কিছু প্রাইভেট কথা আছে।' ব্যালকনির উপর থেকে এমনভাবেই বলল যে কথাগুলো মায়ের কানেও পৌঁছয়।

কী আর করা? গেলাম ওপরে। মামা একটা পেরম্ব্ুলেটর চেয়ারে বসা। বহু

বৃষ্টিতে ভিজে এবং রোদে চেয়ারটার অবস্থা সাদায় কালোয় অপরূপ। মামা বলল : 'এই চেয়ারটা তো ভালোই ছিল। মিছিমিছি এভাবে কেন ফেলে রেখেছ? পেইন্ট ক'রে দিলে এ চেয়ারে আরও দশ বছর যাবে।' এই কথা বলে সে চেয়ারটার নানা জায়গায় টাক দিয়ে দিয়ে দেখল। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল— 'হাউ ইজ লাইফ?'

আমিও হেসে উত্তর দিলাম— 'ফাইন।'

22

মামা চলে গেল দেশে। মা গেল গণেশদের ওখানে। আবার আমি একা। সকলেই এইভাবে চলে যায়। সংসারে স্নেহভালোবাসা সবই এইরকম বুঝি। আত্মীয়স্বজন, মায়ের পেটের ভাই— কেউ ব্যতিক্রম নয়! জীবনের শেষ পর্যন্ত যে সম্পর্ক ছাড়া যায় না, লেগেই থাকতে হয়, তা হল স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক। ভালো লাগুক না-লাগুক, একজনের সঙ্গে আরেকজনের মেল হোক বা না-হোক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত লেগে থাকার সম্পর্ক। ডাইভোর্স করলেই বা কী? এক-জনকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একজনকে তো বরণ ক'রে নিতে হয়। যতই ডাইভোর্স করো-না কেন, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক মেনে নিতেই হয়। যদি তা না করো, তবে জানবে সংসারে তুমি একা। সেই একটি সম্পর্ক ঠিক রাখলে সংসারে কে ছেড়ে গেল না-গেল তা নিয়ে ভাবনা কিসের? আর সেই সম্পর্কটিই যদি না থাকে, তবে মা-বাপই বলো, ভাইবোনই বলো— এরা চারিদিকে ঘিরে থাকলেও একা-একাই মনে হবে।

এই সম্পর্কটি এমনি মজার যে একবার ছিন্ন করে দিলেও পুনরায় আর একজনের সঙ্গে গড়ে তোলা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই সম্পর্কটিই সবচেয়ে দরকারী, সবচেয়ে মৌলিক। অন্য সম্পর্ক কেমন যেন বানানো সম্পর্ক। আমরা চাই না-চাই ঘাড়ে এসে পড়বেই। মামা, দাদা, মা— এদের সঙ্গ চাই না বলে ছিন্ন করা যায় না, আবার চাই বলে গড়ে তোলা যায় না। নরনারীর সম্বন্ধ সে ধরনের নয়! এইটেই সবচেয়ে মুখ্য। সব চেয়ে গোড়ার, সব সম্পর্কের মূলীভূত কারণ। তাই তো মানুষ এই দাম্পত্য সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। আমার এই মুখ্য সম্পর্কটাই নেই, তাই আমি সমস্ত সম্বন্ধশূন্য নারী।

যা ঘটে গেছে, মামা আর আসবে না এর পরে। ও সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল! একথা কেবল আমিই জানি। ফলে মাও বোধ করি আর আসবে না এখানে। এর পরে ডাকতে হলে অন্য কোনো অছিলায় ডাকতে হবে। কী আর করা যাবে?

মা যেমন ক'রে সন্ধ্যার পরে বসে থাকতো, আমিও তেমনিভাবে সদরের আলোটা জেলে, দরজায় এসে বসলাম। একা একা ঘরের মধ্যে থাকতে মায়ের মাথা ধরত বলে মনে হয়। সেও তাই এসে সদরে বসত। মায়ের মতো সামান্ত কিছুকাল একা একা আবদ্ধ থাকলেই বোঝা যায়. তখন মনে হয় একটু রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলে বোধ হয় ভালো লাগে। ভালো তো লাগে ঠিকই। কিন্তু আমি এসে পথের কোন্ দিকে তাকাবো? যে দিকেই তাকাই-না কেন, সকলেই একটা দ্রষ্টব্য বস্তুর মতো আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি যেন এ-পাড়ার একটা মস্ত বড় 'লিজেণ্ড'। গল্প করে তারা গঙ্গা পুরাণের কথা, এসে এসে দেখে যায় স্বয়ং গঙ্গাকে।

হাতে একখানা বই নিয়ে পাড়ার এই কাণ্ড কারখানা যেন কিছুই দেখছি না এইভাবে সব কিছুই লক্ষ্য করছি আমি। কী একটা বাজে বই এটা? একটু ভালো নয়। ভেবেছিলাম কোথাও না কোথাও কিছু ভালো কথা ভালো প্যাসেজ পাওয়া যাবে, কিন্তু বৃথা আশা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছি!

হ্যাঁ, একটা রেডিও কিনতে হবে আমাকে। এ সমস্ত শখ আমার কোনো কালেই ছিল না। যা হোক, কালই একটা কিনে আনব। সামনের বাড়ী থেকে রেডিয়ো চালিয়ে কান ঝালাপালা করে। আমার বাড়ী থেকেও আমি একটু ওদের কান ঝালাপালা করি না কেন? একা একা আছি, একজন কথা বলার মতো সঙ্গী চাই না? রেডিওতে যদি শুধু কথা বলে ভালো লাগে, গান-টান একদম সইতে পারি না।

সদর দরজাতেই বসে আছি। ভিতরে যেতে মন চায় না। ভিতরটা বড়ই শূন্য। মা যাবার সময়ে খুবই তাড়াতাড়ি রান্না ক'রে রেখে গেছে। কাজেই আজ আর রান্নার কাজও নেই। নয়তো সেই অছিলায় কিছু সময় কাটত। সময় কাটে না বলেই এখানে বসে আছি। আচ্ছা মঞ্জুর সঙ্গে একবার দেখা করে এলে কেমন হয়? ছি! মনে হলেই ছুটতে হবে নাকি? মঞ্জুর বাবাকে আজও বলে দিয়েছি আসতে হবে না। নির্বোধ মায়ের তৃপ্তির জন্য প্রভাকরকে বলেছিলাম যে, দু'দিন যেন উনি না আসেন। কারণটা বলেছিলাম অন্য— একটা কল্পিত কারণ। এদিকে সময়মতো এসে মা ও মামাকে বিদায় দিয়ে দিলাম। একা, নিতান্তই একা। কেউ নেই আমার। আমার চারিদিকেই শূন্যতা। কোনো কিছুরই অর্থ নেই যেন। এই বইটা খুব একঘেয়ে লাগছে। বন্ধ ক'রে দিলাম বইটা।

সদরের গেটের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হল। 'কে'?

'আমি মামী'। ওঃ, আমার মায়ের বন্ধু মেয়েটি। আজ আর হাতে তার খোলামকুচি নেই। গেটটা ধ'রে মাথাটাই কেবল আলোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে কত যে স্বস্তি হল! ডেকে বললাম— 'এসো, এসো।' যেন ওর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম এইভাবে উঠে গিয়ে গেটটা খুলে দিলাম। 'মা

নেই' শুনে ও যাতে পালিয়ে না যায় আমি সেই জন্য শক্ত করে হাত ধরে টেনে আনলাম। সেদিন এই মেয়েটাই অযাচিতভাবে কথা বলার সময়ে ভিতরে চলে গিয়েছিলাম। আজ আমিই গিয়ে তার কাছে হাজির হলাম।

'তোমার নাম কী বলো?' 'মীনা।' 'এই সময়ে কোথায় এসেছিলে? কী চাই তোমার? কোন্ ক্লাসে পড়ো?' একটা প্রশ্ন করলে পাছে উত্তর দিয়ে পালিয়ে যায় সেই ভয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন করলাম। কিন্তু একটি প্রশ্নও বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। ওর ধারণা আমি খুব অহংকারী। সেই আমিই যে আজ যেচে ওর সঙ্গে এত কথা বলছি এতে ও খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে। এখন ওর নিজেরই একটু অহংকার এসেছে, সাহস এসেছে। আমার শেষ প্রশ্নটার উত্তর দিল টেলিগ্রাফের ভাষায়: 'সিক্স্থ স্ট্যাণ্ডার্ড। সেবা সদন।' আমি ওকে টেনে এনে আমার পাশে বসালাম।

'কেন এসেছ? কী ব্যাপার?'

'এমনিই এসেছি। বিশেষ কিছু না। আপনাদের বাড়ীতে যে এসেছিল সে কি দেশে চলে গেছে? ঠাকুমাও চলে গেছে, না?' কাকিমা তাই বলছিল। আমি বলেছি—'না।' কাকিমা বাজি ধরল। আমি তাই দেখে যাব ভেবেছিলাম। ঠাকুমা কি ভিতরে আছে?' এই বলে সে উঁকি মেরে দেখল।

আমার একমুহূর্তের জন্য একটু রাগ ধরে গেল। অন্যলোকের পারিবারিক ব্যাপারে এই লোকগুলোর কী সর্বনেশে কৌতূহল যে বাজি ধরতেও বাধে না। এরা নিশ্চয়ই বলাবলি করে যে আমিই মাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি। আমি মীনাকে জিজ্ঞেস করলাম—'তোমার কাকীমা কী বাজি ধরেছে?' ও মাথা নেড়ে জানাল বলবে না। ঠোঁটটা কামড়ে ধরে, মাথাটা নীচু ক'রে বুড়ো আঙুলটা দিয়ে মাটির ওপর দাগ টানতে লাগল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই ওর মাথায় একটা চাটি মেরে বাড়ী পাঠিয়ে দিই।

'মামী! আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি। বলবেন তো?' বেশ একটু ভূমিকা জুড়ে দিয়ে কথা আরম্ভ করল অতটুকু মেয়ে।

'জিজ্ঞেস করো— বলার হলে বলব।'

'ঠাকুমা কি আপনার ওপর রাগ ক'রে চলে গেছেন? কথাটা সত্যি? আপনার সঙ্গে ঠাকুমার ঝগড়া হয়েছে? আর সে আসবে না বুঝি?'

এইটুকু মেয়ের প্রশ্নের কী যে উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছি না। মনের মধ্যে কেবল এই কথাটাই পাক খেতে লাগল— মা যে কত লোকের কাছে কী-না-কী কথা বলে কান্নাকাটি করে মনের ক্ষোভ মিটিয়েছে। আমি সামলে নিয়ে উত্তর দিলাম— 'ঝগড়া? কী বাজে কথা বলছ? কে বলেছে? মা গেছে আমার দাদার বাড়ীতে। আবার আসবে।'

'আপনি এ বাড়ী একা থাকেন?' আরও কত কী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কথা

ভাবছে, কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে যে আর কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত হবে না! আমি ভাবলাম— 'আহা, এই শিশুর ওপর এইজন্য রাগ ক'রে লাভ কী? আমার গাড়ীতে চড়ে যাওয়া এবং গাড়ী থেকে এসে নামা— এই দুটি ব্যাপার যেন ছবির মতো মীনার মনে লেগে রয়েছে।'

'হ্যাঁরে মীনা, আমি এ বাড়ীতে একাই থাকি। একা থাকতে কষ্ট হয় তাই দরকার হলে আমার সঙ্গে থাকতে পারবি?'

'আপনার এখানে? সব সময়ে?'

'হুঁ।'

'আই-আাইয়ো! আমি তা পারব না। মা তাহলে মারবে।'

'না না মারবে না। কিছুক্ষণ এখানে থেকে তারপরে তুমি বাড়ীতে যেয়ো। আমাকেও তো অফিসে যেতে হবে, আরও সব কাজকর্ম করতে হবে।— কাল আমাদের বাড়ীতে একটা নতুন রেডিও কিনে আনব! তুমি এসে দেখবে কেমন?'

'আই-আইয়ো! রেডিও কেন কিনবেন, মামী? ট্রানজিস্টার কিনুন।' কী চমৎকার বুদ্ধি খরচ ক'রে কথা বলে এই বাচ্চা মেয়েটি! আমি বললাম— 'ইট ইজ এ গুড আইডিয়া! ও ইয়েস! তোমার ইচ্ছামতো একটা ট্রানজিসটারই কিনে আনব।'

হঠাৎ কোথা থেকে একটি ডাক শোনা গেল: 'মীনা!' 'এই যে আসছি কাকিমা' বলে সাড়া দিয়ে মীনা আমার দিকে চেয়ে বললে— 'কাল আসব মামী, টা-টা' এই বলে সে দৌড়ে পালালো!

আমি আর একবার বইটা তুলে নিয়ে খুললাম। কিন্তু মনটা কিছুতেই লাগছে না। আমার মনের মধ্যে কেবল একটি কথা ভাবতেই আনন্দ যে মামা আর এখানে আসবে না। গতবার যখন এসেছিল তখন একটি কথা বলেছিল মনে আছে— 'গঙ্গা! তুমিই জয়লাভ করেছ।' এবারে এসে নিজের পরাজয়কে স্বীকার করে গেছে।

গতকাল রাত দশটা পর্যন্ত ব্যালকনিতে মামা ও আমি কথাবার্তা বলছিলাম। কালই মাত্র প্রথমবার আমি মামার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। এবং এই বোধকরি শেষবার। নানান বিষয়ে কথা বলছিলাম আমরা। কখনও কখনও আমাদের আলাপ খুব ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠেছিল। বস্তুত মজার মজার কথা কী ভাবে বলতে হয় তা কী আর মামাকে শেখাতে হবে নাকি?

আমি তার সঙ্গে আলোচনা করছিলাম আমার বর্তমান অবস্থা নিয়ে এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে কী ভাবে কোন্ দিকে চালিত করব বলে সিদ্ধান্ত করেছি সেই সব নিয়ে। কিন্তু সে বেশ একরকম সীরিয়াসভাবে কথা বলতেবলতে হঠাৎ একেবারে

নীচে নেমে এল। প্রভাকর সম্পর্কে এবং প্রভাকর ও আমার মধ্যেকার সম্বন্ধ নিয়ে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ নেওয়ার ভঙ্গীতে যা-তা জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল। আমার হঠাৎ কেন জানি ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

মামা বসেছিল ঐ চেয়ারের ওপর। আর আমি নীচে দেয়ালে হেলান দিয়ে হাঁটু ভাঁজ ক'রে বসে তার প্রশ্নসমূহের উত্তর দিচ্ছিলাম। মাঝেমাঝেই মামার পা এসে আমার উরুতে ঠেকছে। আমি একটু একটু সরে সরে যাচ্ছি। যা জিজ্ঞেস করছে সে বিষয়ে ঠিকমতো বলতে না পেরে আমার বেশ উপদ্রবের মতোই লাগছিল। ঐ একই সময়ে এইভাবে একটা ঘৃণ্যকারজনক ব্যাপারে মার থেকে কীভাবে সে যে নানা উন্নত বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে এ একটা আশ্চর্যের কথা। হঠাৎ কী রকম ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দাঁত কড়মড় ক'রে আমি খুব শক্ত হয়ে উঠলাম। এখন আর তার কথা বুঝতে পারছি না। কী বিষয়ে বলছে তা তো নয়ই, এমন-কি তার ভাষাও যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

মুখে কথা বলছে আর এদিকে পায়ের বুড়ো আঙুল ও পাশের আঙুলটাকে জোড়া ক'রে আমার উরুতে চিমটি কাটতে লাগল। আমি নিজেকে ভুলে গিয়ে সেই অন্ধকারে মামা-টামা ভুলে গিয়ে 'পাজি শয়তান' বলে চট ক'রে উঠে পড়লাম। আমার কথা যেন কানে যায় নি এমনিভাবে হাসতে লাগল। কিন্তু গালাগাল দিয়েছি বলে আমি মনে মনে দুঃখ বোধ করলাম। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেলে ভালো দেখায় না ভেবে আমি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মামার সমস্ত কুকীর্তি জানা থাকা সত্ত্বেও আমার বোধহয় উচিত হয় নি তার ওপর ক্রোধ প্রকাশ করা ও গালাগালি দেওয়া। মামার এই দুর্বলতা তার স্বভাব। আমার উচিত ছিল সরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা না বলা। আমি বেশ বুঝতে পারছি ওভাবে বলাটা উচিত হয় নি। আমার মুখটা একটু লাগামহীন হয়ে পড়েছে বলে আমি নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করলাম। আমার আচরণ যতই অন্যায় হোক, মামা আমাকে যে সব সাহায্য করেছে, মামার বয়স ও মর্যাদা, আমার প্রতি তার স্নেহ-ভালোবাসা — এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে একটা কথা আমার মনে না হয়ে পারে নি (এবং তার জন্য দুঃখবোধও করেছি)-- এহেন মামার এমন দুর্বুদ্ধি কেন হবে? মামার বয়সই বা কত আর আমার বয়সই বা কত? মামার কি উচিত এখনও স্বভাবের এই ছিবলেমি প্রকাশ করা? আমার সম্পর্ক মামা সত্যিই কী ভাবে? আমি তার প্রস্তাবে সায় দেব এই রকম বিশ্বাস নাকি তার? না, এই রকম চলন-বলনে একপ্রকার তৃপ্তি? এর কি কোনো শেষ নেই? আমার কি উচিত নয় এর একটা বিহিত করা? মামাকে কিছু সদ্‌বুদ্ধি দেওয়া দরকার— এই ভেবে মনের মধ্যে নানা চিন্তা করতে করতে আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। মামা ঠিক আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এখন আর তাকে ভর্ৎসনা করবার কথা মনে হল না। কান্না পেয়ে গেল আমার। আমি মুখে তাকে কিছু বলতে পারি না বলে দাঁত কিড়মিড় ক'রে তার হাতটা সরিয়ে তার সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে, মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে— যেন কিছুই হয়নি এইভাবে ধীরে ধীরে বললাম : 'মামা, আমার গায়ে হাত না দিয়ে যা বলবার বলুন।' মামা কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল— 'কেন? আমি তোকে ছুঁতে পারি না?' এই রকমের প্রশ্ন করা যদি ন্যায়সংগতই মনে করে, তবে তার জবাব দেব কী? কথা বলতে বলতে আবার আমার গায়ে হাত দিতে এল। তার দিকে তাকাতে আমার ভীষণ বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছিল— সে আমাকে যা সাহায্য করেছে, আমার জন্য যে টাকা খরচ করেছে সেই সমস্ত ফিরিয়ে দিতে পারলে ভালো হত।

আমার হাত ধরে ভিখারীর মতো কী যেন প্রার্থনা করল। ভীষণ ক্রোধে আমি একেবার ফেটে পড়লাম। প্রভাকর সম্পর্কে কী সমস্ত কুৎসিত মন্তব্যও করল। মামা প্রভাকরের সঙ্গে নিজের তুলনা করেও কত কী মন্তব্য করল। তখন আমি রূঢ় কথা না বলে পারলাম না : 'শাট আপ, আপনি ওঁর পায়ের ধুলোরও যোগ্য নন।' আমি যেন পাগলের মতো হয়ে গেলাম, আরও কত কী সব মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : 'এর পরে আর কোনো মান-সম্মানের কথাই নেই। আপনি আমাকে যতই সাহায্য করুন, আমার জন্য যত টাকা খরচ ক'রে থাকুন, তা বলে আপনি আমার সঙ্গে যা খুশী ব্যবহার করবেন নাকি? হিসাব করুন কত টাকা খরচ করেছেন, হিসাব ক'রে তার ডবল টাকা নিয়ে চলে যান। এ বাড়ীর ধারে-কাছেও আর আসবেন না। সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ। নাউ ইউ ক্যান্ গেট আউট।'

আমি সিঁড়ি বেয়ে নামতে পিছন থেকে একটা তোৎলার মতো গলা শোনা গেল : 'গঙ্গা এখানে একবার এসে তারপরে যা।' গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালাম। মাথা নীচু ক'রে সেও দাঁড়িয়ে রইল। মুখে কথা নেই। খানিক পরে বলল— 'তুই কি আমায় বুড়ো বলেই ঘৃণা করছিস?' তার প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেল। একথা ভাবতে গিয়ে আমার কষ্টই হচ্ছিল অন্যান্য কত বিষয়ে যে একজন মহা মেধাবী বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এই বিষয়ে সে কী অজ্ঞ ও নির্বোধ? এই সব দেখে আমি না হেসে কী করি?

সে যে বুড়ো নয় এইটে প্রমাণ করবার জন্য ভয়ানক রকমে উৎসাহী হয়ে উঠল। কিন্তু সে বুড়ো কি বুড়ো নয় তাতে আমার কী? সে বলল : 'তুই আমাকে একথা বলতে পারিস না— ছোঁবেন না। তোকে মারবার পর্যন্ত অধিকার আমার আছে জানিস?' সে ঠাট্টার ছলেই কথাটা বলেছে বটে, কিন্তু বিষে ভরা সে ঠাট্টা। সে যে সত্যিসত্যিই মারতে পারে তা আমার জানা আছে। অমুকম্ মামীর শরীরে

সেই কালো কালো দাগগুলো আমার মনে পড়ে গেল।

'আমি জানি, আপনি মারতে পারেন। মারুন আমাকে আপনি। কিন্তু ছোঁবেন না, গায়ে হাত দেবেন না।' এই বলে চোখ বুজে দেহটাকে শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে আমাকে মারবার উদ্যোগ করছে। কোমর থেকে বেল্‌টটা খুলে ফেলল। আমি চট্ করে ধরে ফেললাম বেল্‌টটা। ইচ্ছে করছিল চারটে ঘা লাগিয়ে দিই ঐ বেল্‌টটা দিয়ে। বেল্‌টটা এখন আমার হাতে।

এমন সময়ে মা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল— 'দশটা যে বাজে এখনও খেতে আসো নি!'

কাল রাতে আর মামার সঙ্গে খেতে বসি নি! তার সঙ্গে কথাও বলি নি। তার মুখ পর্যন্ত দেখি নি। আমার ঘর থেকে তার বিছানাটা টানতে টানতে এনে বড় ঘরে ফেলে দিলাম। সে নিজেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল।

এই কিছুক্ষণ আগে সে দেশে রওনা হয়ে গেল। তখনই কেবল আমরা একবারের জন্য মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আমার কাছে সে যেন এই কথাটাই বলতে চাইছিল 'এরপরে আমি আর আসব না।' সেও কিছু বলে নি মুখে, আমিও চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু আমার মন ভালো ক'রেই জানে— অতঃপর সে এদিকে আর পা বাড়াবে না।

না আসে না আসুক, আমি তাকে আমার গায়ে হাত দিতে দেব না। হাত-পা টিপে দেওয়া এবং আরও নানারকমের সেবাশুশ্রূষা করার হাত থেকে বাঁচা গেল।

আমি মায়ের কাছে বলে দিয়েছি, কাজকর্ম করা ও রান্নাবান্নার জন্য দুটো লোক রাখতে পারো! কাজকর্ম পড়লে মামা এসে আমাদের এখানে থাকতে পারে, খেতে পারে। কাজের দরকার হলে চাকরকে দিয়ে কাজ করাবে। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।

কিন্তু মামাকে তো আমি জানি। সে যে আর এখানে আসবে না তার কৈফিয়ৎস্বরূপ এই কথাই বলে বেড়াবে— 'গঙ্গা কোন্‌-না-কোন্ একটা শূদ্রের রক্ষিতা হয়ে আছে। এখন আর সেখানে গেলে আমাদের মানমর্যাদা থাকবে না।'

কিন্তু ইতিমধ্যে মা হয়তো গণেশের বাড়ীতে বসে এই কথাই ভাবতে থাকবে যে, মামা বরাবরের মতো আসবে, যাবে, তারপরে অনেকদিন পরে দেখা হলে জিজ্ঞেস করবে 'কেন আসোনি দাদা?' মামা তো ঐ একই উত্তর দেবে। আর মায়ের কাছেও তার দাদার উত্তরটা খুব ন্যায্য বলেই মনে হবে। কারণ মা তো ঐ কারণেই চলে গেছে।

রাত ন'টা হতে চলল। ক্ষিদে নেই তবু কিছু খেতে হবে। সদরের

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে ভিতরে এলাম।

থালায় ভাত নিয়ে বসলাম। হঠাৎ কী রকম সন্দেহ হল— 'সদর দরজায় খিল দিয়েছি তো?'

হাতটা ঝেড়ে উঠে গেলাম।

23

দু'তিন দিন হল মর্নিং ওয়াক্ হয়নি। মঞ্জুর সঙ্গে দেখা নেই সেও আজ দু'তিন দিন হবে।

উনি অফিসে এলেন। আমি ওপর থেকে নীচে তাকিয়ে দেখলাম গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে মাথা বাড়িয়ে উনি ওপরের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। আমিও কাচের জানালায় মুখ চেপে নীচে তাকালাম। কিন্তু তা উনি জানতে পারলেন না: সিগরেটের ধোঁয়ায় মুখ আচ্ছন্ন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি এখনও দু' মিনিট বাকী। সীট্-এ এসে বসলাম।

এই সপ্তাহের পত্রিকায় র কু. ব. লিখিত একটি গল্প ছাপা হয়েছে। দুপুর-বেলায় পড়লাম গল্পটা। এখন একবার এমনিই উলটেপালটে দেখছি। সেই 'অশ্বমেধ' গল্পটি বেরুবে বলে আমিও প্রত্যাশায় ছিলাম! কিন্তু লেখক প্রতিশ্রুতি-মতো গল্প লেখেন। এই গল্পটাও অবশ্য ভালোই: কিন্তু আরেকটি গল্পের প্রত্যাশায় থেকে সেটি না পেলে তার বদলে অন্য একটি ভালো গল্প পড়লেও আশা যেন মেটে না, মনে হয় প্রতারিত হয়েছি।

পাঁচটা বাজলো। উঠে রওনা হলাম। হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে পত্রিকাটির মাথাটা বেরিয়ে আছে। আজকে বড়ো ব্যাগটা আনতে ভুলে গেছি। লিফ্‌টের কাছে বেশ ভীড়। ভাবছি আগেই রওনা হয়ে এই দু' মিনিট যদি এখানে এসেই দাঁড়িয়ে থাকতাম ভালো হত। লিফ্‌ট এসে গেল। সকলেই ঠেলাঠেলি ক'রে ঢোকার চেষ্টা করছে। সকলেরই খুব তাড়া। আমি কোনোরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে সরে দাঁড়ালাম। লিফ্‌ট অপারেটার কে-একজনকে একটু সরে আমাকে পথ ছেড়ে দিতে বলল। 'ও! আই অ্যাম্ সরি' বলে সেই স্যুট-পরিহিত ব্যক্তি সরে গিয়ে আমাকে পথ দিল। সে আমার পিছনে লিফ্‌টের মধ্যে আসতেই দরজা বন্ধ ক'রে বোতাম টিপে দিল অপারেটার। সাঁ ক'রে লিফ্‌টা নেমে এল। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে আসতেই সকলের আগে আমি বেরুলাম। আমার পিছনের লোকেরা হুড়মুড় ক'রে আমার সামনে এগিয়ে গেল। আমি বাইরে আসতেই উনি আমায় দেখলেন। গাড়ার দরজা খোলাই রেখেছিলেন। গাড়ীতে উঠে ওঁর পাশে বসতেই মানসিক উত্তেজনা অনেকটা হ্রাস পেল। অন্য লোকে যাতে জানতে না পায় এই কারণে

মনের চাঞ্চল্য গোপন ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার কাছে তো কিছু অগোচর নেই! ব্যাগ থেকে রুমাল বের ক'রে কপালটা মুছলাম। উনি বললেন :

'মনে হচ্ছে কী জানো তোমাকে যেন অনেক দিন দেখি নি। আজও দুপুর বেলা যে ফোন করেছিলাম খুব ভয়ে ভয়ে, কী জানি যদি বলে ফেলো আজও আসবার দরকার নেই। জোর বরাত যে আসতে বললে।' এই বলে উনি শিশুর মতো খুশী হয়ে উঠলেন। উনি আমাকে দেখলেই কীভাবে খুশী হয়ে ওঠেন! আমার কী সত্যিই সেরকম কোনো গুণ আছে নাকি? আমি বললাম : 'হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘকাল আপনার সঙ্গে দেখা নেই। আজকে আমিই আপনাকে ফোন করতাম। কিন্তু আপনিই আগে করে ফেললেন। ফোনে আপনার গলার আওয়াজ শুনতেই কত যে আমার আনন্দ হল জানেন?' বলতে গিয়ে আমার গলা রুদ্ধ হয়ে আসে!

হঠাৎ মনে হল এই সমস্ত ব্যাপারকে কী বলে? এরই নাম কি ভালোবাসা—আমরা কি দুজন প্রেমিকের মতো কথাবার্তা বলছি? এই কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা কিসের? ওঁর শরীর, মন ও জীবন সম্পর্কে আমি কত আগ্রহ নিয়ে ভাবি। উনিও ঠিক তেমনি ভাবেন আমার সম্পর্কে। উনিই বা কে! আমিই বা কে! কেমন ক'রে গজিয়ে উঠল এই বন্ধুত্ব! অনেকের কাছে সম্পর্ক একটা খুব বৃহৎ ব্যাপার— কবিতার মতো আরম্ভে যার পরস্পর আকর্ষণী শক্তি— যার অপর নাম ভালোবাসা এবং উপসংহারে যার পর্যবসান সেক্স্‌-এ। আমাদের দুজনের সম্পর্কটা একটু অদ্ভুত— যার আরম্ভে ছিল সেক্স নামক দুর্ঘটনা, বলা যায় জান্তবতা এবং এখন যার মধ্যে এসেছে দায়িত্ববোধ, বন্ধুত্ব, কে জানে শেষ পর্যন্ত এই সম্পর্ক স্নেহে ভালোবাসায় পরিণত হতে পারবে কি না?

মাউন্ট রোডের ওপর দিয়ে যেতে যেতে উনি বললেন— 'কী ভাবছ গঙ্গা?'

'না, বিশেষ কিছু না।' মাথা তুলতেই দেখা গেল সামনে একটা রেডিওর বিজ্ঞাপন। দুপুরবেলায় আমি রেডিও কেনার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে রেখেছি। এবং সেই সময়েই ওঁকে ফোন করব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা একদম ভুলে যাই। সেই মেয়ে মীনা সন্ধ্যাবেলা এসে জালিয়ে খাবে— 'কই মামী আপনার ট্রানজিসটার? বলেছিলেন যে আজ নিয়ে আসবেন।'— মীনার কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম— 'একমিনিট··· আমার একটা ট্রানজিস্‌টার কিনতে হবে। আপনার কোনো জানা দোকান অথবা যে-কোনো একটা রেডিওর দোকানের সামনে গাড়ী রাখুন। আমি আবার রেডিওর ভালোমন্দ সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'আমিই বা কী জানি? ওসব হল মঞ্জুর লাইন। পদ্মার একটা সেভেন ব্যাণ্ড-ওয়ালা রয়েছে। আমার মনে হয় আমাদের ফার্মও রেডিও নিয়ে ডিল করে। আমাদের কোম্পানির এজেন্সি আছে বলে মনে পড়ছে। তোমার কি এক্ষুনি চাই?

আজই চাই ? কাল ভালো দেখে আমিই একটা পাঠিয়ে দেব।'

'উহুঁ, আজই এক্ষুনি চাই। বাড়ীতে একা একা থাকতে একদম ভালো লাগে না।'

'কেন ? তোমার মা আসেন নি ?'

'এসেছিলেন। এসে আবার ফিরে গেলেন।'

উনি গাড়ীটা ঘুরিয়ে একটা রেডিওর দোকানের সামনে এনে দাঁড় করালেন। আমরা দুজনেই নেমে ভিতরে গেলাম। অনেকেই আমাদের দিকে চেয়ে রইল। আমাদের দেখতে কি বেশ উপযুক্ত জুটি বলে মনে হয় ? কয়েকজনের দৃষ্টিতে তো যেন আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে।

প্রকাশ্যে পুরুষ সঙ্গী থাকলে মেয়েদের মর্যাদা বাড়ে। অশিষ্ট দৃষ্টিতে তাকাতে ভয় পায়। তাও নির্ভর করে সেই পুরুষের মর্যাদার ওপর। উনি দেখতে বেশ 'ম্যান্‌লি' চেহারার লোক। কিছুটা রূঢ়তা যে না আছে এমন নয়। ওটুকু রূঢ়তা দরকার বলেই মনে হয়। এই যে আমরা দুজনে দোকানের দিকে হেঁটে চলেছি, হঠাৎ কোথা থেকে আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে একটা লোক চলতে শুরু করল। উনি এমনি একটু ফিরে তাকাতেই লোকটা সরে পড়ল। এই সমস্ত ক্ষেত্রে একা একা এলে লোকগুলো চলতে চলতে এসে ঘাড়ের ওপর পড়বে। গলার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে বিয়ের চিহ্ন মঙ্গলসূত্র আছে কিনা। দুটো লোক এক সঙ্গে থাকলে নানারকম মন্তব্য করবে। বিনা কারণে ফ্যাক ফ্যাক ক'রে হাসবে। এখন কিন্তু আর কাউকে সেরকমটা দেখা যাচ্ছে না।

রেডিওর দোকানে খুব আদর আপ্যায়ন করা হল। আমাদের সোজা নিয়ে যাওয়া হল দোকানের মালিকের ঘরে। এয়ার কণ্ডিশন্‌ড্‌ ঘর। মালিক উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের খুব অভ্যর্থনা করলেন, কফি খেতে দিলেন। মালিক কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। উনি যে কতটা প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সেটা যারা ওঁকে এই পরিবেশে দেখেছে তারাই জানে। এই রকম লোককে একটা ট্রান্‌জিসটার কেনার জন্য দোকানের মধ্যে টেনে এনে দাঁড় করানোটা একটা মস্ত বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে আমার

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেবিলের ওপর নানারকম ট্রান্‌জিসটার এনে সারি সারি জমা করা হল। ভিন্ন ভিন্ন স্টেশন থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রাম-এর কোলাহল বেজে উঠল। অবশেষে সেই মালিক ভদ্রলোকই একটি ট্রান্‌জিসটার দেখিয়ে বললেন— 'এটি হল জাপানের ট্রান্‌জিসটার…'

উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন— 'হাউ ডু ইউ লাইক দিস্‌ ?' আমি লক্ষ্য ক'রে দেখছিলাম এই জাপানী যন্ত্রটিকে কী ক'রে অপারেট করতে হয়। ওঁর কথার উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ হল না। দোকানের মালিক এটির খুব সুপারিশ করতে উনি বললেন— 'ও.কে., প্যাক্‌ ইট আপ্‌।' আমি ওঁর কাছে একটু মৃদুকণ্ঠে

জিজ্ঞেস করলাম, 'দাম কত?'

উনি আমার কথায় হাসলেন, হেসে বললেন— 'এরকম একটা লেনদেনের ব্যাপার যে আছে সেটা আমার খেয়াল ছিল না। আর একটা কথা জানো? এর জন্য আমাদের এখন টাকা দিতে হবে না। কারণ এটা এসেছে আমাদের অফিসের থ্রুতে। আমাদের যে টাকাটা প্রাপ্য হবে তার থেকেই কেটে নেবেন দামটা। আমি বললাম— 'এটা তো আমি কিনেছি আমার ব্যবহারের জন্য।'

'নো! আমি এটা তোমাকে প্রেজেণ্ট দিচ্ছি। আমি আজ পর্যন্ত তোমাকে একটাও প্রেজেন্টেশন দিই নি। প্লীজ··· তোমার উচিত নয় আমার এই অনুরোধ না শোনা।'

'আমি কী যে বলব বুঝতে পারলাম না। ভাগ্য ভালো যে সে ঘরে আমরা দুজন ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। 'ঠিক আছে, যাই হোক-না-কেন, দামটা একবার জেনে নিই।'

'হী উইল ব্রিং দ্য বিল নাউ' একথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মালিক হাত-ভর্তি কাগজপত্র নিয়ে এসে হাজির। আমার নাম ঠিকানা সমস্ত লিখলেন এবং দু'দিনের মধ্যেই লাইসেন্স এসে যাবে বললেন। আমি একবার বিলটার ওপর চোখ বুলোলাম— 'অরেব্ বাবা, আটশো কুড়ি টাকা? ইট ইজ টু মাচ্?'

ট্রানজিস্টার কিনে আমি যথাসময়ে বাড়ি এসে পৌঁছলাম। রান্না করতে হবে। তাছাড়া ঘন ঘন ওঁর বাড়ীতে যাওয়াটা কেমন কেমন লাগে। সেদিন পদ্মার মনোভাবটা ভালো লাগল না। উনি যখন আমাকে পৌঁছে দিতে এলেন তখন সঙ্গে ক'রে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে এলাম। সকালের দুধ ছিল তাই দিয়ে ওঁকে কফি তৈরী ক'রে দিলাম। খেয়ে বললেন— কফি নাকি খুবই ভালো হয়েছে।

ট্রান্‌জিস্‌টারটা তুলে টিপয়ের উপর রেখে উনি ট্যূন্ ক'রে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমি কর্ণাটক সংগীত ভালোবাসি কিনা। আমি বললাম—'গানের আমি কিছুই জানি না। একা একা থাকি— যে-কোনো কণ্ঠস্বর শুনলে মনে হয় একটা সঙ্গী আছে সেইজন্যই একটা টান্‌জিস্‌টার কেনার কথা ভেবেছিলাম। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য অতগুলো টাকা খরচ করার কোনো মানে হয়? ওখানে বসে কিছু বলাটা ঠিক মর্যাদার উপযুক্ত নয় বলে আমি চুপ করে ছিলাম। এখন বলছি এটা আপনি আপনাদের বাড়ীতেই নিয়ে যান। আমাকে দু'তিনশো টাকার একটা সাধারণ রকমের কিনে প্রেজেণ্ট করবেন, তাতেই হয়ে যাবে।' আমার এই কথায় ওঁর মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কফি খেতে খেতে আমার দিকে যেন খুব করুণ ভাবে তাকাচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম— 'কোনো কিছু অন্যায় বলে ফেলেছি কি?'

'তা বলেছ বৈকি! বন্ধুদের প্রেজেণ্ট দেওয়া জিনিস কোনো কারণ দেখিয়েই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়।'

'আই অ্যাম সরি' বলে ওঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বললাম— 'আপনি যে উপহার দিয়েছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমি সত্যিই খুব খুশী।' সঙ্গে সঙ্গে উনি কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন— 'কর্ণাটক সংগীত আমার ভালো লাগে, ভালো লাগে ব্যাজ, হিন্দুস্তানী সংগীত, কিন্তু সিনেমার গান আমার সহ্য হয় না। পদ্মা আবার দিনরাত ঐ গান নিয়েই থাকবে।'

আমি বললাম— 'দু'তিন দিন হয়ে গেল মঞ্জুকে দেখি নি।' উনি একটু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন— 'হ্যাঁ তা হবে।' জিজ্ঞেস করলাম— 'আপনি সঙ্গে আনেন নি কেন?'

'কী জানো, আমি বেরোবার সময়ে দেখি ও ঘুমুচ্ছে। মর্নিং ওয়াকে যাওয়া হয় না বলে সকালেও ওকে দেখতে পাই না।'

আমি বললাম— 'কাল থেকে আবার আমরা মর্নিং ওয়াকে বেরুবো। ভালো কথা, এখন আপনার প্রোগ্রাম কী?'

উনি হাসলেন, তারপরে চোখ টিপে বললেন— 'তোমার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিতেই হবে?'

আমিও গম্ভীরভাবে বললাম— 'বলুন না।'

'একজন মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাব। বলেছি বটে গার্ল ফ্রেণ্ড, বন্ধু-টন্ধু কিছুই নয়, শুধুই গার্ল। মেয়েই বলো, আর ছেলেই বলো, ইন্ দ্য রিয়েল সেন্স অব দ্য টার্ম আমার একজনই বন্ধু— 'ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড— সে হল তুমি। কাজেই অন্য কাউকে বন্ধু বলা আমার সাজে না। এই আর কি··· সাম্ সর্ট অব··· কী বলে ওকে···' এইভাবে কথা টানতে লাগলেন।

আমি হেসে বললাম— 'ব্যস ব্যস আপনাকে আর বলতে হবে না, আমি সবই বুঝতে পেরেছি।' যেন অপমানিত হয়েছেন এইভাবে সলজ্জ ভঙ্গীতে মাথাটা নোয়ালেন তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি আমাকে একটা সত্য কথা বলবে? তোমার মা ঝগড়া ক'রে এই বাড়ী ছেড়ে গিয়েছেন, না? তাও আমার ব্যাপারে না?'

'ইয়েস্' হককথায় জবাব দিয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনিও আমার দিকে চেয়ে রইলেন, কী ভাবছেন বুঝতে পারা গেল না। আমাকে ডাকলেন 'গঙ্গা।' 'ইয়েস্'। তখন উনি ইংরেজী বলতে আরম্ভ করলেন— 'দেখ, আমাদের অবস্থা, আমাদের এই পারস্পরিক স্নেহ, ম্যুচুয়াল অ্যাফেক্‌শন্, কেউ বুঝতে পারবে না। বিশ্বাসও করবে না আন্‌লেস্ ইউ গেট ম্যারেড টু সামওয়ান।'

'সো! হু কেয়ার্‌স্ ফর্ ইট?'— কী একরকম আনন্দমিশ্রিত গর্বের সঙ্গে আমি উত্তর দিয়ে বললাম— 'কে কী ভাবছে না-ভাবছে তাতে আমাদের কী? আমি আমাদের এই ভালোবাসার মধ্যেই অর্থ খুঁজে পেয়েছি। আমি তৃপ্তি পেয়েছি। এই জীবনই আমার কাম্য।'

এমন সময়ে মীনা এসে উপস্থিত। ট্রান্‌জিস্‌টারে কী একটা সিনেমার গান অনুচ্চস্বরে বেজে চলেছে। আমি মীনাকে ডেকে বললাম— 'এসো মীনা. এসো।' মীনা ভিতরে এসে ওঁর দিকে চেয়ে রইল। আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম— 'এই মেয়েটি হচ্ছে মীনা— পাশের বাড়ীর মেয়ে।'

'না, পাশের বাড়ী নয়, দুটো বাড়ীর পরে।'

'ওই হল আর কি! মীনা আমার মায়ের বন্ধু। এখন আমার বন্ধু। ট্রান্‌জিস্‌টার কেনার আইডিয়া এই মীনাই আমাকে দিয়েছে। কেমন মীনা পছন্দ হয়েছে?'

মীনা সেই আগের মতোই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। একটুক্ষণ পরে বলল— 'খুব ভালো হয়েছে মাম। সমস্ত স্টেশন শোনা যাবে। অনেক দাম না?' এই দামের কথাটা বলতে বলতে মীনা হাত দিয়েও দেখল। তারপরে নিজেই টুান্ করতে করতে বলল— 'এখন মাদ্রাস স্টেশনে সিনেমার গান দিচ্ছে।'

প্রভু চলে গেলেন। সকালবেলা মঞ্জুকে নিয়ে আসবেন কথা দিয়ে গেলেন! পরদিন সকালে গাড়ীর হর্ন শোনা মাত্রই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, নাঃ মঞ্জুকে তো দেখছি না। উনি একাই বসে আছেন গাড়ীর মধ্যে।

আমি দরজায় তালা লাগিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। মঞ্জু কেন এল না সে বিষয়ে আমি কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। আমার মন যেন বুঝতে পেরেছে যা বলার উনিই বলবেন। না বলা পর্যন্ত আমি কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করব না বলে চুপ ক'রে রইলাম। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে দুঃখে ও রাগে গম্ভীর।

দু'জনেই চুপচাপ বসে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে উনি খুবই মর্মাহত। আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। খুব কষ্ট লাগছিল। জিজ্ঞেস না ক'রে পারলাম না 'হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার? কী ব্যাপার?' শিশুর মতো ওঁর ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। আমি ও'র গায়ে হাত দিয়ে বললাম (এই আমি প্রথম স্পর্শ করলাম ওঁকে)— 'ছি ছি! এসব কী?' আমার কথায় উনি কেঁদে ফেললেন। আমি তাড়াতাড়ি রুমাল বের ক'রে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম— 'প্লীজ··· কী হয়েছে বলুন! কেউ দেখে ফেলবে। উনি রুমালটা নিয়ে মুখটা মুছে ফেললেন। চোখ ও নাক লাল। গলাটা পরিষ্কার ক'রে একটা সিগারেট ধরালেন। এইভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন— 'আই অ্যাম সরি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম— 'কী হয়েছে বলুন তো।'

'আমি কাল তোমাকে বলেছিলাম কিনা, আমাদের এই স্নেহকে কেউ বুঝতে পারবে না, বিশ্বাসও করতে পারবে না।' এইটুকু বলতে গিয়েই ওঁর গলাটা

ধরে এল— 'মঞ্জুও বিশ্বাস করে নি। আজ মর্নিং ওয়াকের জন্ত ডাকতে বলে দিল সে আসবে না। কেন আসবে না জিজ্ঞেস করাতে কত কী কথা বলল... হাউ রিডিকিলাস্!' ওঁকে এখন দেখলে মন মায়ায় ভরে ওঠে। আহা! কেমন শিশুর মতো হয়ে গেছেন।

আমি বললাম— 'মঞ্জুর কোনো দোষ নেই। কারণ আমি বুঝেছি। ডোণ্ট বদার্। আমি মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলব। ভালো মেয়ে সে। কেউ কিছু বলে ওর কান ভারী করেছে বলে ও অত্যন্ত বিচলিত। আমিই মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলব।' এইভাবে ওঁকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করলাম।

গান্ধী মূর্তির কাছে গাড়ীটা থামিয়ে সেই জাপানীটিকে তিন দিনের পয়সা একসঙ্গেই দিয়ে দিলেন।

আমরা দুজনে হাঁটা শুরু করে দিলাম। আজ মঞ্জু আসে নি। মনে হচ্ছিল দুজন লোক একলা একলা হেঁটে চলেছে।

24

আধঘণ্টা হল মঞ্জু এখানে এসেছে। মনে হচ্ছে মঞ্জুর মা পদ্মা জানে না যে আমার বাড়ীতে।

আজ সকালে আমি মঞ্জুকে যখন ফোন করি অফিস থেকে, তখন মঞ্জুর বাবা আমার সঙ্গে ছিলেন। অফিসে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওঁকে বলেছিলাম মঞ্জুকে ফোন করার কথা। মঞ্জু ও আমি ফোনে কী কথা বলি সেইটে জানবার জন্য উনিও গাড়ী থেকে নেমে আমার অফিসে এসেছিলেন। এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপরে নীচে কা সব দেখছিলেন। আমাদের অফিসে এই ওঁর প্রথম আসা। তখন দশটা বেজে গেছে। এই সবেমাত্র একের পর এক কর্মচারীরা আসছেন।

'প্লীজ কাম ইন্' বলে আমি ওঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম। আমার টেবিলের সামনেকার দু'খানা চেয়ারের মধ্যে একখানা টেনে নিয়ে বসতে বললাম ওঁকে। কত রকমের ভিজিটার্স এসে বসে বসে বিরক্তি ধরিয়ে দেয়. আজ আমার সেই এই একজন মাত্র ভিজিটার প্রথম এলেন। এত বছর আমি এখানে কাজ করছি, কিন্তু আমার কোনো ভিজিটার ছিল না।

রঙ্গস্বামী গেলাসে জল এনে তার ওপর সেই প্লাস্টিকের ঢাকনিটি দিয়ে রাখল। ওকে দু' কাপ কফি আনতে বলে পাঠিয়ে দিয়ে মঞ্জুকে টেলিফোন করলাম। ভাগ্যিস! মঞ্জুই ধরেছে। 'আমি গঙ্গা কথা বলছি' বলার পরে কিছুক্ষণ মঞ্জুর মুখ দিয়ে যেন কথা বেরুচ্ছিল না মনে হল। এদিকে আমিও মঞ্জু কী বলে তা শোনার জন্য নীরব হয়ে রইলাম। মঞ্জু আমাকে 'উইশ' পর্যন্ত করল না। খুবই

বিচলিত হয়ে পড়েছে বোঝা গেল। গলা পর্যন্ত বদলে গেছে যখন সে বলল—'বাবা বাড়ী নেই।'

'তোমার বাবা আমার এখানেই বসে আছেন। আমি তোমার সঙ্গেই কথা বলব বলে ফোন করেছি। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই, মঞ্জু! বর্তমানে তোমাদের বাড়ীর যে পরিবেশ তাতে তোমার ওখানে এসে দেখা করা ঠিক হবে বলে মনে হয় না। কাজেই তোমাকে আমার বাড়ীতে আসতে বলছি। আজ তো শনিবার। দুপুরবেলা আমাদের বাড়ীতে এসো। তোমার বাবা সেখানে থাকবেন না। আমি তোমার সঙ্গে একা কথা বলব।' বেশ একটু অধিকার প্রকাশের ভঙ্গীতেই কথাগুলি বললাম।

মঞ্জু তবু চুপচাপ। আমার গলার দৃঢ় ভঙ্গীটাকে একটু কোমল করবার জন্যই যেন তাকে জিজ্ঞেস করলাম— 'মঞ্জু, আর উই নট গুড ফ্রেণ্ডস্?' যেন ক্লাসরুমে উত্তর দেওয়ার মতো সুরে মঞ্জু বলল— 'ইয়েস্!' আমি তাকে ইংরেজীতেই বললাম—' মঞ্জু, দুই বন্ধু যাদের মধ্যে স্নেহের কোনো অভাব নেই— তারা কোনো প্রকার মনোমালিন্য ছাড়া অন্য কী কারণে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে, তার জন্য, আর কিছু না হোক, অন্তত গুড বাই বলাটাও উচিত নয়?' মনে হল আমার কথায় মেয়েটা কেঁদে ফেলেছে।

'আই অ্যাম সরি' বলে মঞ্জু কী একটা কথা বলতে আরম্ভ করলেও তার গলাটা রুদ্ধ হয়ে এল। মঞ্জুর এই অবস্থা অনুমান ক'রে আমারও খুব কষ্ট হল। আমি বললাম— 'মঞ্জু, খুব সহজভাবেই নাও— টেক ইট ইজি। তোমাকে অনেক বিষয়ে বলার আছে। সেইজন্যই আমাদের দেখা হওয়া দরকার। সমস্ত কথা বিশদ ক'রে বলবার সময় হয়েছে মঞ্জু।' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই 'ঠিক আছে, আমি দুটোর সময়ে আপনাদের বাড়ীতে আসব' এই বলে মঞ্জু 'টক্' করে রিসিভারটা রেখে দিল।

'উনি খুব কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞেস করলেন— 'কী কী বলেছে মঞ্জু?'

'সে আমাদের বাড়ীতে আসছে দুপুরবেলায়।'

'তুমি মঞ্জুকে কী বলতে চাও?'

'যা বলবার ওকে বলে পরে আপনাকে জানাব।'

আমাদের দুজনেরই মুখের ভাব বদলে গেল। উনি বোধকরি এখন ভাববার চেষ্টা করছেন সেই বারো বছর আগেকার এক সন্ধ্যাবেলার ঘটনাগুলি। হয়তো সেই বিষয়েই আজ আমি ওঁর মেয়ের কাছে বলতে যাচ্ছি। আচ্ছা ওঁর ব্যাপার-স্যাপার ওঁর পরিবারের লোকেরা জানে না কি? তবে এটা ঠিকই যে মঞ্জু তার কীর্তি জানবে আমার কাছ থেকে এটা উনি নিশ্চয়ই পছন্দ করছেন না। ওঁর মন এই ভেবে সংকুচিত হচ্ছে যে আমাদের ভালোবাসার স্বরূপ কী।

রঙ্গস্বামী কফি নিয়ে এল। আমি সাধারণত অফিসে বসে কফি ইত্যাদি

খাই না। কাজেই আমার কাছে না আছে ফ্লাস্ক, না আছে জগ্। তার বদলে আছে জল ঢাকার জন্য এই প্লাস্টিকের ঢাকনি। রঙ্গস্বামী তখন আমাদের জন্য গরম কফিটাকে একটু ঠাণ্ডা করতে গিয়ে গ্লাসে ঢালাঢালি করছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম— 'রঙ্গস্বামী! এই গেলাস, মগ এগুলো কার?'

'আমাদের হেডক্লার্ক মিসেস ম্যানুয়েলের। নতুন দিদিমণি। এই তো কাল কেনা হয়েছে। আমাদেরও কিনে রাখা দরকার। ভারি তো দাম, মাত্র তিন টাকা।' রঙ্গস্বামীকে থামিয়ে দিয়ে বললাম— 'ঠিক আছে. জায়গাটা পরিষ্কার করে নাও।'

অফিসের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। এক দৃষ্টিতে গোটা হলটা দেখতে পাচ্ছি। প্রায় সকলেই যে-যার সীটে বসে আছে। ম্যানুয়েলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে আমাকে 'উইশ' করল। আমিও প্রত্যুত্তর দিলাম। সকলেরই লক্ষ্য এখানে অর্থাৎ আমার দিকে। মেয়েরা একে অন্যের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করছে। এসব দেখে আমার মনে কিন্তু খুব গর্বের ভাব।

আমি কফিটা শেষ ক'রে ওঁকে বললাম— 'দুপুরে আপনার আসার দরকার নেই। আমিই ট্যাক্‌সি ক'রে বাড়ী চলে যাব। আপনি সন্ধ্যার দিকে আসুন। মঞ্জুকে আমি যে-সব কথা বলব তার সমস্ত বিবরণ আপনাকে শোনাব।'

'ও. কে.' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'আই উইল সি ইউ অফ' বলে আমিও ওঁর সঙ্গে গেলাম। লিফ্‌ট পর্যন্ত আমিই আগে আগে, উনি একটু পিছনে। তারপরে আমরা একসঙ্গে লিফ্‌টে উঠলাম। নীচে এসে ওঁর গাড়ী পর্যন্ত গিয়ে ওঁকে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে বললাম— 'মঞ্জু এখন আর শিশু নয়। নিন্দা-অপবাদের গুজবগুলি ও বিশ্বাস ক'রে থাকবে. তার চেয়ে সত্য কথা জানাটাই ভালো। আমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্কের জন্য আমি কখনও লজ্জিত নই। মঞ্জুর সব জানা উচিত।' এই বলে দরজার ওপর রাখা ওঁর কনুই-এর ওপর আস্তে একটু স্পর্শ ক'রে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম— 'সন্ধ্যাবেলায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।' এই বলে, মা যেমন তার সন্তানকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দেয়, আমিও তেমনিভাবে ওঁকে বিদায় দিলাম। গাড়ী চলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরেও কিছুক্ষণ সেখানেই এবং সেইভাবেই কাটল। সকলে ভাবছে কী? কী ভাবছে তাতে আমার কী?

অফিস ছুটি হতেই একটা ট্যাক্‌সি ধরে সোজা বাড়ীতে এলাম। আমার আসার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মঞ্জুও এসে গেল। মঞ্জু যেন এই প্রথমবার আমাদের বাড়ীতে এল এমনই একজন অপরিচিত লোকের মতো এসে সদর দরজায় দাঁড়াল। আমি বরাবরের মতো সৌজন্যের সঙ্গে মঞ্জুর হাত ধরে ভিতরে নিয়ে এসে বসতে বললাম এবং আমিও তার মুখোমুখি বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম— 'আজকাল তুমি বেড়াতে আসো না কেন?' মঞ্জু তার লেখাপড়া ও

পরীক্ষার ওপর দোষ চাপিয়ে কী একটা অস্পষ্ট উত্তর দিল।

'আমিও আজকাল আর তোমাদের বাড়ীতে আসি না' এই বলে আমি মঞ্জুর মুখের দিকে তাকালাম। মঞ্জু একটু মাথা নেড়ে মেজের দিকে তাকিয়ে রইল! ভেবেছিলুম মঞ্জু জিজ্ঞেস করবে— 'কেন আসছেন না আমাদের বাড়ীতে। কিন্তু মঞ্জু সেরকম কিছু জিজ্ঞেস করল না। আমি মঞ্জুদের বাড়ীতে কেন যাই নি তার কারণ জিজ্ঞেস করার বদলে মঞ্জু বোধকরি এখন এই কথাই ভাবছে যে তাকে কেন আমাদের বাড়ীতে আসতে বলা হয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু খাবে মঞ্জু?'

'না, এই মাত্র আমি খেয়ে এসেছি।'

'আমি সেই সকালবেলায় খেয়ে বেরিয়েছি। ক্ষিদে পেয়েছে' —এই ব'লে ভিতরে গিয়ে টিন থেকে অনেকগুলো বিস্কুট প্লাস্টিক থালার ওপর রেখে দুজনের মাঝখানে রেখে দিয়ে আমি একটা তুলে মুখে দিলাম।

আধঘন্টা হল মঞ্জু এসেছে। এখন মঞ্জুও একখানা বিস্কুট তুলে নিল। কথাটা কোথায় আরম্ভ করতে হবে এবং কী ভাবে করতে হবে এখনও ঠিক করতে পারি নি। ভাগ্যক্রমে 'অগ্নিপ্রবেশ' গল্পটার কথা মনে এল। আমি বললাম— 'আচ্ছা মঞ্জু, এই যে তুমি বেড়াতে আসছ না, আমি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি না, এই যে আমাদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে না— এর কি কোনো কারণ নেই বলে তুমি করো?'

মঞ্জু এতক্ষণ মেজের দিকে তাকিয়েছিল। এবারে দৃষ্টি তুলে ভুরু উঁচিয়ে মুখখানা একটু কাৎ ক'রে আমার দিকে তাকাল। আরে বাবা! মঞ্জুর চোখ দুটি কী বড়ো বড়ো! মঞ্জুর চোখ দুটি দেখলেই মনে হয় যে এখনও সে শিশু। নইলে সেও আমার মতো একজন নারী। আমার মতো লম্বা, আমার মতো দেহের আয়তন। আমার মতোই শাড়ী পরা। যদি সে আমার মতো মাথায় খোপা বাঁধত, তাহলে কোনো পার্থক্যই থাকত না। তবে এই চোখ দুটি দেখলেই বোঝা যায় যে সে এখনও শিশু।

আমি এখন একটার পর একটা প্রশ্ন করলাম— মঞ্জুর বেড়াতে না আসা, আমার মঞ্জুদের বাড়ীতে না যাওয়া, আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ না-হওয়া, এখন আমার ও মঞ্জুর সাক্ষাৎ— এই সমস্ত ব্যাপারের পিছনে যে একটা করেছে সে কথা মঞ্জুর চোখ দেখলেই বোঝা যায়।

আচ্ছা মঞ্জুরও কি কোনো বয়-ফ্রেণ্ড আছে না কি? এ যুগের কোনো মেয়েকে বিশ্বাস করা যায় না। এরা দেখতে শুনতে নিরীহ, চারিদিকে টো টো ক'রে বেড়াতে এদের বাধে না। আমার যে এত বয়স হয়েছে, তা আমাকেও এরা ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু মঞ্জুর বয়সে আমি যেমন বোকা ছিলাম, মঞ্জু কখনোই তা হতে পারে না। আমি যদি একে জিজ্ঞেস করি তাতে আর কী? আমি তো ওর বন্ধুই

বটে। আমি কেন একথা ভাবছি যে এই বিষয় নিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করা উচিত নয়? মঞ্জুর বয়সের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম— 'আর ইউ নট্ এইটিন্।'

মঞ্জুর উত্তর: 'রানিং'।

একটু চোখ টিপে বললাম—'সো, ইউ হ্যাভ কম্‌প্লিটেড্ সুইট সেভেনটিন্।' মঞ্জুকে এই কথা বলার সময়ে আমার মনের মধ্যে জাগছিল 'সুইট' নয়, 'বিটার' সেভেন্টিনের কথা— সেই তিক্ত স্মৃতি। "আমিও এক সময়ে ছিলাম সতেরো বছরের মেয়ে।" একথাটা যে আমি কেন বললাম তা কি মঞ্জু বোঝে নি? অথবা আমি তার কাছে একটা অর্থহীন কথা বললাম বলে সে মনে করে?

আমি নিজের মনে মনে কথা বলছি যেন এইভাবে ইংরেজীতে বলে চললাম। মঞ্জুর মুখের দিকেও না তাকিয়ে, ওপরের কড়িকাঠের দিকে চেয়ে··· কিন্তু বলছি আমি কেবল মঞ্জুরই জন্য। কেমন করে বলছি? আমার কবেকার পড়া একটি ইংরেজী কবিতা— যা এখন মঞ্জুর পাঠ্যতালিকায় রয়েছে— সেই কবিতাটির প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বলে বলে তার ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি, অনেকটা এই ধরনে ধীরে ধীরে আমি কথা বলে চলেছি। ছাত্রী যেমন একবার হাতের বইয়ের দিকে আবার অধ্যাপকের দিকে তাকায়, মঞ্জুও সেইভাবে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

"আমারও এক সময়ে সতেরো বছর বয়স ছিল, কিন্তু আমার সতেরো মিষ্টি সতেরো হয় নি, এই সতেরো বছর বয়সেই জীবনের তিক্ততাকেই আমি প্রথম ভোগ করেছি। তোমার স্নেহশীল বাবা রয়েছেন। তিনি স্বামী হিসেবে ও মানুষ হিসেবে যতই খারাপ হোন-না-কেন, তিনি তোমার বাবা। তুমিও তাঁর আদরের মেয়ে। ইয়েস্, ইউ আর হিজ মোস্ট প্রেশাস চাইল্ড"—এই কথাটাই আমি ঘুরেফিরে—দু'দিন বলেছি বলে মনে হয়। এতক্ষণ আমি বসে বসে কথা বলতে বলতে কখন যে উঠে দাঁড়িয়েছি সে খেয়াল নেই. পুনরায় বসে পড়লাম। "আমার বাবার কথা আমার মনে নেই। আমি কোনোদিন কারও আদরের বস্তু ছিলাম না। একদিন তোমার মতো আমার বয়স ছিল, তোমার মতো কেবল বয়সটাই ছিল, আর কিছু ছিল না। আমি কেন এই সমস্ত কথা বলছি জানো? যাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, তারা একজন অপরজনকে ভালো করে জানবে এইটেই স্বাভাবিক। আমি মনে করি তোমার বিষয়ে আমার পক্ষে নতুন করে জানার মতো ঘটনা নেই। ইয়েস, আই ফীল ইট ইজ আনফেয়ার।" এই ব'লে থেমে আমি একটু মনোযোগ দিয়ে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকালাম। ওই সেই চোখ! এখন সেই চোখ দুটির মধ্যে নতুন কী একরকম হতবুদ্ধিতা!

এখন ভেবে দেখতে গেলে আমার খুব আশ্চর্য লাগে। সতেরো বছর বয়সে আমি কী বোকাই না ছিলাম! আমার সেই বোকামির কথা তুমি গল্পে পড়লেও বিশ্বাস করতে পারবে না। ও রকম গল্প লেখা মানে আজকের দিনের

কলেজের মেয়েদের বুদ্ধি ও সামর্থ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করাই তোমার মনে হয় ইউ আর রাইট্‌। শুধু কলেজে পড়া আর বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে কী হবে, সবকিছু নির্ভর করে যার যার পরিবেশের ওপর। এই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে পদ্মাদেবীর মতো একজন কড়া মা পাওয়া তোমার অদৃষ্টই বলতে হবে। তুমি আমার মাকে দেখেছ তো? রান্নাঘর ছাড়া আর কিছুই জানে না...তোমার কি মনে পড়ে সেই গল্পটা?" এই বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"কোন্‌ গল্পটা?" "অগ্নিপ্রবেশম্‌" "র. কু. ব-লিখিত?"

"ইয়েস, সে গল্প আমার জীবন-কাহিনীও বটে..." আমি মঞ্জুর মুখের দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে চললাম—"আমার সম্পূর্ণ কাহিনী বলতে গেলে বলা যায় র. কু. ব.-লিখিত ঐ অগ্নিপ্রবেশ গল্পটিই আমার জীবনকথা। হুবহু এক। সেই কলেজ, সেই বাস্‌ স্ট্যাণ্ড, সেই কার্‌, সেই মেয়েটি, সেই লোকটা, সব, সব—কিন্তু গল্পের পরিণতি সম্পূর্ণ পৃথক। আমার মা গল্পের মায়ের মতো নয়, গল্পের মেয়েরা এখন আর বাস্তব জীবনে নেই। আবার বাস্তব জীবনে বেঁচে আছে আমার যে মা, তাকে গল্পের মধ্যে পাওয়া যাবে না। সেই যে মেয়েটি, সে-ই আমি। আর সেই যে লোকটি, তিনি তোমার বাবা।" এই ব'লে আমি অন্য দিকে ফিরলাম। মঞ্জু আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

"এই ঘটনা ঘটেছিল বারো বছর আগে। তার পরেই আমার জীবনে একটা ছেদ এসে গেছে। কিভাবে এসেছে তা যদি বলি তাহলে তুমি এযুগের কলেজের ছাত্র, তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা মনে হবে অর্থহীন। মঞ্জু, তুমি আজ এমন একটা যুগে বাস করছ, বড়ো হয়ে উঠছ যে-যুগ বয়ফ্রেণ্ড্‌স রাখা, ডেটিংস ঠিক করা, প্রি-ম্যারিটাল সেক্‌সুয়াল্‌ রিলেশন্‌ রাখা ইত্যাদি কাজে খুব প্রচলিত না হলেও চিন্তায় গৃহীত হয়েছে। কাজেই তোমার এবং তোমার মতো অন্য আধুনিকাদের কাছে আমার জীবনকথা পাগলামি বলে মনে হলেও একথা মনে রেখো সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত পরিবেশে এরকম পাগলামি থাকেই। সেই রকম একটা পাগলামির বলি হয়েছি আমি।

"দেখো, এ হলো এমন একটা পুরোনো গল্প যার পরিণতি হয়ে গেছে এবং যাকে আর নতুন ক'রে সাজানো যাবে না। গল্প পুরোনো হলেও নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। আই অ্যাম্‌ নট কনফেসিং এনিথিং বাট্‌ আই হ্যাভ টু এক্‌স্‌প্লেন সামথিং—একথা ভেবো না যে তোমার করুণা, ক্ষমা ও সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য এই সমস্ত বলছি। যাতে তুমি কতগুলি জিনিস পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারো সেইজন্যই বললাম। আমি অন্য কারো ব্যাপারেই এতটা আগ্রহ বোধ করিনি, কিন্তু কেন জানি না আমার সত্যকার অবস্থা তোমার অন্তত জানা দরকার—এরকম একটা আশা আমার জেগেছিল। কেন জেগেছিল তা বলতে পারব না। কিন্তু মনে হয়েছিল তোমাকে জানাতে পারলে ভালোই হবে।

অন্যলোকে যা বলাবলি করে তা ঠিক নয়— আমি তোমার বাবার রক্ষিতা রমণী নই। ওরকম একটা অখ্যাতি অবশ্য আমিই ইচ্ছা করে তুলে নিয়েছি। কিন্তু এরকম কোনো সম্পর্ক নেই আমাদের। কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি— ব্যস্ এইটুকু মাত্র। তোমরা অবশ্য এর নাম দেবে 'প্রেম' না. তা নয়। ইট্ ইজ সামথিং মোর। এটা অন্য জিনিস। অন্য লোকে যা ভাবে সেরকম কোনো সম্পর্ক আমাদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে না। সেরকম কোনো সম্পর্ক কখনো গড়ে ওঠা মানে সমূহ বিপদ। এটা তোমার জানা দরকার। তোমার বাবার স্ত্রী বলে বলার অধিকার তোমার মায়ের যতটা, আমারও ঠিক সেই অধিকার তোমার বাবার উপপত্নী বলে নিজেকে চিহ্নিত করার। অন্যলোকে যাই ভাবুক-না-কেন. তুমি কেবল আমাদের সম্পর্কটাকে নোংরা না ভাবলেই হল। আই ডোন্ট নো হোয়াই, তবে একটা কারণ হতে পারে এই যে তোমার বাবার স্নেহ ভালোবাসা সন্তানদের মধ্যে তোমার ওপরই সবচেয়ে বেশি। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো বা না করো, সেটা বড় কথা নয়। বোধ হয় তোমার মা বাধা দিয়ে থাকবে। অবশ্য একদিক থেকে সেটা ঠিকই. কিন্তু তুমি আমাকে দেখে খারাপ মনে করে সরে গেলে সেটা ঠিক হবে না। তুমি ছোটো নও। আমার সমস্ত কথা তুমি বুঝতে পারছ বলেই বিশ্বাস করি। আমি চিরকাল তোমার ও তোমাদের পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী থাকব। আমি খুবই খুশী হব যদি তুমি আমাকে তোমাদের পরিবারের একজন বন্ধু বলে গণ্য কর। অবশ্য, না করলে আমি দুঃখ করব না। তোমার বাবার আচরণের ফলে ইতিপূর্বেই তার নাম নষ্ট হয়ে গেছে, আমার ভালোবাসা সেই নামকে আরও নষ্ট করবে ভেবো না। এই ভালোবাসায় যদি কিছু কলঙ্কিত হয়, তবে তা আমারই নাম। আমিও তাই চাই। আমাদের দুজনের ভালো সম্পর্ক তাতে খারাপ হয়ে যাবে না। এই সব কথা বলবার জন্যই তোমায় ডেকেছিলাম।...মঞ্জু। এক কাপ কফি হোক।" এই কথা ব'লেই আমি উঠে পড়লাম।

আমার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু সস্নেহে হাসল। তার কলকল ক'রে ইংরেজী কথা বলতে বলতে আমার পিছনে পিছনে রান্না ঘরে এল : "সেই রবিবার দিনের ভোজটা আমি না এসে নষ্ট করে দিয়েছি। খুবই ডিস্অ্যাপয়েন্টেড্ হয়েছেন আপনি। ও বিষয়ে আমি পরে আপনাকে বলব অনেক কথা। আমি কথা দিয়েছিলাম যে সেদিন আপনার রান্নার ব্যাপারে আমি অনেকটা হেল্প্ করব। তা করতে পারিনি। এখন কফি তৈরি করতে একটু হেল্প্ করি।"

মঞ্জু ও আমি— আমাদের এই দুজনের মধ্যে নতুন করে একটা পারস্পরিক স্নেহসম্পর্ক গড়ে উঠল। আমি ওর পরনের শাড়ীটাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ওকে আমি এই প্রথম শাড়ী পরা অবস্থায় দেখলাম। এ নিয়েও আমি কমেন্ট করলাম। মঞ্জু বলল এই শাড়ী পরার পিছনেও নাকি একটা গল্প আছে।

25

মঞ্জুকে আজ এই বেশে দেখার পরে ওর এই পোশাক-বদল নিয়ে কিছু কথা বার্তা হবে বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু মঞ্জু একটু 'সীরিয়াস মুড'এ কথা বলার জন্য বসলে পরে আমি আর শাড়ী বা গয়না সম্পর্কে কোনো কথাই বললাম না কারণ ঐ বিষয়ে কথা বললে গোটা অ্যাটমস্‌ফিয়ারটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

সাধারণত মঞ্জু সবসময়ে সালোয়ার-কামিজই পরে থাকে। তাও কি এক-দু রকম, পঞ্চাশ রকম। কত তার রঙ, কত ডিজাইন, কত রকমের ফিটিং। বস্তুত সালোয়ার কামিজ পরলে মঞ্জুকে বেশ দেখায়। কখনো কখনো বুকের ওপর দিয়ে একটা ওড়না থাকে। মঞ্জুকে কিন্তু সেই ওড়না ছাড়াই খুব ডিসেন্ট লাগে। কোনো কোনো দিন খালি ফ্রক পরে থাকে। তখন দেখলে মনে হয় নিতান্তই কিশোরী।

আজ কী কারণে জানি না হঠাৎ শাড়ী পরে এসে দাঁড়াল! ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে কেবল এই কথাই ভাবছিলাম! যেন বলতে চাইছে—'আমি এখন একজন রমণী, আমার সঙ্গে আপনারা সমীহ করে কথা বলবেন। এখন বুঝতে পারছি। মঞ্জু আমার কাছে কোনো কিছু সীরিয়াস্ কথা বলার জন্যই আজ এই বেশে এসেছে। সত্যই সীরিয়াস। আমার কাছে সব কিছু বলল। কিছুই না লুকিয়ে বলল। কত বুদ্ধি ও সামর্থ্য নিয়ে সীরিয়াস একটা জটিল সমস্যার কথা হাসতে হাসতে বলল। মঞ্জুর কথা শুনতে শুনতে কফি তৈরি করছিলাম।

মঞ্জুর মা নাকি কড়া নির্দেশ জারী করে দিয়েছে—'খবরদার, এর পরে যেন আর সালোয়ার-কামিজ-ফ্রকস এইসব পরতে দেখি না। রোজ শাড়ী পরে গাড়ীতে ক'রে কলেজে যাবে আবার গাড়ীতে ক'রে চলে আসবে। যদি তা না পারো তোমার লেখাপড়ার দরকার নেই।' প্রথমে তো এইসব না বলে একেবারে ফতোয়া দিয়েছিল— 'মঞ্জু কাল থেকে তোর কলেজে যেতে হবে না।' তারপরে এই বন্দোবস্ত।··· মঞ্জু খুব আকস্মিকভাবে বলতে আরম্ভ করল। আমি বুঝতে পারলাম। ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে ওর কথাগুলিই মাত্র শুনতে লাগলাম। মনে মনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কত চতুর ও বুদ্ধিমতী এই মেয়ে!

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল— 'মিস্ গঙ্গা! আপনিই বলুন তো, আমার তো কত মেয়ে বন্ধু আছে। সেই রকম যদি একটি ছেলে বন্ধু একটি বয়ফ্রেণ্ড থাকে, তাতে অন্যায়টা কিসের? হি ওয়াজ জাস্ট এ ফ্রেণ্ড্, ব্যাস আর কিছু নয়। মা বলছিল 'লাভ করছ? পা একেবারে কেটে দেব।' একেবারে ব্রুট্-এর মতো চেঁচাচ্ছিল। কী যে অপমানটা হল আমার। সেই ছেলেটার সামনেই মা আমায় মারতে আসে। প্রথমে আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল। দ্বিতীয় দিন না খেয়ে কেঁদে কাটিয়েছি।

তারপরে নিজেই আমি সব বুঝে-সুঝে নিজেকেই সামলালাম।... আজকাল আর সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করি না। তার কাছেও সব কথা বলে দিয়েছি।'

আচ্ছা. মঞ্জু কারকম মেয়ে? তার প্রেমিককে ও 'সে' 'তার' ইত্যাদি ক'রে বলছে. একবারও 'তিনি' 'তাঁর' বলছে না। এ তো বড় অদ্ভুত। "আচ্ছা মঞ্জু. হাউ ডিড ইউ মীট্ হিম্?' তুমি প্রথমে কীভাবে 'তাকে' মানে 'তাঁকে দেখলে? ইংরেজীতে বললেও মঞ্জু যাতে 'হিম্' কে 'তাকে' না ভেবে 'তাঁকে' মনে ক'রে সেইভাবে প্রশ্নটা করলাম।

মঞ্জু খানিকটা সংকুচিত হল, লজ্জা পেল।

মঞ্জু যখন গাড়ীতে আসতো, সেই ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গেই আসত স্কুটারে। গাড়ীর পাশাপাশি।

আমি কোনো কমেন্ট না করে শুনছিলাম।

তারপরে একদিন মঞ্জুর গাড়ী কলেজে আসেনি। আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না— গাড়ী কেন আসে নি। মঞ্জুই বলে দিয়েছিল ড্রাইভারকে— আসতে হবে না। অথবা ড্রাইভারের গাড়ী নিয়ে আসার আগেই মঞ্জু কলেজ থেকে চলে গেছে। এই সব কথা কি আর জিজ্ঞেস করে জানতে হয়?

হয়তো বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাস্ এলো না দেখে তার পরে দু-তিন জন ক'রে দলে দলে 'ড্রাইভ-ইন' হোটেল পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছে হয়তো কফি অথবা আইসক্রীম খাওয়ার জন্য। গিয়ে দেখে, সেখানে একটা গাছের ছায়ায় সেই ছেলেটি দু-তিনটি বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসে আইসক্রীম খাচ্ছে। সেই ছেলেদের মধ্যে একটি আবার মঞ্জুর সঙ্গে আসা একটি মেয়ের বয়্-ফ্রেণ্ড। সেই ছেলেটি সেই মেয়েটিকে দেখে 'হায়্' বলে অভিনন্দন জানাল। মেয়েটিও প্রত্যুত্তরে বলল— 'হায়'। তখন এই স্কুটার-আরোহী ছেলেটা মঞ্জুকে দেখে সেই মেয়েটার বয়ফ্রেণ্ডের কানে কানে কী একটা বলতেই সে হো হো ক'রে হেসে উঠল। মঞ্জু বুঝতে পারল যে তার নিজের সম্পর্কেই সে কিছু বলেছে। মঞ্জু তখন মেয়েটির বয়ফ্রেণ্ডকে বলেছে যে সে স্কুটার-ওলাকে চেনে। অতঃপর সকলের মধ্যে পরিচয়দানের পালা। হাউ ডু ইউ ডু, আইস্ক্রীম্, নানারকম জোক্স্ ম্যাটিনী শো. স্কুটার ড্রাইভিং, মীট্ ইউ টুমরো, নাথিং হ্যাপেণ্ড, হোয়াট ইজ রং ইত্যাদি ইত্যাদি।

কী সাধারণ ভাবেই কথাগুলি বলে গেল মঞ্জু। এর মধ্যে আমার কাছে তো কিছু অন্যায় বোধ হল না। এ-সমস্ত মেয়েরা তো আর আমার মতো বোকা-সোকা নয়। এই মেয়েরা যেমন পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে জানে, তেমনি আত্মরক্ষা করতেও জানে। এদের ভয় নেই। তাই ওরা সব সময়েই দল বেঁধে চলে। এটা ওরা বেশ এন্জয়্ করে। আমি তো এদের আচার-আচরণে কোনো দোষ খুঁজে পাচ্ছি না।

তখনকার দিনে কোনো পুরুষ মানুষকে দেখলেই আমার লজ্জা হত। আচ্ছা এরকম হয় কেন? পুরুষ মানুষ দেখলেই মেয়েদের লজ্জা হবে কেন? আমি যাকে লজ্জা বলে মনে করি, তাকে সে 'ভালোবাসা' বলে ভাবে। লজ্জাই ভালোবাসার চিহ্ন বলে কথিত। পুরুষের সামনে মাথা তুলে দেখতে নেই. কথা বলতে নেই, মেলামেশা করতে নেই—এই সমস্ত নিষেধবাক্য অল্প বয়স থেকে শুনতে শুনতে বড় হয়েও মেয়েরা 'পুরুষ' কথাটা ভাবলেই একটা থ্রিল. একটা মানস রোমাঞ্চ অনুভব করে। এই মানস রোমাঞ্চ মেয়েদের যার প্রতিই হোক-না-কেন. আমার মনে হয় ওটা ইম্‌মর‍্যাল—নীতিভ্রংশ। আমার সম্পর্কে আমার মামার নোংরা দৃষ্টি জন্মেছিল বলেই যে পুরুষ সম্পর্কে আমার লজ্জা ও রোমাঞ্চ জন্মেছে. সেই সময়েই তার বোধগম্য হয়েছে।

এখন আমি সে অবস্থা পার হয়ে এসেছি। সেই রকম লজ্জাও আজ আর কারও প্রতি জন্মাবে না। কোনো পুরুষকে দেখেই আজ আর আমার ভয় নেই। এইমাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমার এই ভয় ছিল যে যে কেউ আমাকে রেপ্ করতে পারে. সেই ভয় এখন আর আমার নেই। সেদিন তো মামার হাত থেকে বেল্‌ট্ ছিনিয়ে নিয়ে আমি রুখে দাঁড়ালাম। সেই মুহূর্তে সেই ভয় আমার মধ্য থেকে পালিয়ে গেছে। অতঃপর আর আমার ভয় নেই। পুরুষের উপস্থিতিতে নারীর মধ্যে যে রোমাঞ্চের সৃষ্টি হয় তাও নেই। নাউ আই অ্যাম্ রিয়েলি মেচ্যুর্‌ড্. আমি এখন সত্যি সত্যি পরিপক্বতা অর্জন করেছি।

আচ্ছা এ ব্যাপারটা কীরকম? মঞ্জু যখন তার নিজের কাহিনী বলে যাচ্ছে. তখন তারই সমান্তরাল ভাবে আমার কাহিনীর কথা আমি চিন্তা করছি? মঞ্জুর কথায় আমি যে কান দিই নি, মনোযোগ দিই নি, তা নয়। মঞ্জুর কথা শুনতে শুনতে আমার কথা ভেসে আসছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম— "মঞ্জু. কতদিন ধরে তোমাদের এই বন্ধুত্ব চলছে? তারপরে কী হল?" এখনও এই বিষয়ে আমার মনোভাব আমার অভিপ্রায় আমি ওকে জানাই নি। আমি চুপ ক'রেই আছি।

আমরা দুজনেই এসে আবার সোফার উপর বসলাম।

মঞ্জুকে তার বন্ধু বোধ হয় বার পাঁচ-ছয় দেখা-সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিবারই ওরা ম্যাটিনী শো-তে গিয়েছে। একদিন সেই ছেলেটার সঙ্গে বাড়ীতে এসে স্কুটার থেকে নামবার সময়ে মঞ্জুর মা দেখে ফেলল। মঞ্জুও ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এসে পদ্মার কাছে বয়্‌ফ্রেণ্ড্ বলে পরিচয় করিয়ে দিল। পদ্মার তখন রাগ দেখে কে? ছেলেটার সামনেই সে বকাবকি শুরু ক'রে দেয়। "তোমাকে লেখাপড়া শেখার জন্যই বাইরে পাঠাই. বয়্-ফ্রেণ্ড্ ধরবার জন্য নয়!" মঞ্জুকে এইটুকু বলে ছেলেটাকে 'বেরিয়ে যাও' বলে বার ক'রে দিল। আহা বাছা, সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে মঞ্জু এখনও কেঁদে ফেলল। মঞ্জুর মন যে তখন অপমানে কতদূর

ক্ষত-বিক্ষত তা সহজেই বোঝা যায়।

পদ্মা সেদিন মঞ্জুর সমস্ত সালোয়ার কামিজ পোঁটলা বেঁধে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হুকুম দিয়েছে সেদিন থেকে তাকে শাড়ী পরতে হবে। আর বাইরে যেতে পারবে না মঞ্জু। তখন পদ্মা নাকি মঞ্জুকে এমন কথাও বলেছে "তোমার বাবাকে তার ইচ্ছামতো ঘুরতে দিয়েছি বলে তোমাকে, সুভাস ও বাবুকেও সেই রকম ঘুরতে দেব বলে ভেবেছ নাকি? ফ্রেণ্ড, ফ্রেণ্ড বলে তোর বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সেই যে গঙ্গা, তার মতো হবি নাকি ভেবেছিস? গঙ্গার এ বাড়ীতে পা দেওয়ার পর থেকেই তুই খুব খারাপ হতে আরম্ভ করেছিস। গঙ্গা যেন আর এখানে না আসে; তুইও আর ওদের বাড়ীতে যাবিনে। আমার হুকুম ছাড়া ওয়াকিং-কুকিং বলে কোথাও নড়তে পারবিনে।"

অতঃপর মঞ্জু দু-তিন দিন কান্নাকাটি ক'রে, গোঁ ধরে বসে থেকে তার পরে পদ্মার সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে অবশেষে কেবল কলেজ যাওয়ার অনুমতিটুকু পেয়েছে। মঞ্জুর মা আমার সম্পর্কে যে বলেছেন "ফ্রেণ্ড ফ্রেণ্ড বলে ওঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াই" সে পর্যন্ত মঞ্জু আমার সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা করতে পারে নি। প্রথম প্রথম মঞ্জুর মনে হত— "মা কি আর মিথ্যা বলেছে?" অতঃপর মঞ্জু যখন দেখল যে তার মা পদ্মা মঞ্জুর নিজের সম্পর্কেই নানা ভুল ধারণা ক'রে এতটা সোরগোল তুলেছে, তখন যে আমার ব্যাপারে তার মায়ের কথায় কতটা সত্য থাকতে পারে তা মঞ্জু হয়তো বুঝেছিল। তবু মায়ের কথার ভয়ে আমার সঙ্গে দেখা না করবার এবং না বেড়াবার সিদ্ধান্তই নিয়েছে মঞ্জু। তবে তার বাবার কাছে কখনো আমার বিষয়ে অন্যায় কথা বলেনি মঞ্জু। মঞ্জু কেবল এইটুকুই বলেছে: 'আর আমি আসব না, দেখা-সাক্ষাৎও করব না। তোমার বন্ধু, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক, আমার কী দরকার?' অবশ্য এই কথা বলার জন্য মঞ্জু খুবই দুঃখিত। আরও দুঃখিত এই কারণে যে মাকে কিছুই বোঝানো যাবে না।

আমি মঞ্জুকে একটা বুদ্ধি দিলাম— "দেখো মঞ্জু তোমার জীবনের আসল কথা হচ্ছে মায়ের চোখে তোমার সুনামটা বজায় রেখে তার স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়া।"

আমি কী ভাবে জানি না পদ্মার এই মনোভাব বুঝতে পেরেই হয়তো মঞ্জুদের বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ করেছি— এই কথা ভেবে আমিই আমার বুদ্ধি-কৌশলের খুব প্রশংসা করলাম। মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলাম— 'তুমি কি তাকে ভালোবাসো? নাম কী তার?' মঞ্জু হেসে বললো— 'আপনি সামজীর কথা বলছেন? তার আসল নাম জি. স্বামীনাথন্। সকলেই তাকে 'সামজী' 'সামজী' বলে ডাকে। হাউ নাইস্! প্রত্যেকেরই একটা মজার মজার নাম আছে। আমার নাম কী জানেন? মন্চ্! মি. কৃষ্ণবেণী বলে একটি মেয়ে আছে, তার নাম— চিক্কি...'

মঞ্জু কত কী কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। আর-একবার সেই কথাটার ওপর জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করা আমার কাছে ঠিক বলে মনে হল না। একবার জিজ্ঞেস করেছি যথেষ্ট। মঞ্জুরই বা বয়স কী, আমার বা বয়স কী! তাহলেও জিজ্ঞেস করেছি, করেছি। মঞ্জু যদি এড়িয়ে যেতে চায়, আমারও উচিত প্রশ্নটা ভদ্রভাবে সেইখানেই ছেড়ে দেওয়া। ইট ইজ হার প্রাইভেসি।

মঞ্জু তার বন্ধুদের সম্পর্কে, তাদের নানা হাসি-ঠাট্টা সম্পর্কে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে তাকাল, একটু গম্ভীর হয়েই তাকাল। তারপরে একটু হেসে বলতে আরম্ভ করল। সেই হাসিটা যেন পুরো হাসি নয় : অর্ধ হাসি, বাকী অর্ধ একরকমের দুঃখ। আমি যেমন পরিষ্কার ও নির্ভুলরূপে মঞ্জুকে কয়েকদিন লেখাপড়া শিখিয়েছি, ঠিক সেইভাবে একজন অধ্যাপকের আসনে বসে যেন মঞ্জু বলছে, ইংরেজীতেই বলছে :

"মিস গঙ্গা, আপনি আমায় ভালোবাসা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন—ভালোবাসার কথা তো কতই শুনেছি আমরা, তাই না? আমার মা রাগ করে জিগ্যেস করে ভাসিলে, আপনি সস্নেহে জিগ্যেস করলেন ইংরেজীতে। আমি মায়ের কাছে বলতে পারি নি, আপনার কাছে বলছি। পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার এই ভালোবাসার আপনারা যা অর্থ করেন তাছাড়া অন্য কোনো বন্ধুত্বের সম্পর্কে থাকতে পারে না বলে কি মনে করেন? দুজন লোক দুজন বন্ধু হিসেবে থাকতে পারে না বলে মনে করেন। আমি সামজী-কে পছন্দ করি, তাকে আমার ভালো লাগে। জানি না একে ভালোবাসা বলে কি না। আমরা দু'জন বন্ধু। বাস, আর কিছু নয়। পুরুষ বন্ধুও বন্ধু, মেয়ে বন্ধুও বন্ধু, উভয়েই বন্ধু, আর কিছু নয়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অর্থ নেই। আপনি যে বলেছেন সেভাবে কোনো পুরুষকে বেছে নেওয়ার মতো বয়স বা পক্কতা বা আবশ্যকতা আমার এখনো হয় নি। আমি এখনও নাবালিকা কিশোরী। সেই কিশোরীর মতোই খেলাধুলা করি। আমাদের এই বয়সে যদি বড়দের স্বাধীনতা, শিশুদের আন্দীর, মাতা-পিতার জ্ঞানবুদ্ধি পৃথক পৃথক পথ ও পদ্ধতিতে সম পরিমাণে লাভ করতে পারি, তবেই আমাদের জীবন সুস্থ সবল হবে..."

ওঃ! অদ্ভুত কথা বলছে মঞ্জু। আমার তো ভীষণ ইচ্ছে করছে মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরতে। চোখ দুটো আমার কেন এভাবে ছলছল করছে। না, আমি কাঁদি নি। আমার মনের মধ্যে এক অপূর্ব শীলতা।

মঞ্জু বলে চলল—"সামজী বড় ভালো ছেলে। কথাবার্তায় কী চালাক। খুব উইটি ছেলে। তার কথা শুনে আমরা না হেসে পারি না। আমাদের বন্ধুরা সকলেই একে অন্যকে ভালোবাসে। একজনের সম্পর্কে অপর কেউ কোনোরকম ভুল বা কদর্যভাবে ভাবতে পারি না। আমাদের সকলের মনেই এই বিশ্বাস ও

তার যে ওরকম ভাবা উচিত নয়। সৌজন্য, ভদ্রতা, ম্যানার্স সম্পর্কে আমরা সচেতন। আমরা সকলেই ফ্র্যাঙ্ক, আবার সকলেরই কিছু রিজার্ভেশান আছে। আমরা একজন মানুষকে মানুষ রূপেই দেখি। আমি একটি মেয়ে এরকম কোনো কম্‌প্লেক্‌স্ নেই আমার। সামন্তীর গুণ, সামর্থ্য ইত্যাদি দেখে আমি তার বন্ধু হয়েছি। সে যে আমার সঙ্গে কোনো মিস্‌বিহেভ্‌ করতে পারে না এটা ভালো ক'রে জেনেশুনেই তার সঙ্গে মেলামেশা করি। যদি কখনো ভুল ক'রে খারাপ ব্যবহ'র করে আমরা শুধরে দেব। এই রকম অবাধ মেলামেশার সুযোগ নিয়ে খারাপ ব্যবহার করার মতো ছেলেমেয়েও আছে। তারা এরকম মেলামেশার সুযোগ না পেলেও খারাপ হত। উদাহরণ? আপনি। কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন আপনার সতেরো বছর বয়সের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। তার কারণ কি আপনার বয়-ফ্রেণ্ড? আমার বাবা যদি আপনার বয়ফ্রেণ্ড হত, ত'হলে এরকম একটা ঘটনা ঘটতেই পারত না। অ্যাম আই রাইট? বাবা এখন আপনার বয়-ফ্রেণ্ড। এখন তো তফাতটা দেখতে পাচ্ছেন? আমি কিন্তু বাবার ও আপনার মধ্যে যে বন্ধুত্ব সে সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা পোষণ করি না। কিন্তু এ সমস্ত কথা অনেকেই বুঝতে পারে না। আমার কাছে তো এখন বন্ধুত্ব অপেক্ষা মায়ের হুকুমই বড়ো কথা। দেখুন, এই বন্ধুত্ব সম্পর্কে মাকে বোঝাবার জন্যই আমি এখন মায়ের আদেশ-মতো চলাফেরা করি। কিছুদিন পরে, আবার মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলব। আমার তো মনে হয় তখন মা আমার কথায় বিশ্বাস করবে···সো।"— মঞ্জু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থামল। ঠোঁট দুটো জোড়া ক'রে এক রকম শব্দ করল। চোখ দুটো ছলছল করছিল। গাল ও ঠোঁট বেয়ে জল পড়ছে। উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো মুছতে লাগল মঞ্জু। আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ঘুরপাক চলেছে। কোনোরকমে সামলে নিলাম নিজেকে।

মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু হাসতে হাসতে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলতে লাগল: "সেই 'ড্রাইভ-ইন' হোটেলে বন্ধুদের নেমন্তন্ন ক'রে একটা পার্টি দিই। অবশ্য মায়ের কাছ থেকে পারমিশন নিয়েই। আমাকে শাড়ী পরতে দেখে সকলেই খুব অবাক। সকলের সামনে সামন্তীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বললাম— আর কিছু নয়, মায়ের জন্য। সেদিন পার্টি হয়ে যাওয়ার পরে আমি আমাদের পরিবার সম্পর্কে, পরিবারে বাবার কী রোল্, মায়ের কী রোল্ এইসব নিয়ে বলেছি। একথাও বলেছি যে মায়ের কথার বাধ্য হয়েই আমাকে চলতে হবে। আমার পক্ষে এডুকেশনটাই বড় কথা। লেখাপড়ায় আমার যতটা আনন্দ ও তৃপ্তি, অন্য কিছুতে এমন নয়। ছাট ইজ ট্রু। কোনো কিছুর জন্যই আমি তা ত্যাগ করতে পারি না। আমরা বরাবরের জন্য ফ্রেণ্ডস্। কিন্তু ফ্রেণ্ড্‌শিপ মানে আইস্‌ক্রীম, ম্যাটিনী শো, এক্‌স্‌চেঞ্জ্ অব জোক্‌স নয়, ফ্রেণ্ডশিপ মানে আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং। আপনারা আমাকে বুঝতে পেরেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। সামন্তী

শুনে কাঁদল। সেদিন সকলে আইসক্রীম খেল বটে, কিন্তু কারও মুখে কোনো কথা নেই। আজকাল দেখা হলে 'উইশ' করি। ব্যস্ ওইটুকুতেই শেষ!"

মঞ্জু তার ঘড়িতে সময় দেখল। আমি মঞ্জুর মধ্যে সময় কালের পরিবর্তন দেখলাম। 'মঞ্জু! আই রিয়েলি অ্যাডমায়ার ইউ" বলে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ওকে আমি এর কলেজের পড়া শিখিয়েছিলাম, মঞ্জু আমাকে শিখিয়ে দিল জীবনের মূল্যবান পাঠ।

26

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় উনি এসে গেলেন, সমস্ত ব্যাপারই বলে দিলাম ওঁকে। মঞ্জুর ছেলে বন্ধু সামন্তাকে পদ্মা যে অপমান করেছে এই রকম অল্পস্বল্প বলে আর কিছু বাদ-সাদ দিয়ে বললাম। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এসে রাত নটা পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। আমিই সমস্ত কথা সংক্ষেপে বলতে আরম্ভ করে কথা টেনে টেনে সময় কাটিয়ে দিলাম। নটার পরে আর থাকতে পারছেন না, ভারি অস্বস্তি বোধ করছেন। কপাল ঘসছেন, হাত ঝাড়ছেন, হাম দিচ্ছেন। সিগারেট ধরিয়ে ধরিয়ে আবার নিভিয়ে ফেলছেন।

আমি বুঝতে পারলাম এখন ওঁর তৃষ্ণা নিবারণের সময় হয়েছে। উনি যে খাবেন না তা আগেই জেনেছি বলে এমনি একটু জিগ্যেস করলাম, 'আজ রাতে এখানেই খান-না। আজ খুব সিম্পল্‌ভাবে রান্না করেছি।'

'আই-আইয়ো' বলে যেন একটা শক্‌-খাওয়া লোকের মতো উঠে পড়লেন। 'নো.. আমার একদম খিদে নেই ..তাছাড়া যদি জানতাম তবে আমার মদটা সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম প্লীজ একসকিউজ মী··· কাল আসব। তোমারও সময় হল।' তিনি চলে গেলেন।

আমি হাসতে হাসতে ওঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলাম। এখন একলা আছি বলে ভেবে দেখছি। আচ্ছা, উনি আমার এক কথার মধ্যে 'হুঁ' 'হুঁ' করা ছাড়া একটি কথাও তো বলেন নি। কী ভাবছিলেন বসে বসে? তাঁর ও আমার মধ্যেকার সম্পর্কের গোড়ার কথাটা তাঁর মেয়েকে জানিয়ে দিয়েছি বলে কি উনি অপমান বোধ করেছেন? এই সমস্ত কথা মঞ্জুকে বলেছি বলে কি আমার ওপর রাগ করেছেন? নাকি, মেয়ের একটি বয়-ফ্রেণ্ড জোটার মতো বয়স হয়েছে ভেবে একটু আশ্চর্য হয়েছেন?

উনি ওঁর মনের ভাব কিছুই বাইরে প্রকাশ করলেন না। ওঁর নিজের সম্পর্কে এবং আমাদের দুজনের সম্বন্ধ নিয়ে— মঞ্জু খারাপ কিছুই মনে করে না এই

একটা বিষয়ে দৃষ্টি দেখানো ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তো তেমন আগ্রহ দেখলাম না! এইভাবে সেদিন সারা রাত ধ'রে কেবল ভেবেছি আর ভেবেছি। কিন্তু পরদিন সকালে আমি ওঁকে কিছুই জিগ্যেস করি নি। কিসের জন্য জিগ্যেস করব? যা বলার সব বলে দিয়েছি। সে সম্পর্কে উনি কী ভাবছেন তা জেনে আমার কী হবে? যদি কিছু বলার থাকে উনিই বলুন এই অপেক্ষায় আমিও কথা না বলে চুপ করে আছি। উনিও কোনো কথা বললেন না, আমিও কিছু জিগ্যেস করলাম না।

গত চার-পাঁচদিন যাবৎ আমর, বিশেষ কিছুই বলি নি। তার মানে, মনে ক'রে রাখার মতো কোনো কথা বলি নি। সকাল ছ'টা সাড়ে ছটায় উনি আসেন। মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে যাই। বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আবার অফিসে যাওয়ার সময়ে এসে আমাকে নিয়ে যান। সন্ধ্যাবেলায় দু'টো দিন ওঁকে দেখিনি। আমি নিজেই ট্যাক্সি ধ'রে এসেছি। ওঁর কি কাজকর্ম ছিল, নাকি? কিন্তু এই চারদিন ধ'রে উনি কেমন মনমরা হয়ে আছেন। মনে হয় খুব সীরিয়াস বিষয় নিয়ে 'চিন্তা ভাবনা করছেন. 'কী বিষয়ে' জিজ্ঞেস করলে বলেন—'নাথিং'। আবার সে-কে-সেই। আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল যে উনি এমনটা কেন হলেন? উনি তো সব সময়েই হালকা কথা, তামাশা এই সব নিয়েই থাকেন। তাহলে এরকম পরিবর্তন কেন? আর যাই হোক, ওঁর তো এভাবে থাকার কথা নয়।

চারদিন পরে আজই সন্ধ্যাবেলায় উনি আমাদের অফিসের সামনে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গাড়ীতে তুলে নিয়ে এলেন। যখন গাড়ী চালাচ্ছেন, তখন একটা পাশ থেকে ওঁর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ইতিমধ্যেই ওঁর অনেক বিষয়ে পরিবর্তন হয়ে গেছে। মুখখানাই কেবল আগের মতো সুস্থ ও স্বাভাবিক। কিন্তু দু'একদিন শেভিং না করাতে দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। বেড়াবার সময়ে, হাঁটতে গিয়ে ক্লান্ত বোধ করেন। পেট অনেক ভিতরে বসে গেছে...আজ কিন্তু মুখখানাও ভারি শুকনো! আচ্ছা ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া হচ্ছে না? কোনো কিছুর জন্য মনের কষ্টে উপবাস-টুপবাস করছেন নাকি? উপবাস করার মতো কী কারণ থাকতে পারে?

'দুপুরে কী খেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলাম বটে, কিন্তু কথাটা যেন তাঁর কানে পৌঁছল না। কী জিজ্ঞেস করব বুঝতে না পেরে ভাবছিলাম আর কী বলা যায়, এই সময়ে তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে সামান্য একটু মাথা নাড়লেন। আমি যেন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম উনি আমার প্রশ্ন ধরতেই পারেন নি, আন্দাজেই মাথা নেড়েছেন। কাজেই আবার সেই একই জিজ্ঞাসা: আজ দুপুরে আপনি খান নি বলে মনে হচ্ছে।

'তুমি কী ক'রে বুঝলে?'

'আপনার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।'

'তাই নাকি?...মুখ দেখেই তুমি বুঝতে পারো? আর কী বোঝা যায় বলো দেখি'— ঈষৎ হাসি হেসে কথাটা বললেন।

'আপনার মন-মেজাজ ঠিক নেই. ইউ আর নট অল রাইট। দু'তিন দিন ধরে আপনি যেন মনমরা হয়ে আছেন। এটা বেশ ভালোই বোঝা যায়। দু-দিন বিকেলে আপনি আমাদের অফিসে আসেন নি গাড়ী নিয়ে। কোথাও কাজ ছিল বুঝি? তাছাড়া সকালবেলাতেও দেখছি আপনি একেবারে চুপ ক'রেই থাকেন। আর ইউ এবিড?... সেইজন্যই কি না খেয়েদেয়ে...?'

উনি কিছু উত্তর দিলেন না. একটা সিগারেট ধরালেন। খানিক পরে বললেন— 'দেখো আমি না খেলে 'খাওয়া হয় নি?' এমন প্রশ্ন একজনই করে'ছল আমাকে. সেই যে আয়া যে আমাকে মায়ের মতো পালন করেছে। তার পরে. আর দ্বিতীয় জিজ্ঞেস করলে তুমি।' এইটুকু বলে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন মুখ থেকে। তারপরে বললেন— 'ওদেরও দোষ দিতে পারি না। কারণ ওদের ধারণা আমি বাড়ীতে খেয়ে আবার বাইরেও খেয়ে থাকি। আমি কি রেগুলারলি বাড়ীতেই খাই নাকি?' কথাগু'ল যেন মনে মনেই বলছেন।

আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। 'বলুন আপনার মনে কিসের কষ্ট? যাই হোক-না-কেন. না খেয়ে থাকবেন কেন?'

'আমি বাড়ীতে খাই না এই তো বলেছি। না খেয়ে তো থাকি না।'

'আজ তাহলে আমার ওখানে খাবেন।'

'ও ইয়েস— থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আপনার জন্য কিছু নন-ভেজিটেরিয়ান খাবার দরকার হলে বাইরে থেকেই কিনে নিয়ে যেতে পারি। আমি কিছু মনে করব না— ও জন্য আমার কোনো ভাবনা নেই।'

কথাটা শুনে উনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

'ইউ নো'... এইভাবে কিছু একটা বলতে চাইলেন. কিন্তু কথা বেরোল না। কিছু দ্বিধা সংকোচের পরে বললেন দ্যাখো, আমিই আজ তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতে বসে খাব এই কথাটা...সেদিন তুমি খেতে বলেছিলে, তবু না খেয়ে গিয়েছি. আজ তাই আমার 'মিনিবার্' সঙ্গে নিয়েই এসেছি। দুটো দিন আমি কী রকম ছিলাম, না? সেদিন বাড়ীতে গিয়ে পদ্মার সঙ্গে বড় ঝগড়া করেছি, বুঝলে। তাতেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল...'

'ও আই অ্যাম সরি...।' আমি যে-কোনো বিষয় নিয়ে ওঁকে বলতে গেলে একটু সাবধান হয়েই বলি। সেইজন্যই ওঁর পারিবারিক জীবনের কলহের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মনে হল আমিই বুঝি অপরাধী।

'নো নো...তোমার কী দোষ? পদ্মা মনে করে সে একজন মস্ত বড় ডিক্‌টেটর...' রাগ হয়ে গেলে উনি খুব ইংরেজী বলেন— একের পর এক অনর্গল বলে

যান— 'সকলকেই পদ্মার বাধ্য হয়ে চলতে হবে। একেবারে বুনো জানোয়ার। মঞ্জুর সমস্ত ড্রেস ফেলে দিয়েছে. এখন তাকে দিদিমাদের মতো শাড়ী পরতে হবে। আমার ভালো লাগে নি। আমি বলে দিয়েছি— 'স্টপ দিস্ ননসেন্স্। তুমি সব ব্যাপারেই মাথা গলিয়ো না— মঞ্জু ইজ মাই ডটার টু. মঞ্জু তো আমারও মেয়ে। সে তার ইচ্ছামতো থাক্। তোমার পছন্দ না হলে তুমি সরে যাও। এটা আমার বাড়ী।'... পদ্মা একেবারে পাকা ব্রুট. জানোয়ার. জানোয়ার...আমি যে এত কথা বললাম কিছুই ওর মাথায় ঢোকে নি...' উনি বলেই চললেন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম— 'মঞ্জুর যেটুকু আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আছে, আপনার তাও নেই মনে হচ্ছে। এর জন্য গিয়ে আপনি ঝগড়া করেছেন জানতে পারলে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতেই চাইতাম না। পদ্মাকে যদি আপনি একজন মা হিসেবে দেখতেন তবে এর জন্য আপনিও এত রাগ করতেন না। আজকালকার দিনে মেয়েরা যে পথে যায়, তা দেখলে যে-কোনো মায়েরই ভয় হয় বা সন্দেহ না এসে পারে না।'

'তাহলে পদ্মা যা করেছে তা খুব নেয্য কাজ— এই তো?' এই বলে উনি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি হাসলাম। উনি আমার ওপর রাগ করলে বেশ লাগে দেখতে। হেসে বললাম— 'দেখুন' দোষ ক্রটি বড় কথা নয়। যার যার মেয়েকে শাসনে রাখা কি ভালো নয়? আপনার কাছে গিয়ে মঞ্জু বলেছিল তার মা তাকে বড় জ্বালাতন করে, এই তো? আমার কাছে বলবার সময়েও কত গর্ব করে বলেছিল— মা যা ভালো মনে করে তাই হবে।'

'হ্যাঁ, গিন্নি মেয়েকে শাসন করলে সেটা নেয্য। আর স্বামী যদি স্ত্রীকে শাসন করে. সেটা অনেয্য। ঐটুকু অধিকারও স্বামীর নেই, কী বলো? আমি কেবল পুতুল মাত্র. সব-কিছুর অধিকারী পদ্মা?...আমার অদৃষ্টলিপি আর কি?'

আমি বুঝতে পারি পদ্মার কাছে গিয়ে গিয়ে উনি একটা সংঘর্ষ বাধান। কিছুই হয় না তাতে, উনিই হেরে যান। এর ওপর ওঁকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা ঠিক নয় বলে আমি চুপ করে রইলাম। উনি বললেন— 'কফি খেয়ে যাব?'

'বাড়ীতে গিয়ে খাব। ভালো কথা. বাড়ীতে গিয়ে কফি খেয়ে কাপড়-চোপড় বদলে কোথাও একটু ড্রাইভ ক'রে এলে মন্দ হয় না।' আমি এ রকম কিছু বললে উনি খুব খুশী হন।

'আচ্ছা. আমরা বাইরে কেন কফি খাব না?'

'দরকার কী? বাড়ীতে গিয়েই আমি তৈরী ক'রে দেব। ম্যাটার অব মিনিটস্! আপনার জন্য কিছু নন্ ভেজিটেরিয়ান ডিসেস্ বাইরে থেকে কেনা যাবে। ও. কে.?' আমি ইচ্ছে করেই খুব উৎসাহ দেখিয়ে বললাম। উনিও এতক্ষণ যে মুডে ছিলেন সেই মুড্ থেকে মুক্তি পেয়ে ছেলেমানুষের মতো হৃষ্টচিত্তে

বলে উঠলেন, 'ও. কে.।'

বাড়ীতে এলাম। উনি বড় ঘরে এসে বসলেন। আমি কফি তৈরীর জন্ত ভিতরে গেলাম। আমি আমার ঘরের মধ্যেও এখনও যাই নি। হ্যাণ্ডব্যাগটা বড় ঘরেই— আর-একটা সোফার ওপর রেখে তাড়াতাড়ি ক'রে ওঁর জন্ত কফি তৈরী ক'রে দিলাম। আহা। দুপুরেও কিছু খান নি।

'বিস্কিট খাবেন ?'

'নো— থ্যাঙ্কস্।'

আচ্ছা কী রকম একটা প্রশ্ন করলাম— 'খাবেন না কি ?' একটা থালায় ক'রে অনেকগুলি বিস্কুট এবং গেলাসে জল এনে টিপয়ে রেখে দিলাম। 'নিন খান। আপনাকে দেখলে মনে হয় চার দিন ধ'রে না খেয়ে আছেন। আচ্ছা, এমন করে শরীরটা খারাপ করছেন কেন ?'

উনি একটা বিস্কুট তুলে তাতে কামড় দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন : 'আমার ওপর তোমার স্নেহ দিয়ে সব-কিছুকেই তুমি অতিরঞ্জিত ক'রে দেখ। আই অ্যাম অলরাইট. বেশ আছি আমি। আমি আমার টাইম মতো খেয়ে থাকি।'

'একদম বাজে কথা' এই ব'লে রান্নাঘরে গিয়ে কফিটা তৈরী ক'রে ফেললাম। আজকাল রান্নাবান্না কত যে সহজ হয়ে গেছে ! দুধটা গরম ক'রে দুটো চামচ এতে রেখে মিশিয়ে দিলেই কফি রেডি। মা হলে কী করত ? প্রথমে কফির বীজ ভাজত. ভাজত. ভাজতেই থাকত। তারপরে রনরন শব্দ ক'রে বীজগুলো গুঁড়ো করত। তারপরে ফিল্টারে ফেলে... ওরেব্ বাবা। এক কফি খেতেই কত সময় ! সেই কফির তুলনায় এটা তেমন মিষ্টি নয় ঠিকই. কিন্তু আমাদের ব্যস্ত জীবনে এই-ই যথেষ্ট।

ওঁকে কফি দিয়ে আমি কাপড়চোপড় বদলাবার জন্ত মুখ ধুতে গেলাম। বাড়ীতে একজন পুরুষ সঙ্গী থাকলে মনের পক্ষে সেটা কতখানি সহায়ক।

উনি আজ এখানে বসেই পান করবেন. খাবেনও এখানে, থাকবেনও কি ? থাকলে ক্ষতি কী ? ওঁর কাছে আমার কোনো ভয় নেই। ওঁকে আজ এখানেই শুতে বললে কী হবে ? যে মেয়ের কাপড়চোপড় একদম ভিজে গেছে. তার আবার ঘোমটা কিসের ? রাতে এখানে থাকলে উনি শোবেন কোথায় ? মামার বিছানার কথা মনে পড়লো। এখানে !... ছি। ওকথা ভাবতে গেলে গা ঘিনঘিন করে। ওঁর ওই বিছানায় শুয়ে কাজ নেই। আমার যে বেড্ আছে তাতেই ওঁকে শুতে বলা হবে। আমি একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেই হল।

দেখা যাক... খাওয়াদাওয়ার পরে উনি নিজেই কী বলেন দেখি। যদি চলে যেতে চান. আমি বাধা দেব না। ওঁর নৈশ প্রোগ্রাম নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। চলে যান তো যান।

জামাকাপড় বদলিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

'ইউ লুক ফাইন! বাঃ কী চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে!'

'থ্যাঙ্ক্ ইউ! এখন আমরা বেরোবো কি?'

দরজায় তালা লাগিয়ে দুজনেই রাস্তায় এসে গাড়ীতে উঠে বসলাম। ওখানকার অনেক লোক এসে আমাদের দেখতে লাগল…

আমি ওর কাছে মঞ্জু সম্পর্কে বললাম। পদ্মার একথা বোঝা উচিত যে মঞ্জু কত বুদ্ধিমতী ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মেয়ে। তবে পদ্মার কাছে মঞ্জুর সমর্থনে এখন কিছু বলার যে আবশ্যক তা নেই সেই ওকে বোঝাবার জন্য অনেকক্ষণ কথা বলতে হল। মাথা নেড়ে জানালেন যে আমার কথাগুলি সত্য। তবু গুম ধ'রে বসে রইলেন। আমি হাসলে উনিও হাসেন, কিন্তু হাসার কিছুক্ষণ পরেই একটা অন্ধকার ছায়া এসে মুখখানা ছেয়ে ফেলে। এই মুখ দেখলে আমার মনটা ভারি ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সমুদ্রতীরে অভ্যস্ত জায়গায় গাড়ী দাঁড় করালেন। খানিক পরে আইসক্রীম-ওয়ালার আগমন। আমি ভেবেছিলাম যে উনিই বাচ্চাদের মতো লোকটাকে ডেকে আইসক্রীম কিনবেন। কিন্তু কোথায় কোন দূরের দিকে দৃষ্টি রেখে সিগারেটে টান দিতে দিতে এমন চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে রইলেন যে ফেরিওয়ালার ডাক বুঝি তাঁর কানে পৌঁছল না। আমি ওকে জিগ্যেস করলাম— 'আইসক্রীম কিনবেন?'

'ও ইয়েস্.. এই যে ফেরিওয়ালা... দু'কাপ পেস্তা... দু'কাপ ভেনিলা...' খুব উৎসাহিত হয়ে কিনলেন। কিন্তু আমি জানি এই উৎসাহ খাঁটি নয়, মিছে। এটা অভিনয় মাত্র।

আমিও আজ ওঁর সঙ্গে মিশে খুব খুশী মনে আইসক্রীম খাচ্ছি। আমার খুশীটাও খাঁটি নয়, মেকী, অভিনয় মাত্র। উনি আমার জন্য অভিনয় করেছেন, আমিও ওঁর জন্য অভিনয় করলাম। একথা স্পষ্টই বোঝা গেল যে ওঁর মনের মধ্যে গভীর একটা আঘাত একটা দুরারোগ্য ক্ষতের মতো যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে। কী ক'রে কথাটা পাড়ি? পাড়লেও উনি কেন আমার কাছে বলবেন? যদি বলার মতো কথা হত তবে তো আমি জিজ্ঞেস না করলেও উনি বলতে পারতেন। সেই কথাটা ভোলার জন্য উনি হয়তো আমার সঙ্গে কিছু অন্য কথা বলবেন বলেই এসেছেন, তাই যদি হয় তবে আমি কেন সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এঁকে কষ্ট দিই? কিন্তু ওঁর অবস্থা দেখে আমি সইতেও পারছি না। ওঁকে আমি এ অবস্থায় কোনো দিন দেখি নি। বোধ করি ওঁর শরীরটা ভালো নেই।… এই সব চিন্তা করছি, কিন্তু মুখ খুলে কিছু জিগ্যেস করছি না।

আইসক্রীম খাওয়া হল। খালি কাপটা উনি কী ভাবে ফেলে দেন দেখবার জন্য আমি অপেক্ষা ক'রে আছি। ওঁর অভ্যাস হল কাপটাকে বলের মতো এক হাত তুলে ধ'রে আর এক হাতকে ব্যাটের মতো করে মেরে দেওয়া।

কিন্তু আজ আর উনি সে-সব কিছুই করলেন না। সকলেই যেমন করে, তেমনি আইসক্রীমটা খাওয়ার পরে সেই কাপটাকে উনি অত্যন্ত সাধারণ ভাবে নীচে ফে:ল দিলেন, দেখে মনে হল উনি যেন ক্যারেকটার-ই হারিয়ে ফেলেছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার শরীরটা কি সুস্থ নেই?'

উনি কিছুই না বলে আমার দিকে তাকালেন, হাসলেন। বড় মর্মান্তিক হাসি। এই হাসি দেখলে আমার মনটা বিকল হয়ে যায়।

হঠাৎ উনি বলে উঠলেন, 'লাইফ ইজ নট ওয়ার্থ লিভিং, জীবনটা বেঁচে থাকার উপযুক্ত নয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হোয়াট ডু ইউ মীন, কী বলতে চান আপনি?'

'আই ওয়ান্ট টু ডাই, আমি মরতে চাই'— এই কথা কয়টি বলার সময়ে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল।

'প্লীজ... কী হয়েছে আপনার আমাকে বলুন।'

'আই অ্যাম সরি' বলে আমার হাত সরিয়ে দিয়ে বললেন 'লীভ মী এলোন্, আমায় একটু একা থাকতে দাও।' খুবই করুণ ভাবে কথাটা বলে গাড়ী থেকে নেমে খানিকটা দূর হেঁটে গিয়ে বালির মধ্যে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁর এই সমস্ত ব্যাপার খুব নতুন বোধ হল আমার কাছে। ওঁর তো এরকম পরিবর্তন মোটেই স্বাভাবিক নয়। আমার মনে কেবল একটিই আকাঙ্ক্ষা— উনি কি আর বরাবরের মতো শিশুজনোচিত হাসি হেসে, খেলা করতে করতে, মজা ফুর্তিতে বেঁচে থাকতে পারবেন না? তার জন্য আমি যে কী করতে পারি কিছুই মাথায় এলো না··· বসে পড়লাম।

হাওয়ায় হাওয়ায় ওঁর মাথার চুলগুলি উড়ছে আর উড়ছে— ওঁর হাতে ধরা সিগারেটের ফুলকিগুলি। আমি গাড়ী থেকে না নেমে অনেকক্ষণ ওঁর পিছন দিকটাই দেখছি··· কত সময় এইভাবে থাকা যায়? গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে আমিও ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

উনি টের পেলেন যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি। আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন: 'বাড়ী চলো। আই ওয়ান্ট টু ড্রিঙ্ক।'

27

আমার মনের মধ্যে ভারি একটা সাংঘাতিক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। উনি রাগ করুন, দুঃখ পান— এ সমস্ত আমি দেখেছি। কিন্তু এ যে দেখছি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এর আগে আমি কখনও এরকম দেখিনি। এর আগে কখনও যে শোকের অভিজ্ঞতা হয় নি তেমনি কোনো শোক হতে পারে। আমার কাছে

মুখ খুলে না বলে এইভাবে মনের মধ্যে কত কী না জানি জমিয়ে জমিয়ে রেখেছেন। এই অবস্থায় আমি ওঁর কী সাহায্য করতে পারি? হাউ ক্যান্ আই হেল্প হীম?...

গাড়ীতে এসে আর একটা সিগারেট ধরালেন। আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে ইংরেজীতে বললেন, 'তোমার আজকের সন্ধ্যাটা এইভাবে নষ্ট করে দিয়েছি বলে আমি খুব দুঃখিত।'

'আচ্ছা. কী এসব ফরমালিটিস্? আপনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন. এই সময়ে আপনার কাছে রয়েছি এইটুকুই আমার তৃপ্তি... কিন্তু কী করলে যে আপনার এই কষ্ট দূর হবে তা তো জানি না... কী করে আপনার দুঃখ ঘোচানো যায় তাও জানা নেই। ও সমস্ত আমি শিখি নি। পুরুষের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ আমার কখনও হয় নি'—এলোমেলো ভাবে নানা কথা বললাম।

আমাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য বললেন—'ডোন্ট্ বদার.. আই উইল বি অলরাইট...দুঃখ কোরো না।' এই বলে শিস দিলেন। মোট কথা, স্বাভাবিক হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—'কোনো সিনেমায় যাবেন?'

'কী সিনেমা?'

'যা আপনার ভালো লাগে এই রকম কোনো ছবি— কোনো ইংলিস্ ফিল্ম ..যাবেন কি? আপনার মনের পক্ষে একটু ডাইভারশন দরকার.. কী বলেন?'

'দরকার নেই। থিয়েটারে গিয়ে বসে থাকা আমার পক্ষে খুবই বিরক্তিকর। তুমি যেতে চাও. চলো, যাওয়া যাক। তার জন্য আর ভাবনা কী? আমায় যদি জিজ্ঞেস করো, আই অ্যাম্ ভেরি মাচ্ ইন নিড অব্ এ 'ড্রিঙ্ক।'

হ্যাঁ হ্যাঁ...উনি পান করতে চান বলেই তো এসেছেন। দেখো দিকি সেই সব ভুলে গিয়ে সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি কত কী বাজে বাজে কথা বলেছি। ওঁকে একটু শান্তি ও স্বস্তি দেবার জন্য যেমন করে হোক ওর বর্তমান মুড্‌টা বদলাতে হবে ভেবে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি।

বাড়ার দিকে রওনা হবার জন্য গাড়ী ঘোরালেন। আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম— 'একটু দাঁড়াবেন, মাউন্ট রোডেই দিকে ওখানকার দোকান থেকে আপনার জন্য কিছু নন ভেজিটেরিয়ান কিনতে হবে।'

'ইট ইজ অলরাইট। আমার কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই।'

'না না, আপনার এখন ভালো করে খেতে হবে... খালি পেটে মদ খেয়ে না খেয়ে থাকা ঠিক হবে না. প্লীজ। অনেক দেরী হয়ে গেছে। গাড়ীটা ঘোরান তো।' আমি খুব জবরদস্তির সঙ্গে বলাতে আমার কথা মেনে নিয়ে গাড়ীটা ঘোরালেন উনি।

সারি সারি গাড়ী দাঁড় করানো হয়েছে ঐ মুসলিম হোটেলের সামনে। সেখানকার ছুটো গাড়ীর মাঝখানে নিয়ে গাড়ীটা দাঁড় করানো পর্যন্ত আমি ওঁর

মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। ওর দৃষ্টি ছিল রাস্তার ওপর। এদিক-ওদিক তাকালেন না। মুখেও সেই অন্ধকার ছায়া।

পরিচারক এসে সেলাম জানাল। তার কাছে কী একটা নাম বলে এক প্লেট দিতে বললেন। তারপরে ইডিয়াপ্লম্-এর কথা বলে আমার দিকে ফিরে বললেন— 'এর পরে গিয়ে কেবল তোমার জন্য আর কী রান্না করবে? তুমিও ইডিয়াপ্লম্ নাও। ওটা ভেজিটেরিয়ান খাদ্য. তুমি সেমিয়া কাকে বলে জানো তো? এও ভাই... এক ডজন নিয়ে এসো...কুইক...কুইক...' এই বলে ওকে বিদায় দিলেন।

'বাড়ীতে দুধ আছে, তাই না?'

'ইয়েস।'

'ইডিয়াপ্লম্-এর ওপর দুধ ঢেলে চিনি মিশিয়ে খেলে বেশ হবে। আমাদের মঞ্জু না দেড় ডজন খেয়ে ফেলে' এই কথা বলার সঙ্গেই উনি বোধ হয় মঞ্জু সম্পর্কে কিছু ভাবতে শুরু করেন। মুখের ওপর আবার সেই কালো ছায়া. চোখ দুটি কেমন ছলোছলো।

আমি মনে মনে স্থির করলাম, এর পরে আর ওঁর কাছে কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করব না। আমার মনে হল, উনি নিশ্চয়ই ওঁর মানসিক অস্বস্তি ও অশান্তির কথা আমাকে বলবেন। তা না হলে উনি কেন এত মনের কষ্ট নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন? তাও আজ আমার এখানে ডিনার খাবেন বলেই সমস্ত 'দ্রব্য সামগ্রী' নিয়ে এসেছেন। মনে হয় নিজের কষ্টের কথা আমার কাছে বলে মনটাকে একটু হাল্কা করতে চান বলেই এসেছেন। চুপ ক'রে থেকে যদি ওঁকে ওর নিজের মনেই থাকতে দিই. তবেই উনি নিজে থেকে সব-কিছু বলবেন— এই ভেবে আমি চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম।

কিছু লোক গাড়ীতে বসেই হাতে প্লেট নিয়ে খাচ্ছিল। ঐ যে একটি মহিলা ...কী ওটা? হায়-হায় মাংসের হাড নয়? সেইটে তুলে নিয়ে চুষে চুষে খাচ্ছে। আচ্ছা ওর মধ্যে চুষে খাবার মতো কী বস্তু আছে? খানিক পরে সেটা বাইরে ফেলে দিল; আর কথা নেই, অপেক্ষারত কতগুলো কুকুর ঐ হাড়ের জন্য একটার ঘাড়ে আর একটা লাফিয়ে পড়ে কী যে চীৎকার করছে! ওদিকে ওগুলোকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে লাঠি হাতে দারোয়ান।

সাদা পোশাক পরে হাতের ট্রে-তে কাপড় অথবা কাগজ দিয়ে বন্ধ ক'রে কী কী সব জিনিস নিয়ে সাত-আটজন পরিচারক এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে। রেডিও থেকে শোনা যাচ্ছে সিনেমার গান। সামনে পানের দোকানে একটা থালায় ক'রে সুন্দর খিলি বানিয়ে রেখেছে। সকলেই খিলি খিলি পান মুখে পুরে ফেলছে। সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরছে সিগারেটের ধোঁয়া।

উনি কী করছেন দেখবার জন্য এদিকে ফিরে ভিতরে তাকালাম। দেখি, স্টিয়ারিং-এর ওপর কপালটা রেখে মুখটা নীচু ক'রে বসে আছেন। আলতো ভাবে

ওঁর কাঁধে হাত রেখে বললাম— 'ঘুম-ঘুম লাগছে ?'

মাথা তুলে বললেন— 'না।'

আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই একটা কথা ভেবে যে আজকাল ওঁকে আমি কত সহজ ভাবে স্পর্শ ক'রে কথাবার্তা বলি। কখনও ওঁকে স্পর্শ করার সময়ে একথা আমার মনে হয় না যে একজন অন্য পুরুষকে স্পর্শ করেছি। কিন্তু ভেবে দেখলাম উনি স্বেচ্ছায় আজ পর্যন্ত এভাবে আমায় স্পর্শ করেন নি। কখনও ওঁর হাত আমার গায়ে পড়ে নি। নেভ'র। এর মধ্যে ওঁর কোনো খারাপ মতলব থাকতে পারে কি ? উঁহুঁ ! তা তো মনে হয় না।

স্ত্রী স্বামীকে স্পর্শ করে, তা তো দোষ বা অশ্লীল বলে মনে হয় না। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করলেই কী যেন একটা ঘটে যায়...আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি বেশ কৌতুকপ্রদ !

ওঁকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে এতটা সহজ ভাবে স্পর্শ করে কথা বলিনি। কাজেই উনি যদি আমাকে স্পর্শ করে কথা বলেন তাতে কোনো দোষ নেই বলেই মনে হয় আমার।

ঐ যে সেই পারচারক লোকটি ওর অর্ডার দেওয়া সমস্ত জিনিস নিয়ে এসেছে। সো কুইক...

আমি একবার বিলটার দিকে তাকালাম। ন'টাকা কিছু পয়সা হয়েছে। এগারো টাকা তুলে লোকটির হাতে দিয়ে তার বয়ে-আনা জিনিসগুলি পিছনের সীটে রেখে গাড়ী ছেড়ে দিলেন। ঐ টিন-টার মধ্যে কী যেন তরল পদার্থ। আমি জিজ্ঞেস করলাম—'ওটা পড়ে যাচ্ছে, আমি ধরব ?'

'ছি ! ছি। না, না... বাইরে পড়বে না। আর যদি পড়েও কাল আমার চাকর পরিষ্কার ক'রে দেবে।'

বাড়ীতে এসে গাড়ীটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন। আমাদের কম্পাউণ্ডের মধ্যে গাড়ী ঢুকতে পারে না, কাজেই রাখারও জায়গা নেই। এই কারণেই সদর গেট ঘেঁষে গাড়ীটা দাঁড় করালেন। আমি এসে দরজা খুলে দিলাম। ইতিমধ্যেই উনি দু হাত ভরে সমস্ত জিনিস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে আমি বললাম : 'দিন, আমার হাতে দিন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' রাজী হলেন না দিতে। শুধু বললেন— 'দেখো, ওপরে যেটা রয়েছে তুলে নাও। ওটা তোমারই জন্য। অন্যগুলো তুমি ছুঁয়ো না কিন্তু।' এখন আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

আমি বললাম—'তাতে কী ? অভ্যাস নেই বলে খাই না। তা বলে ছুঁতে দোষ, দেখতে দোষ— সে রকম কিছু নয়।...তাহলে আমি শুধু এই একটা জিনিসই খাব।' এইভাবে তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করে দিলাম। আমার ভালো লাগলো দেখে যে এখন উনি একটু হাল্কা সুরে কথা বলছেন।

সব-কিছু এনে টিপয়ের ওপর রেখে দিয়ে গাড়ী থেকে ছোটো সুটকেসের

মতো একটা কালো বাকস নিয়ে এলেন। ওহো! এই বুঝি ওর 'মিনি বার'! বাক্সটাকে খুললেন। ভিতরে চকচক করছে ভেলভেট লাইনিং। সুন্দর সুন্দর দুটো মদের গেলাস। তারপরে বোতল— কোথাকার কী হুইস্কি। সবুজ বোতল.. বোতলের ওপর দুটো কুকুরের ছবি...সাদায় কালোয়, বেশ লোমওয়ালা দুটো কুকুর...ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট! সেটাকে তুলে উনি টেবিলের ওপর রাখলেন। মুখে ওর একটা অপূর্ব আনন্দের জ্যোতি এসে গেল। বললেন, 'হোয়াই ডোন্‌ট ইউ জয়েন? তুমিও নাও-না এক পাত্র।'

আইয়ো! ওঁর সাহসটা একবার দেখো না! আমাকেও বলছেন যোগ দিতে! আমি বললাম—'আচ্ছা, আমাকেও কেন আপনি আপনার মতো হতে বলছেন?'

'নেভার। তুমি কখনও আমার মতো হতে পারো না, হবেও না। আমি হলাম গুড-ফর-নাথিং. কাউকে কোনো সাহায্য করতে পারি না। ও.কে.! লীভ ইট্‌...তুমি একটু সাহায্য করবে আমাকে? একটা ঘটিতে ক'রে খাওয়ার জল এনে দাও না।'

এখন আমার মনে পড়ল। ওদের বাড়ীতে ওকে পান করবার সময়ে তো দেখেছি। সোডা ঢেলে মিশিয়ে খেতেন। এরই মধ্যে ভুলে গেলাম?

'এক মিনিট দাঁড়ান। কাছেই দোকান আছে। আমি গিয়ে সোডা কিনে আনি।' এই বলে আমি উঠে পড়লাম। কিন্তু উনি উঠে এসে আমার রাস্তা আটকালেন: 'প্লীজ...গঙ্গা...নো! সোডার দরকার নেই। জল হলেই হবে। কখনও কখনও জলও মেশানো যায়। প্লীজ ডোন্‌ট বদার— এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

আমার খুব খারাপ লাগছে এই ভেবে ওঁর ভালো আদর আপ্যায়ন করা গেল না। উনি ইংরেজীতে বলতে লাগলেন— 'কী একটা মাতালের জন্য দৌড়ে গিয়ে তোমাকে সোডা কিনে আনতে হবে না। তাও আবার এই অসময়ে?'

'কী বলছেন আপনি?'

উনি মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। ঠোঁট ও চোখ লাল, কপাল কোঁচকানো। 'প্লীজ...তোমার ঐ স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে পীড়িত কোরো না। আমি তোমার স্নেহ-ভালোবাসার যোগ্য নই।'

'আচ্ছা, এই পদার্থটা খাওয়ার আগেই কেন আবোল-তাবোল বকতে থাকেন?' হাল্‌কা সুরে কথাটা বলে আমি রান্নাঘরে এসে গেলাম। জল এনে দিতে হবে।

এভার-সিলভার ঘটি এই একটি মাত্রই ঘরে। ঘটিটি বেশ বড়। একটু ছোট হলে ভালো হত। অন্য একটিতে আবার দুধ রাখা হয়েছে। আচ্ছা, আমি কী বোকা! উনি ঘটিতে চেয়েছেন বলে কি ঘটিতেই জল নিয়ে যেতে হবে? এই তো

রয়েছে একটা সুন্দর ওয়াটার্ জগ! জগের মধ্যে জল নিয়ে গিয়ে রেখে দিলাম।

'আই প্রেফার র' এই কথা বলতে বলতে সেই গ্লাসে দু আঙুল-পরিমিত অম্ল পদার্থ প্রসাদ খাওয়ার মতো এক ঢোকে গিলে ফেললেন। চারিদিকে কটু গন্ধ। আমি সেই বোতলটা একবার ওঁকে দেখলাম। অরে্ বাবা! কী কটু গন্ধ! নাক যে জ্বলে যায়! একেবারে স্পিরিট! এই সব খেলে লিভার কী ক'রে ভালো থাকবে? জিজ্ঞেস করলাম— 'কিছু খাবার এনে রাখব কি?'

"ডোন্ট্ ইমেজিন্ থিঙ্গস্! আমার কিছুই হয় নি... এমনিই কথা বলতে থাকব... সেইজন্যই জল চেয়েছিলাম। আই ওয়ান্ট্ টু গো ভেরি স্লো"— এই বলে সিগারেট ধরালেন।

আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আমায় পান করার উপদেশ দেবেন নাকি?'

একমুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে বললেন— "না, আমার মতো হয়ে কাজ নেই তোমার। কখনো কখনো এমনি একটু টেস্ট করার কোনো দোষ নেই··· নাথিং রং ইন ইট..."

'ওইভাবেই শুরু হয়, না?'

'ঠিক বলেছ তুমি। হ্যাঁ, মদ খাওয়াটা শুরু হয় ওইভাবেই, কিন্তু তুমি এসব ছুঁয়ো না।' এই বলে বোতলটাকে উনি নিজের কাছে টেনে নিলেন। আমি বললাম— 'আজ আমিও আপনার সঙ্গে একটু পান করব।' উনি বাধা দিয়ে বললেন... 'নো, প্লীজ...ডোন্ট্।' ইনি খুব ঘাবড়ে গিয়ে যেভাবে আমায় বাধা দিলেন তাতে আমি না হেসে পারলাম না। তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্য বললাম— 'এমনি একটু ঠাট্টা করে বলেছি। সত্যি সত্যি কি মদ খাব নাকি?'

কিছুক্ষণ ধ'রে আমরা দুজনেই মৌন হয়ে ছিলাম! আমি কত কী ভাবছিলাম। মনের মধ্যে কী একটা ভয়। হঠাৎ মনে হল— ওঁকে বুঝি হারাব আমি! সত্যিই যদি ওঁকে হারাই, তারপরে কী? তারপরেই কি আমি মদ খেতে শুরু করব? ওঁর কথা মনে ক'রে মদ খেতে আরম্ভ করব? এই রকম কত যে ভাবনা। মুখে বললাম— 'আমার জীবনে যেন এরকম দিন বা সুযোগ কখনও না আসে যখন মদ খাওয়াটা খুব জরুরী বলে মনে হবে।'

ইনি ইংরেজীতে বলতে আরম্ভ করলেন 'দেখো, জীবনে আমার বিতৃষ্ণা ধ'রে গেছে... একদম একঘেয়ে বিরক্তিকর। জীবনে আর কিছুই নেই, একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। আমি তো মনে করি আমার জীবন শেষ। কিছুই ভালো লাগে না আমার। কখনো সখনো যেন পাগলামিতে ধরে। এই এখনই একটু রিল্যাকস্ড্ বোধ করছি। আমি জানতে চাই, আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজনটা কী? এতদিন ধরে বেঁচে থাকলাম কী উদ্দেশ্যে? কী আনন্দে? তাও তো শেষ হয়ে গেল। এর পরে আর কোনো কিছুতেই আমার তৃপ্তি নেই। লাইফ

থ্যাঙ্ক লস্ট ইট্‌স্ চার্ম— জীবনের সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সব-কিছুই রুটিন মাফিক... বিরক্তিকর... একঘেয়ে' বলতে বলতে ওঁর সারা কপাল ঘামে ভরে গেল।

আমি ভিতর থেকে একটা তোয়ালে এনে দিলাম। উনি সেটা হাতে নিয়ে পাশে রেখে দিলেন। তারপরেই আমি তোয়ালেটা তুলে ধীরে ধীরে কপালটা মুছে দিলাম। 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে তোয়ালেটা নিয়ে নিজেও একবার মুছলেন।

'আমি যে জীবনে কী পরিমাণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি সে বিষয়ে একটা ঘটনা বলছি, শোনো।' এই বলে গেলাসে চুমুক দিলেন। পরশু দুপুরে রেডিওগ্রামে একটা রেকর্ড দিলুম, তার স্পীড ৩৩। তাকে বদল করে দিলুম ৭৮ তখনই বেশ ভালো লাগল। না হলে ডাল্ লাগছিল। নরম্যাল সুস্থ স্বাভাবিক জীবনটাও হল ডাল্ লাইফ...

'কেবল তাই নয় গঙ্গা। তোমাকে সত্য বলছি... তুমি যদি না থাকতে তবে আমি এতদিন সুইসাইড করে ফেলতাম। কিসের জন্য এই জীবন? মান-মর্যাদা গেছে। আমার কে আছে আপন জন? তুমি একটি পাগলী, আমার সঙ্গে থেকে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ। হায় গঙ্গা...গঙ্গা...'' এই বলে হেসে ফেললেন।

উনি যে কথাগুলি বলছিলেন তা যেমনই হোক-না-কেন, ওই কথাগুলির মধ্য দিয়েই ওঁর মন, মনের দুঃখ জানা যাবে বলে আমি নিঃশব্দে ওর কথা শুনছিলাম।

28

এখন উনি খুবই সীরিয়াস মুডে রয়েছেন। খুবই কষ্ট মনে মনে। মনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আজ উনি আমার সামনে ঢেলে দেবেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এই পরিবেশে ওঁকে দেখতে আমার বেশ মজা লাগছে। কিন্তু হাসতে পারছি না বলে জিভটা কেটে ধরলাম, কারণ হাসলে সেটা ওঁর প্রতি অত্যন্ত অকরুণ আচরণ করা হবে।

উনি এবং ওঁর বসবার ভঙ্গী... সোফার উপর কেন এইভাবে প্যান্ট্ পরে পদ্মাসন করে বসে আছেন... ওঁর বাড়ীতে থাকলে প্যান্টের বদলে লুঙ্গি পরে থাকতেন আর গায়ে থাকতো ঢিলেঢালা জামা, লিনেন অথবা সিল্ক। সেই বারান্দায় আছে একটা কুশন চেয়ার অথবা পিরজু চেয়ার, সেই চেয়ারে ঠিক এইভাবে পদ্মাসনে বসে পান করেন। অরেব্ বাবা! দেখলে মনে হয় যেন দরবারে বসেছেন। টিপয়টা তুলে এনে পাতার জন্য একটা লোক দরকার।

সোডা নিয়ে রাখতে হবে তারজন্য একটি লোক চাই। ডাকের মাথায় যে-কোনো সময়ে ছুটে আসার জন্য একটি বেয়ারা। ওঁর পান করবার সময়ে এমন আর একজন লোক চাই যে কাছে দাঁড়িয়ে বলবে—হুজুর, এটা গরম, হাঁ ওটা ভাজা, ইত্যাদি। বাড়ীর সেই সমস্ত সুখসুবিধা ছেড়ে এখানে, আমার বাড়ীতে, এসেছেন একটা পরিবর্তনের জন্য। পরবার ধুতি পর্যন্ত নেই, প্যাণ্ট পরে বসে আছেন, কেন এইভাবে কষ্ট করবেন? কষ্ট হয় না কি এতে? আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে... ঘটিতে জল আনা চাই ঘটিতে...ভাগ্য ভালো, এই জগটা ছিল, মাটিতে বসে পান করবার মতো এই সোফার ওপর বসে...সমস্ত জিনিস সোফার ওপর ছড়িয়ে রেখে বসে আছেন...ওঁকে এই অবস্থায় দেখলে আমার খুব মজা লাগে।

এই এখন চলছেন চতুর্থ গোলক। সিগারেট ধরাবার জন্য ঐ জলন্ত দেশালায়ের কাঠিটাকে দেখছেন তো দেখছেনই। ছোট কাঠিটা পুড়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে দেখবেন। কখন হাতে স্যাঁকা লাগে সেই আমার ভয়, মনে হয় হাতটা বুঝি পুড়ে গেল। কাঠিটা পুড়ে নিভে গেলে বাকী কাঠিটুকু অ্যাশট্রেতে ফেলে দেন। আর যদি আঙুলের ডগায় একটু স্যাঁকা লাগে তবে আঙুলটাকে শাপ দেবেন। যদি জিজ্ঞেস করি "হাতটা পুড়ে ফেললেন নাকি?" উনি যেন এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করেন না, না ক'রে আমার দিকে চেয়ে অর্থহীন হাসি হাসেন। মুখে আবার নেমে আসে সেই অন্ধকার ছায়া।

"দেয়ার ইজ নো পারপাস্ ইন লিভিং, বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য নেই" এই বলে আমার দিকে তাকা'লেন। ভাবলাম, অনেক বছর আগে আমার মনেও তো ঠিক এই কথাটিই জেগেছিল যে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিসের জন্য আমার এই জীবন যাপন কার এই প্রশ্ন করলে অনেকের পক্ষেই এর উত্তর দেওয়া কঠিন বলে মনে করি। উনি তো এই মাত্রই খুব নতুন ভাবে এই প্রশ্নটা তুলেছেন। আমি যদি এর কোনো উত্তর দিতে চাই, তাহলে ওঁর কথাটা অন্য লাইনে চলে যাবে। সুতরাং উনিই কথা বলুন ভেবে আমি আমার মুখখানাকে গম্ভীর করে ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

"ওয়ান শুড হ্যাভ সাম পারপাস ইন লাইফ, প্রত্যেক মানুষেরই একটা লক্ষ্য থাকা উচিত। সেটা না থাকলে গোরুতে মানুষে তফাত কোথায় পেলে কি পেলে না সেটা অন্য কথা। শেষ পর্যন্ত দেখলে কিসের জন্য কোন্ লাভটা? কোনো একটা লক্ষ্যের কথা ভেবে নিতে হয়। সেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেলেই কি সব শেষ হয়ে গেল? সো দ্যাট্ ইজ নট দি পয়েণ্ট্—লক্ষ্যে আমরা পৌঁছলাম কিনা সেটা বড় কথা নয়। বাট্ ইউ হ্যাভ ওয়ান্, একটা লক্ষ্য তোমার থাকা উচিত। গাধার সামনে গাজর বেঁধে দেওয়ার মতো··· জানো তো সেই গল্পটা?" এই বলে উনি হাসতে লাগলেন।

আমি জানি সেই গল্প। তবু উনি আরও কিছুক্ষণ স্ফূর্তিতে কথা বলতে

থাকুন মনে ক'রে বললাম— 'জানি না তো গল্পটা। বলুন, বলুন প্লীজ। কীরকম গল্প সেটা?'

মঞ্জুর সঙ্গে মিশে মিশে তুমিও আমার কাছে মঞ্জু হয়ে গেছ। মঞ্জুও এই রকমই। কোনো একটা দরকারী কথা বললে আসল কথা ছেড়ে দিয়ে কেবল গল্পের জন্য প্রাণ উত্যক্ত করে তুলবে।'

'প্লীজ...প্লীজ...বলুন। জানি না ওই গল্পটা।

'আচ্ছা এটা তো জানো যে গাজর দেখালেই গাধা দৌড়ে আসে?'

'কিসের জন্য?'

'গাধাটা গাজর নিয়ে সাম্বার্ বানাবে, সেইজন্য' এই বলে তিনি কৌতুক করলেন। তখনই আমার মনে হল, ঐ যে প্রশ্ন করেছি 'কিসের জন্য' ওরকম প্রশ্ন আর করব না।

'কোনো একটা নার্সারী ক্লাসের গান, এখন আর সেই গানের কথা কিছুই মনে নেই। সেই ক্লাসরুমে টাঙানো কেবল ছবি এখনও চোখের সামনে ভাসছে। একটা ছেলে গাধার পিঠে বসে লম্বা একটা কাঠির আগায় একগুচ্ছ গাজর বেঁধে গাধার মুখের সামনে বেশ খানিকটা দূরে ধ'রে রেখেছে। গাধাটা তো গাজর খাবার জন্য লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়োচ্ছে। সেই রকম, মানে গাধার সামনেকার ঐ গাজরের মতোই হচ্ছিল মানুষের লক্ষ্য। মানুষ একটি গাধা। লক্ষ্য হল গাজর। আর গাধার দৌড়ানোটা হল মানুষের জীবন। কিন্তু আমার একটি নেই। আমিও ভেবে ভেবে দেখছি। আমি কিসের জন্য আছি? ছাত্র হিসেবে ছিলাম একেবারে নির্বোধ, বিজ্‌নেস্‌ম্যান হিসেবে চূড়ান্ত রকমে ব্যর্থ। স্বামী হিসেবে অপদার্থ, পিতা হিসেবে অযোগ্য। আমি যে কত বাজে ছাত্র ছিলাম তা জানলে তুমিও এখন আমাকে 'বেরিয়ে যাও' বলতে। তুমি যে আমাকে সে কথা বলছ না সেটা তোমার উদারতা ছাড়া আর কিছু নয়।'...

এতক্ষণে আমার পেট ক্ষিধেয় চোঁ-চোঁ করছে। সাড়ে দশটা বাজতে চলল। মনে হয় ওঁর খাওয়ার এখনও একঘণ্টা বাকী। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কিছু খাবেন এখন?'

কী একটা দেখিয়ে বললেন— 'ঐ ছোটো পুঁটুলীটা আনো।' আমি ওটা এনে ওঁর হাতে দিয়ে বললাম— 'প্লেট দেব কি?' মাথা নাড়লেন। প্লেট এনে দিলাম। আমিও ওইসঙ্গে দু'খানা বিস্কুট নিয়ে এলাম। এসে দেখি পুঁটুলীটাকে খুলে রেখেছেন আর তার মধ্য থেকে হাত-পা বেরিয়ে আছে। ভেড়া-পাঁঠা নাকি? দেখতে যেন কেমন লাগছে! চাক চাক ক'রে কাটা দুই স্লাইস টম্যাটো, আধখানা লেবু, দুটো কাঁচা লঙ্কা। এগুলোকে উনি কীভাবে খান দেখবার আশায় বসে রইলাম। জিজ্ঞেস করলাম—'এটা কী? মটন্?' আর কী হবে? ভেড়া-পাঁঠার মাংস কি আর বলতে পারি? 'মটন্' কথাটাই বেশ!

উনি ঐটা তুলে হাতে ধ'রে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। মাটন্ নয়, একে বলে 'চিকন্', মানে মুরগীর মাংস। আস্ত একটা মুরগী। খুব তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে মুরগীটার ওপর লেবুর রস নিংড়ে একটা ঠ্যাং তুলে নিয়ে কামড় দিলেন।

ইতিমধ্যে ষষ্ঠ গেলাস পূর্ণ করেছেন। এইভাবেই কি চলবে? একবার পান, অতঃপর আহার, পুনরায় পান, পুনরায় আহার? ন্যাপকিন চাইলেন। আমি একটা তোয়ালে এনে দিলাম। হঠাৎ কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন :

'দেখো মঞ্জু, তোমার সঙ্গে এই নতুন সাক্ষাতের পরে আমি ক্লাবে গিয়েছি বড় জোর দশবার মাত্র। আমিই ভেবে রেখেছি, যেমন ক'রে হোক ঐ ক্লাবে যাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু যতবার ভেবেছি, ততবারই সন্ধ্যা হলেই সেই ক্লাবে গিয়ে উঠতাম। কোনো কোনো দিন এইভাবে গিয়েছি— 'আজ আর খেলব না, আজ একটু ঘুরে আসব মাত্র।' কিন্তু পরে খেলতে বসে গেলাম। পদ্মা, মঞ্জু ওরা আমার যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে তা হল এই জুয়ো খেলা। অন্য বিষয়ে ভাবে না, এতে ভাবে কারণ এতে যে অনেক টাকা বেরিয়ে যায়। যে-সব জুয়াড়ির বাড়িতে আড্ডা জমে তাদের ধারণা যে তারাই হেরে যায়। বেশ মজার ব্যাপার, তাই না? এমন কোনো গেম্ আছে কি যাতে সকলেই হেরে যায়? এর মজাটা কী জানো, জুয়াড়ির গিন্নি জানে কত টাকা খেলায় নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু সে এটুকু জানতে পায় না যে তার কর্তা কত টাকা লাভ করল। কারণ ঐ জয়ের টাকা বা লাভের টাকা আর ঘরে পৌঁছয় না। সুতরাং এই হল লেসন্ বা মর‍্যাল্ : 'তুমি জিতলেও যা হারলেও তাই।' যারা জুয়ো খেলে তাদের ঘরের টাকা আর ঘরে ফিরে যায় না। এই জন্যই জুয়োখেলা ঘরের মেয়েদের দু চক্ষের বিষ। কোনো জুয়াড়ির টাকা সম্পর্কে কোনো চিন্তা নেই। সব বেটা লাখোপতি। তারা খেলতে ডাকলে কী করে 'না' বলি? ধনীর ছেলেদের— আমিও আছি তার মধ্যে— সম্বন্ধে একটা কথা জেনে রেখো। তারা জানে যে তাদের সঙ্গে তাদের টাকার কোনো সম্বন্ধ নেই, কারণ ও তো বাপ-দাদার রোজগারের টাকা। যদি সেই টাকাটা না থাকে, তবে তাদের এঁটো পাতা কুড়োবারও শক্তি থাকে না। আমিই তো দেখতে পাচ্ছি, কত যোগ্য, বুদ্ধিমান, চতুর, সৎ মানুষ টাকা নেই বলে অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করে। তাদের বিদ্যা বুদ্ধি, সামর্থ্য সব-কিছুই নষ্ট হয়ে যায় স্ত্রী পুত্র কন্যার অন্নবস্ত্র জোগাতে। কিন্তু এই ধনীর ছেলেরা, তাদের পিতৃপুরুষের টাকা না থাকলে, পরিবার পালন করতে পারত কি না সন্দেহ। আমাদের ক্লাবের যারা মেম্বর তারা সকলেই জেন্টলম্যান। এদের জেন্টিলিটি দেখতে হলে রাত সাড়ে দশটার পরে সেখানে যেতে হবে। কাজেই ক্লাবে গিয়ে আমার কোনো সুখ ছিল না, একটা হ্যাবিট মাত্র। হ্যাবিট-এর কোনো প্লেজার

নেই। ওতে কোনো বড় রকমের আনন্দ পাওয়া যায় না। 'কোনো দিন কি এতে আনন্দ পাওয়া যাবে না? সকলে তো এই কথা বলে'— এইভাবে বার বার একই কাব্য আমরা করে যাচ্ছি। ক'রে ক'রে ওটাও একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। তার পরে আর আনন্দ কোথায়? তারপরে যে আমরা ঐ ক্লাবে যাওয়া ইত্যাদি কাজগুলি করি, তার কারণ এই কাজেই আমরা অভ্যস্ত। এ যেন সেই গাধার সামনে গাজর বাঁধার গল্প।'

কথা বলতে বলতে খাচ্ছেন, খেতে খেতে পান করছেন। পাতা ভর্তি হাড় ও কাঁটা পড়ে আছে। এখনও উনি বক্তব্য বিষয়গুলি না বলে একটা প্রবল শব্দ করে উঠবেন বুঝলাম।

'কাজেই আমাদের দেখা হওয়ার পরে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কখনো সখনো এক-আধদিন এমনি গিয়ে মুখ দেখিয়ে আসি। চার-পাঁচদিন হল আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি, না? ও ক'দিন আমি ক্লাবে গিয়েছিলুম। তুমি জানো, আমার হাতে টাকা দেয় মঞ্জু। আবার মঞ্জুর কাছে এনে ফেরত দিয়ে তারপরে নিতে পারি। সেদিন হাতে টাকা বেশি ছিল না। মঞ্জুর কাছে চাইলাম। তার কাছেও অল্প টাকা ছিল। পদ্মার আলমারী থেকে এনে দিতে বললাম। সেদিনও এই কথা বলে চাইলাম যে টাকাটা ফেরত দেব এসে। এই রকম আরও দু'তিনবার মঞ্জু টাকা এনে দিয়েছিল। সেদিন মঞ্জু প্রথম 'না' বলে বসল। তারপরে অবশ্য এনে দিল। সেইজন্যই আমি ক্লাব থেকে বিদায় নিয়েছি। পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে খেললে দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে পুরো টাকা সরসর ক'রে এসে যায়। কিন্তু সেদিন আমার ব্যাড্‌লাক্ তুরুপ তাসগুলোও ব্যর্থ হল। তারপরে খেলাম পাত্র দুয়েক মদ্য। পাশে গেলাস রেখে সারা রাত খেলা চলল, টাকাও নিঃশেষ হয়ে গেল। মঞ্জুর কথা ভাবলেই বুকটা দুরদুর ক'রে ওঠে। কী করলাম— ও শেম···হোয়াট্ এ শেম?' এই পর্যন্ত বলে সিগারেট ধরিয়ে গ্লাসে চুমুক দিলেন।

প্রায় অর্ধেক বোতল শেষ করেছেন। আরও খাবেন নাকি? এই সবটাই খাবেন নাকি? এইভাবে কি খাওয়া উচিত। ঢের হয়েছে। আমি কী ক'রে বলি— 'ঢের হয়েছে?'··· জগের মধ্যে জল নেই··· সেই অছিলায় জিজ্ঞেস করলাম— 'জলে হয়েছে, না আরও কিছু চাই! চাই তো এনে দিই।'

'ব্যস ব্যস··· অনেকটা খেয়ে ফেলেছি... দিস ইজ দি লিমিট— তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই··· এসো, খাওয়া যাক··· দুধ চিনি এনে মিশিয়ে খেলে ইভিয়াপ্লম খুব চমৎকার হবে। আমাদের মঞ্জু এক ডজন খেয়ে ফেলে।' তখন একবার বলেছেন, আবারও একবার বললেন। বুঝলাম আগের কথা ওঁর মনে থাকে না।

রান্না ঘরে গিয়ে দুধ গরম ক'রে নিয়ে এলাম।

উনি ইংরেজীতেই বলছিলেন : 'জানো কি, ইংরেজীতে একটা এক্স্প্রেশন্ আছে— **As uncomfortable as an Englishman found cheating in cards in his Club ?'**

আমি জানতাম না। ওঁর বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝতে পারলাম ওটা কতদূর অপমানজনক অবস্থা। উনি ওরকমের কিছু করেছেন এই কথা ভাবতে গিয়ে মনে হল আমার খুব কষ্ট ও সহানুভূতি বোধ হয় একবার কান্নায় রূপে ভেঙে পড়বে। কিছুক্ষণ আগে উনি হাতটা ঘোরাবার সময়ে ঘাবড়ে গিয়ে চাইলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম. 'ক্লাবেও ঐরকম কিছু করেন-টরেন নাকি ?'

তখন উনি আমার দিকে তাকালেন। চোখ দুটি টকটকে লাল। শিশুর মতো কেবল মাথা নাড়তে লাগলেন।

29

সেদিন রাত্রি একটা পর্যন্ত থেকে তারপরে উনি বাড়ী রওনা হয়ে গেলেন। আমি বলেছিলাম— 'আজ রাতটা এখানেই থাকুন, কাল সকালে যাবেন। তাতে কিছু দোষ হবে না।' বললাম, কিন্তু শুনলেন না, চলে গেলেন। সেই বোতল, গেলাস, লিকর-কেস্ সব জিনিস সেইভাবে সোফার ওপরে ফেলে রেখে চলে গেলেন। এখন আমি কী করি ? 'দেখে শুনে সাবধানে যাবেন' এইটুকু বলে বিদায় দিয়ে ভিতরে এসে সমস্ত জিনিসগুলো তুলে সরিয়ে রাখলাম। পাতা, কাগজ ইত্যাদি জিনিসগুলো কুড়িয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। সারা রাত আমার ঘুম হল না। আচ্ছা, উনি কি এতই শিশু, নির্বোধ শিশু— ওঁরই কথায়—সেই রকম স্পয়েল্ড চাইল্ড্ কিনা আলালের ঘরের দুলাল !... ছি ! কী অপমান ! অত কলঙ্ক ! উনি বোধ করি আত্মহত্যাই করবেন। কিন্তু ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে সব সময়েই এই বুদ্ধি-পরামর্শ দিই যে ঐ সব কাজ কখনোই করা উচিত নয়, ওর চেয়ে গর্হিত কাজ আর কিছু নেই। ওঁকে কাঁদতে দেখলে ভারি কষ্ট হয় আমার. পেটের মধ্যে কেমন যেন উথাল-পাথাল করে··· কী বিধিলিপি !

টাকা যাচ্ছে যাক। কত টাকাই .য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ! উনি বার বার বলেন 'আমার কেন ওভাবে বুদ্ধিনাশ হয়েছিল ?' এই কথা বলে বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। মদ্যপানের সঙ্গে বুঝি মানুষের বুদ্ধি-শুদ্ধিও লোপ পায় ? কত কী সব করেছেন ! বাথরুমে গিয়ে পুরোনো প্যাক থেকে তুলে রাখা কার্ড্গুলোকে 'উইন্' করেছি বলে দেখিয়েছেন। হায় ! কী ভাবে অপমানিত হয়েছেন। কেউ কিছু বলেন নি ! ওদের মধ্যেই একটি ভালো লোক বুদ্ধি দিল— 'তুমি খুব খেয়েছ আজ... যাও বাড়ী চলে যাও।' এই বলে ধ'রে এনে গাড়ীতে চড়াবার জন্য

ওঁকে টানাটানি করেছেন···

উনি সেখানেই কেঁদে ফেললেন, 'আই অ্যাম সরি··· আই ডিড্‌ন্ট্ মীন ইট্‌, ···আমাকে ক্ষমা করো···' এই রকম কত কী বলে কাঁদতে লাগলেন।

ওদের মধ্যে একজন নাকি জিজ্ঞেস করল, 'কতদিন ধরে এ ধরনের ফাউল প্লে খেলে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছ ?'

'এই এবারই প্রথম বার' বলে ওদের বিশ্বাস করাতে চাইলেন। পারলেন কি ? 'ফ্রেণ্ডস্, তোমরা আমায় বিশ্বাস করো' এই বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'খুব উঁচু বংশে আমার জন্ম। কী মতিভ্রমে···কোনো দুষ্টবুদ্ধির পাল্লায় পড়ে, বাই দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ সাম ডেভিল, এই রকম ক'রে ফেলেছি।' এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

উনি যখন বলছিলেন যে উচ্চ বংশে তাঁর জন্ম তখন একজন নাকি হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল

উনি নাকি বলেছিলেন, 'এই ভুলের জন্য আমি, যত খুশী লাগুক, জরিমানা দিতে প্রস্তুত।' ক্লাবের পিওনগুলি মজা দেখবার জন্য এসে জড়ো হয়েছিল। গাড়ীতে চড়ার পর ওঁর কানে এল— 'এর পরে আর ক্লাবের দিকে পা বাড়িও না বলে দিচ্ছি, তোমার মেম্বারশিপ বাতিল হয়ে গেল। এই বেয়ারা শুনে রাখ্, তোরা, এই লোকটা এলে আর ভিতরে ঢুকতে দিবি নে।'

বোধ করি সেই রাতেই উনি আত্মহত্যা করবার সংকল্প করেন। এক বোতল ঘুমের বড়ি এনে এক বোতল হুইস্কির সঙ্গে, দুটি পিল আর এক গেলাস হুইস্কি খেলেই ঘুম, এই ছিল নাকি প্ল্যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সাহস হল না। প্রাণে বেঁচে থাকা খুবই অপমানজনক। বাইরে বেরোলেই সকলে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসবার মতো শব্দ শোনাবে।

এক ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুরে ফিরে কেবল এই কথাই বলেছেন।

'দেখুন, সবই ভালোর জন্য হয় জানবেন। আপনি আর ঐ ক্লাবমুখো হবেন না। ওখানে না গেলে কোনো ক্ষতি নেই। কয়েকদিন পরে তারা একথা বুঝতে পারবে যে আপনি একটা মতিভ্রমে পড়েই অমন একটা কাজ করেছিলেন। এজন্য আপনি নিজের মনটাকে এত কষ্ট দেবেন না। আপনাকে কি ওরা চেনে না ? তবু ও রকম একটা বাজে রকম ট্রিটমেণ্ট হতে পারে তাই করেছে ওরা। ওটাই নেষ্য কি ? কে জানে ? তবে আপনাকে যে ওরা ক্লাবে যেতে নিষেধ করেছে, একভাবে দেখতে গেলে ওদের নিষেধ আপনার পক্ষে মঙ্গলকর হবেই বলে মনে করবেন। নইলে ওই ক্লাবে গিয়ে ওদের সঙ্গে আপনাকে 'কিন্তু কিন্তু' ভাব নিয়ে থাকতে হত। যে যাই বলুক-না-কেন, সবই আপনার ভালোর জন্য বলে মনে করবেন।' এইভাবে ওঁকে সান্ত্বনা দিলাম।

আমি দুটো সান্ত্বনার কথা বললেই যথেষ্ট। তক্ষুনি উনি শান্ত হয়ে যান। আমার ওপর ওঁর কত যে বিশ্বাস, কত যে শ্রদ্ধা !···

আজকাল এক সপ্তাহ যাবৎ রোজ সন্ধ্যাবেলা উনি আমায় এখানেই আসেন। ন'টা দশটা পর্যন্ত থেকে তারপরে চলে যান। অন্য কোনো 'কাজকর্ম' আছে বলে মনে হয় না। ওঁর জীবনে যেন আর কোনো আগ্রহ নেই। মনে হয় এখন ওর সঙ্গী মাত্র দুটি : একমাত্র জীবন সঙ্গী মদ্যপান করা, আর কথার সঙ্গী আমি।

সেদিন থেকে উনি আর 'শেভ' করেন নি। কী একটা বৈরাগ্য! আমিও দু'একবার বলে দেখেছি, এক এক সময়ে এক এক রকম উত্তর দেন :

'কেন, এটাও তো বেশ ভালো। এইটিন্থ্ সেঞ্চুরিতে সারা য়ুরোপে দাড়ি রাখাই ছিল ফ্যাশন। সেই ফ্যাশন এখন আবার ফিরে এসেছে অল্ ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। এ তো সন্ন্যাসীর দাড়ি নয়··· আর দশ দিন পরে নীট্‌লি ট্রিম্ করিয়ে নিলে বেশ দেখাবে।' এই বলে এক বক্তৃতা ঝাড়লেন।

আজকে সকাল বেলায় বেড়াবার সময়ে বললাম, 'নাই বা থাকল আপনার দাড়ি··· আপনাকে আপনি বলে বোধ হয় না, মনে হয় অন্য কোনো লোক··· ফেলে দিন দাড়ি।' চোখ টিপে বললেন : 'আজকাল আমার দাড়ি নিয়ে কারো কোনো উপদ্রব নেই, নো কমপ্লেইন্ট্স্— কোনো অভিযোগ নেই। তবে কেন আমি দাড়ি ফেলব?'

উনি ঠাট্টা ক'রে, হাসির ছলে, চোখ টিপে কথাটা বললেন বটে, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি— ওঁর মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। আজকাল উনি গাড়ীর মধ্যেই বোতল রাখেন। সেই সমস্ত মেয়ে বন্ধু ছেড়েছুড়ে দিয়েছেন। আমিই তো দেখতে পাচ্ছি। রোজ আমার এখানে আসেন। নিয়মিতভাবে রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে বাড়ী চলে যান। সকালে আমার এখানে আসেন মর্নিং ওয়াকের জন্য ..তারপরে অফিস···সন্ধ্যাবেলায় আবার আমার বাড়ীতে। এ একটা মস্ত বড়ো পরিবর্তন সন্দেহ নেই।

পরিবর্তনে আপত্তি নেই। তার জন্য কি বৈরাগ্য ধারণ করতে হবে? দাড়ি চুল গজাবার দরকার কী?

বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। সন্ধ্যাবেলায় আমাকে এনে ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে গিয়ে অন্য পোশাকে এলেন। হাতে সেই কেস্। সেটাকে নিয়ে এসে ভিতরে রাখলেন। বড় ঘরে সোফার ওপর বসে একটা সিগারেট ধরালেন।

'গঙ্গা, আমি একটা বিষয় খুঁজে বের করেছি, কিন্তু হাউ টু ডিল উইথ্ ইট, তাই বুঝতে পারছি না।' এই বলে খুব সীরিয়াসভাবে আরম্ভ করলেন। খানিক-ক্ষণ দাড়িটা চুলকোলেন। 'বিষয়টা কী বলুন' এই বলে আমিও বসলাম!

আমার হাতের বইখানা চেয়ে হাত বাড়ালেন। বইখানা দিলুম তাঁর হাতে। 'ব্রাদার্স অব কার্মোজোব।'

একজোড়া তাস তাতে নিয়ে যেমন পিরুরুরু ক'রে ভাঁজা (শাফল্ করা) হয়, সেই ভাবে বইখানির পৃষ্ঠাগুলোর প্রান্তভাগ ধ'রে শাফল্ করলেন। মাঝ-খানকার একটা পৃষ্ঠা উল্টে খানিকটা পড়লেন— কিছু একটা বেশ রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছিলেন বোঝা গেল।

'বেশ বলেছে গল্পা' এখানে এসো-না কেন ? এই প্যারাগ্রাফটা পড়ো না' —এই বলে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। আমি পড়ে গেলাম :

'A man will fall in love with some beauty, with a woman's body, or even with a part of a woman's body. A sensualist can understand that, and he will abandon his own children for her, sell his country, Russia too ! If he is honest, he will steal ; If he is human, he will murder, if he is faithful, he will deceive..'

অর্থাৎ : কোনো সুন্দরী রমণী, সেই রমণীর শরীর, এমন কি সেই শরীরের একটি অংশকে দেখেও একজন পুরুষের ভালো লাগতে পারে এবং সে সেই সুন্দরীকে ভালোবাসতেও পারে। সে যদি ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ হয়, তবে সে ঐ রমণীকে পাওয়ার জন্য দরকার হলে তার সন্তানদের ত্যাগ করবে. জন্মভূমি রাশিয়াকেও বিকিয়ে দেবে। যদি সে সৎ হয়, তবে চুরি করবে : যদি মানবিক গুণসম্পন্ন হয়. তবে খুন করবে ; যদি সে বিশ্বাস-ভাজন হয়, তবে প্রতারকে পরিণত হবে...'

কিসের জন্য যে এই অংশটি পড়তে বললেন তা বোঝা গেল না। আমি যখন পড়ছিলাম, তখন প্রতিটি বাক্যের পরে মাথা নাড়িয়ে যেন বলছেন— 'ঠিক লিখেছে. বিলকুল ঠিক।' "এ কেবল পুরুষদের পক্ষেই নয়, মেয়েদের পক্ষেও প্রযোজ্য।" এই বলে তিনি খানিকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। কিছুই বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম— 'কী বললেন ?'

'মঞ্জু সেই ছেলেটাকে ভালোবাসে। আমি ধরে ফেলেছি। মঞ্জু কেবল ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ফাঁকি দেয় তার মাকে, তোমাকে, আমাকে. সকলকে। সেইটেই আমার পক্ষে সবচেয়ে দুঃখের কারণ। পদ্মা অতটা একগুঁয়ে বলে মঞ্জুর এই লুকোচুরি শুরু হয়েছে। কী করা যায় তাই ভাবছিলাম। মঞ্জুর ওপর আমার এই কারণে রাগ হয়েছে যে সে এতটা লুকোচুরি করছে যে তোমার কাছে মিথ্যা বলতে ও ফাঁকি দিতে দ্বিধা করে নি। এই বইতে যেমন বলেছে, ভালোবাসার যোগ্য হতে হলে যেন অন্য ফাঁকি দিতেই হবে। মঞ্জু পদ্মার কাছে যদি জোর করে বলত—'আমি ওকে ভালোবাসি. আমরা সেইজন্য মাঝে মাঝে দেখা করি' তাহলে কী আর হত ? ওকে বাড়ীতে তালা দিয়ে রাখো ঠিক আছে, তার জন্য যদি এইভাবে ব্যাপারটাকে গড়াতে দেওয়া হয়, তবে এর শেষ কোথায় ?' — এই বলে উনি দাড়ি চুলকোতে লাগলেন।

তারপরে উনিই বললেন 'পরিণাম সম্পর্কে আমাদের ভাবনা কী ? আজ-

কালকার ছেলেমেয়েদের কাছে কিছুই বলা যাবে না। প্রেমে ও পরিণয়ে কোনো আইন-কানুন নেই। মঞ্জু তার মাকে ফাঁকি দিয়েছে ঠিক। আমাকেও কিসের জন্য ফাঁকি দিল আমি সেই কথাটাই ভাবছি।'

আমি বললাম, 'এর নাম ফাঁকি? ব্যাপারটা কেবল তার মায়ের কাছে বলে তার অনুমতি নেবে— প্রথমে এই ছিল মঞ্জুর চেষ্টা। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতেই, আর কি কাউকে জানাবার দরকার আছে এই ভেবেই হয়তো মায়ের কাছে গোপন করা কাজ আপনার আমার কাছে তা জানাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। কিন্তু একটা কথা। কিছুক্ষণ আগে আপনি এই বইখানির একটা অংশ পড়তে বলেছিলেন। আমার মনে হয় মঞ্জুর ভালোবাসা ও-ধরনের নয়। সি উইল নেভার অ্যাবানডন এনিথিং ফর দি সেক অব সামথিং। মঞ্জু কোনো কিছুর জন্যই তার মাকে অথবা অথবা পড়াশুনাকে এমনকি এক কাপ আইসক্রীমকেও ত্যাগ করবে না। তার মা, বাবা এবং আমি— আমাদের সকলের চেয়ে বুদ্ধিশালী। আমি আপনাকে বলছি একে ভালোবাসা মনে করবেন না। এ বিষয়ে মঞ্জু কাউকে ফাঁকি দেবে না। আজকের এই সামজীর মতো কাল একজন রামজীর সঙ্গে স্কুটারে যাবে। সামজীর সঙ্গে যাওয়াই সামজীর প্রতি ভালোবাসা নয়। এ যুগের কলেজের ছাত্রীদের এটা একটা অবশ্যকরণীয় কাজ। তারা ভালোই জানে যে, সারা জীবন যেমন তারা কলেজের স্টুডেন্ট্স্ হয়ে থাকতে পারবে না তেমনি সারা জীবনটাও এইভাবে থাকতে পারবে না। এই সমস্ত হল পার্ট অব্ কলেজ লাইফ। কালই যদি পদ্মা দেখেশুনে একটি জামাই যোগাড় করে আনে, মঞ্জু মাথাটি নীচু ক'রে এসে কনের আসনে বসে মঙ্গলসূত্রটি ধারণ করবে! এই সমস্ত সামজী-রামজীর দল সকলেই এসে আনন্দ সহকারে 'অক্ষত' (তেঁতুল গোলা জলে ভেজানো চাল, যা হলুদ রঙের হয়ে যায়) বর্ষণ করবে। একই কাজ এক এক জেনারেশন এক এক রকম ক'রে দেখে। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। মঞ্জু খুব চালাক মেয়ে।'

আমি যে এ এতক্ষণ ধরে সবিস্তারে সর্বকথা বললাম, তাতেও ওঁর তৃপ্তি হল না। 'বুঝলে গঙ্গা, ঐ পদ্মার জন্যই সমস্ত ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেছে। আমি এ সম্পর্কে পদ্মার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলব'— ইনি যখন কথাগুলি বলছিলেন তখন তাঁর চোখে মুখে দেখতে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন জনৈক পিতার মানসিক সংকট। উনি গিয়ে বললেই যে পদ্মার মনে তার যৌক্তিকতা গ্রাহ্য হবে আমার তা মনে হল না।

হঠাৎ উনি বলে উঠলেন—'এই সমস্ত মা-গুলি নির্বোধ।' এই কথাটা শুনেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল।

রাত আটটা বাজতে চলেছে। এই আর কিছুক্ষণ পরেই ওঁর নিত্য-পারায়ণ শুরু হয়ে যাবে। দশটা-সাড়ে দশটায় আমার এখান থেকে বিদায় নেবেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— 'আপনার খেতে তো কিছু একটা লাগবে ?

উনি পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন— 'তুমি তোমার খাওয়ার কী ব্যবস্থা করেছ ?'

আই-আইয়ো ! আজকে আমি কিছুই বানাই নি। খালি আমার জন্য চারখানা পাঁপড় ভেজে রেখেছি।' আমার কথা শোনা মাত্রই উনি হাত তালি দিয়ে খুব খুশী হয়ে বললেন, 'হুইস্কির সঙ্গে পাঁপড় জমবে ভালো। একখানা নিয়ে এসো তো।'

'আচ্ছা, গরম ক'রে ভেজে নিয়ে আসছি' বলে আমি রান্না ঘরে গেলাম।

উনি ওঁর পারায়ণ শুরু করে দিলেন।

30

থালা ভর্তি পাঁপড় ভেজে এনে রাখলাম। পান করতে বসলে আজকাল উনি খুব কথা বলেন। বেশ গম্ভীর হয়ে বলেন। বুদ্ধিমানের মতোই বলেন। ওঁর কথাবার্তা থেকে একটা ব্যাপার বেশ ভয়ংকর বলে মনে হয়। মনে হয় উনি আত্মহত্যা করবেন। কোনো-না-কোনো সময়ে উনি একদিন আত্মহত্যা করেই প্রাণ-সংহার করবেন। মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। ওঁর জীবনে কিছুমাত্র ইন্‌টারেস্ট নেই। সব-কিছুই উনি হারিয়ে বসে আছেন। মদ্যপানেও আর ইন্‌টারেস্ট নেই। জীবনের এই রিক্ততা শূন্যতা ভুলে থাকার জন্য মদ্যপান করেন। খুবই শোচনীয় জীবন। আজকাল মেয়েদের ব্যাপারেও ওঁর আসক্তি চলে গেছে। ওঁর বয়স হয়ে যাচ্ছে— এটাও কি কারণ ? বয়সটা কি হঠাৎ বেড়ে যায় নাকি ?

'গঙ্গা... আমার ইচ্ছা হয় কি জানো...সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যা-হোক কোথাও পালিয়ে যাই। এই জীবনের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই। কারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধের প্রয়োজন নেই। গাড়ী, টাকা, মদ, স্ত্রীলোক, পত্নী, পুত্র-কন্যা, বন্ধুবান্ধব সকলকে ত্যাগ করে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে গিয়ে অপরিচিত মানুষের মধ্যে বাস করি, নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করি। কষ্ট করব, প্রত্যেক বেলার অন্ন গা খাটিয়ে কাজ করে সংগ্রহ করব, রাস্তায় ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াব, রোদে ও শীতে পুড়ব ও কাঁপব, ধুলোয় মাটিতে শুয়ে থাকব। বস্ত্রহীন হয়ে কত মানুষ ঘুরে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে এক হয়ে কোনো প্রভেদ না রেখে থাকব। আগেকার জীবনের কথা সব ভুলে যাব। ওঃ! কেমন হবে বলো তো। আই থিঙ্ক আই অ্যাম গেটিং টু ডু দ্যাট্।' খুব উৎসাহের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন।

আমি হাসলাম। আমার হাসিতে ওঁর কল্পনাজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। উনি বোধ হয় ভাবছেন আমি ওঁকে দেখে ঠাট্টা করছি। এক মুহূর্তে ওঁর মুখখানি কেমন যেন বদলে গেল।

জিজ্ঞেস করলেন— 'হাসলে যে?'

'এক বোতল স্কচ্ হুইস্কির ফলে আপনার কল্পনার কথা ভেবে হাসলাম। আপনি যে জীবনের কথা বর্ণনা করলেন, সেই জীবনের সত্যিকার বাসিন্দা যারা, মানে শ্রমিক কৃষক ইত্যাদি, তারাও বোধ করি— এই আপনি যে ভাবে বসে আছেন— ঠিক সেই ভাবে আপনার মতো সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে চাইবে। এই কথাটা ভেবেই না হাসি এসে গেল।'

উনিও একটু ভাবলেন। কিছুক্ষণ আগে নানা কল্পনার আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছিল। এবার খুব নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তুমি বলতে চাও, ও জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব?'

'আমি ওভাবে পরিবর্তিত হতে পারি— এটা কি একটা অসম্ভব কাজ বলে মনে করছ?' আমাকে এই প্রশ্ন করার সময়ে ওঁর গলায় কিন্তু এরকম কোনো দৃঢ়তা ছিল না— 'এই দেখো, আমি ক'রে দেখাচ্ছি।'

উনি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করছেন 'আমার দ্বারা এইটুকুও সম্ভব হবে না?' আচ্ছা, এই আত্মজিজ্ঞাসায় ওঁর কতটুকু শান্তি— এই কথা ভেবে আমার মনটা খুব ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

অবশেষে উনিই বললেন— 'এখন কি তুমি বুঝতে পারছ, গঙ্গা, কেন আমি আমার কোনো কাজের জন্যই দায়ী নই? যা করণীয় তা ক'রে কাজের সমস্ত ফল নেওয়াটাই জীবন— এই মনে করেই জীবন চালিয়ে নিচ্ছি। আমার এই ফিলজফি অব লাইফটা কতদূর ঠিক বলো তো।'

আজ উনি এই মুহূর্ত পর্যন্ত কত গেলাস পানীয় সেবন করেছেন। তা আমি গুনে রাখতে ভুলে গেছি। এ একটা চাকরি নাকি আমার। মদ খাবেন উনি গেলাসে গেলাসে— আর হিসাব রাখব বুঝি আমি?

আমি এবার স্বেচ্ছাক্রমেই ওঁর কাছে একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এই মাত্র যা বললেন —কোথায় কোন অজানা দেশে গিয়ে অপরিচিত মানুষের মধ্যে থেকে নতুন জীবন আরম্ভ করবেন। আচ্ছা, আপনার সেই নতুন জীবনে যদি আমিও এসে যোগ দিই, তবে কেমন হয়?'

চোখ দুটো বড় বড় ক'রে উনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'হোয়াট্ ডু ইউ মীন্? কী বলছ তুমি?' আমি যে কী বলছি তা বুঝেও উনি না-বোঝার ভান ক'রে জিজ্ঞেস করেছেন। আমিও তাই বললাম—'ইয়েস্ আই মীন দ্যাট্, আপনি যা ভাবছেন তাই বলছি আমি।'

এবার উনি হেসে ফেললেন। বাব্বা! কতদিন হল ওঁর মুখে এরকম হাসি দেখি নি। খুব তৃপ্তির সঙ্গে, খুব হালকা ভাবে হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন : 'আমি পাগলামো করে কিছু একটা কল্পনা করে বলেছি, তার মানে তুমিই কেবল ওরকম কল্পনা করতে পারো না, তাই না?'

'কথা ঘোরাবেন না। আমিও যদি আসি আপনার সঙ্গে সেই দেশান্তরের পথে, তবে আমরা দুজনেই যাব তো?' আমি সোজাসুজি জানতে চাইলাম।

'এ তো দেখছি সন্ন্যাসীর সেই বেড়ালপালার গল্প!' যে-কোনো একটা বিষয়ে কিছু বলতে হলেই ওঁর একটি গল্প চাই। এরকম গল্পের ঝুলিটা বেশ বড়ই দেখছি। ওকে ভালো মেজাজে রাখতে চাই বলে জিজ্ঞেস করলাম— 'আচ্ছা কী রকম সেই গল্পটা?'

'আবার গল্প শুনতে লাগলে?' এই বলে শুরু ক'রে দিলেন— 'একজন সন্ন্যাসীর কোপীনের দফারফা করেছিল একটা ইঁদুর। সেই ইঁদুরটাকে ধরবার জন্য সন্ন্যাসী ভাবলেন একটি বিড়াল পালার কথা। তারপরে বিড়ালটাকে দুধ খাওয়াবার জন্য পালতে হল একটি গাই। তারপরে গোরুটির দেখাশোনা করবার জন্য রাখতে হল একটি ছেলে। ছেলেটি বড় হয়ে উঠল। তখন তাকে ঘরে রাখবার জন্য দরকার হল একটি স্ত্রীলোকের। তা, তুমি যদি যেতে চাও আমার সঙ্গে দেশান্তরে, তবে আমাদের ব্যাপারটাও হবে ঐ রকম।' এই বলে তিনি খুব হাসতে লাগলেন, আমিও যোগ দিলাম সেই হাসিতে।

এদিকে গল্প করতে করতে পাঁপড়ও সব শেষ করে ফেললেন।

'আরও পাঁপড় দিই কয়েকখানা?' আনবার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'না না, দরকার নেই। ঢের হয়েছে।··· এখন আমার খাওয়ার সময় হল' বলতে বলতে ঘড়ির দিকে তাকালেন।

'ওরকম কোনো নির্দিষ্ট সময়ও আপনার আছে নাকি?'

উত্তরে উনি পেটের ওপর অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখালেন। তা ঠিক ওর খাওয়া হয় নি। আর ওকে খাওয়ানোর মতো কিছু আমার এখানে নেই।

আমি ভাবছিলাম—একটা রান্নার ঠাকুরের ব্যবস্থা করা দরকার। যে ভেজিটেরিয়াল্ নন-ভেজিটেরিয়াল্ দু'রকম রান্নাই করতে পারে এই রকম লোক রাখাই ভালো, নয় কি? লোক রাখতে পারলে ওকে এখানেই খেতে বলব। প্রথমে দরকার ওর জন্য দু'খানি লুঙ্গি, উনি যাতে জানতে না পারেন এমনভাবে কালই দোকান থেকে দুটো সুন্দর দেখে লুঙ্গি কিনে আনতেই হবে। লুঙ্গি না হলে বড় কষ্ট হয় ওর, কোনো কোনো দিন রাত একটা পর্যন্ত প্যান্ট পরে বসে থাকা অস্বস্তিকর।

সাড়ে দশটা বাজতে চলেছে। রওনা হওয়ার আগে বললেন— 'এই হল জীবন। ইট ইজ অলরেডি ডিসাইডেড, আগে থেকেই সব ঠিক হয়ে আছে জীবনের কখন কী ঘটবে। আমাদের কিছুই করবার নেই এতে। মরব বললেই আত্মহত্যা করা যায় না। সব-কিছু ছেড়ে ছুড়ে যে পালিয়ে যাব তাও যেন সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। একেবারেই যে অসম্ভব তাও নয়। জীবনে সবই সম্ভব। কিন্তু ওরও কোনো অর্থ নেই। তাহলে··· জীবনটা চালিয়েই যাই বেশ অনাসক্তভাবে।'

আ! জীবনের কত বড় একটা ব্যাপারকে অত সহজভাবেই যে উনি বলে ফেললেন তা ভেবে আমার সমস্ত দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আমার সন্দেহ, উনি নিজে যা বললেন সে সম্বন্ধে উনি নিজেই সচেতন কি না!

বেঙ্গুমামা এইভাবে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করে। তার কথাতেও এই ভাবেই আমি কোনো অর্থ কোনো আলো পাওয়া যেত না। তা যেন ছিল খালি মন্ত্র। কিন্তু উনি যখন সেই একই কথা বলেন তখন যেন সেই কথাটার ডাইমেনশনটা বোঝা যায়।

ওঁকে অনুরোধ জানালাম— 'আর একবার বলুন তো।' তাড়াতাড়ি করে এবং সাগ্রহে বলার ফলে উনি যেন ভড়কে গেলেন। উনি আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন 'কী বলেছি যে আবার বলব?' তাই তো, কথাটা কেন জিজ্ঞেস করলাম? চুপ করে বসে থাকলে ওঁর মানসিক প্রবণতায় উনি অন্য কিছু হয়তো বলতে থাকবেন। সেইজন্য আমি ওঁর বুঝতে সুবিধা হবে বলে ইংরেজীতেই বললাম অনাসক্ত হয়ে জীবন যাপন সম্পর্কে আপনি কী একটা কথা বলছিলেন।'

উনি উত্তর দিলেন— 'ইয়েস, আমার কী হল? মঞ্জুর বিষয়ে, তোমার বিষয়ে, আমার বিষয়ে এত যে চিন্তা ভাবনা করলাম, তার ফলে কিছু যে করতে পারব তার তো কোনো উপায় নেই। মিছিমিছি চিন্তাভাবনা করলে তাতে লাভটা কী বলো। কাজেই তুমি এইভাবে জীবন যাপন করছ বা ওইভাবে, সেটা খুব ইম্‌পরট্যাণ্ট ব্যাপার নয়। যেখানেই বাস করি-না-কেন কী এসে যায় তাতে? আমার হাতে কিছুই নেই। আমরা তো এভাবে বাঁচিনি যে আমাদের হাতেই সমস্ত অধিকার। যেতে দাও—লীভ ইট। স্কচ খেলেও যা, সারায়ব খেলেও তাই। স্কচ্ খেলে নোংরা কথা সব মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, আর সারায়াব্ খেলে বড় বড় বিষয় মুখে আসে। আমি একটিই এখন বুঝতে পারছি। আমাদের জন্ম, বড় হয়ে ওঠা, কর্তব্যকর্মের জন্য ব্যয়িত অর্থের জন্য সব-কিছুর জন্যই আমিই দায়ী একথা ভাবলেও অথবা আমি দায়ী নই একথা ভাবলেও আমাদের দ্বারা হবে না কিছুই। কাজেই কোনো কিছুর জন্য দুঃখ কোরো না। আনন্দও কোরো না। দুঃখ বা আনন্দ যাই আসুক-না-কেন, দুটোকেই তুল্যভাবে উপলব্ধি করাও দরকার। আমাদের হাতে কিছু নেই…'

আই আইয়ো! উনি কী কী সব কথা বলে যাচ্ছেন! বেশ একটু আশ্চর্য হলাম দেখে যে উনি এখন খুব ফিলজফিকাল মেজাজে আছেন। কিন্তু ওর 'ফিলজ'প' বলা একরকমের ন্যায়সংগত ও যথার্থ ব্যাপার। ওর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রার্থনা করি এটা যেন মঙ্গলে পরিসমাপ্ত হয়। কিছুক্ষণ আগে একটা ভয় জেগেছিল যে উনি বোধ করি কোনো একদিন আত্মহত্যা ক'রে বসবেন। সেটা এখন হ্রাস পেয়ে ওর মনে শান্তি দেখা দিয়েছে।

উনি রওনা হলেন।

পরদিন মর্নিং ওয়াকের সময়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম— 'কাল রাতের কথা মনে আছে তো?'

আই ওয়াজ নট্ ড্রাঙ্ক! আমি মাতাল হই নি তো। মদ খাওয়া এক কথা, ইংরেজীতে কথাটা বুঝিয়ে বললেন।

সিমেন্টে তৈরি পেভমেন্টের ওপর আমরা বেশ দ্রুতবেগে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলাম। (আজকাল কোনো কোনো সময়ে কথা বলতে বলতে চলি, অভ্যাস হয়ে গেছে। চলতে চলতে কথা বলতে গেলে একজন অন্যজনের মুখ দেখতে পায় না। খালি 'হুঁ হুঁ' ক'রে শুনে যেতে হয়।)

'আমি একদিন সুইসাইড করতে চেষ্টা করে তারপরে মন পাল্টে গেল 'না, সুইসাইড নয়' এই বলে মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেদিন থেকে আমি অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। জীবনে কত পরিবর্তন, কত নতুন নতুন বিষয় আমি জানলাম।

'জীবনে কত কী দুঃখ কষ্ট। সেই-সব দুঃখ কষ্টের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য মরব বলে ঠিক করেছিলাম। তাই তো আমি ভেবেছিলাম যে সুইসাইড করব। এখন যদি সেই দুঃখকষ্টের কথা বল, তাহলে বলব আমি মরে আছি। এই মর্মে কুরলের একটি শ্লোক মনে পড়ছে আমার : মানুষ যখন সাংসারিক বস্তু ত্যাগ করে, তখন সেই বস্তু থেকে উৎপন্ন দুঃখের হাত হতেও সে মুক্তি লাভ করে।

পরদিন ভোরে আমি ঘুম থেকে চোখ মেলার সময়ে, কী সৌভাগ্য আমার, আমি মরি নি, বেঁচে আছি এবং সেই ভাবনায়— আনন্দ পেলাম। আমার বিছানা থেকে জানালা দিয়ে দেখে মনে হল যেন নারকেল পাতার তৈরি পাখা। জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। সেই নারকেল পাতা যেন পাখার মতো হয়ে পড়ে খুব মনোরম ভঙ্গিতে মাথাটাকে নেড়ে নেড়ে কী সব উপভোগ করছে বলে আমি বেশ রোমান্টিক ভাবে ফীল করছিলাম। সামনের ঐ লনে যে ঘাসগুলি বেড়ে উঠেছে তারাও যেন আমাকে দেখে বলছে— 'এই! তুই মরিস নি বলেই আমাদের দেখার সৌভাগ্য লাভ করছিস। এই হল জীবন। লাইফ খুব সুন্দর ও সরল। আমরাই তাকে জঘন্য করে তুলি। জটিল করে তুলি। সেদিন ভেবেছিলাম এই সমস্ত কথা তোমার কাছে এসে বলব, কিন্তু আমি সুইসাইড করব জানলে তুমি খুবই কষ্ট পাবে বলে আর তোমাকে বলি নি। তাছাড়া আমার দ্বারা সুইসাইড করা সম্ভব হবে না এই রকম একটা ফীলিং প্রবল হয়ে উঠল... এখন সেটা চলে গেছে। আর আমি সুইসাইড করবার চেষ্টা করব না।' শেষ কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন।

কাল রাতে আমার মনের মধ্যে যে ভয় জমেছিল আজ এখন তা চলে গেল। আমার ইচ্ছা হল ওঁর হাতখানি শক্ত ক'রে ধ'রে খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিই। ফিরে তাকালাম। উনিও আমার দিকে তাকালেন। হাসলেন। ওঁর চোখে

মুখে একটা নতুন আভা দেখা গেল।

'আপনি কবে দাড়ি ট্রিম করবেন? আর তা না হলে সন্ন্যাসী হয়ে যান।' এই ভাবে একটু ঠাট্টা পরিহাস ক'রে বললাম।

'আজ করব' বলে দাড়িতে হাত বুলোলেন।

অফিসে বসে আছি। ফোনটা বেজে চলেছে। উনিই হবেন ভেবে তুলে ধরলাম। উনি ছাড়া আর কে আছে আমাকে ফোন করতে পারে? হয়তো কোনো অফিসের কাজে অন্য কেউ হ'তে পারে।

'ইয়েস...' 'মিস্ গঙ্গা...' 'স্পীকিং...'

একী আশ্চর্য। গল্প-লেখক র. কু. ব. কথা বলছেন!

'নমস্কার স্যার ..'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কথাবার্তা সাক্ষাতেই হবে। আপনার অফিসে আসব কি? না বাড়ীতে? বাড়ীতে মা তো আছেন?...'

'মা দাদার বাড়ীতে চলে গেছে। অফিসেই আসুন না।'

'লাঞ্চ আওয়ারে আসব কি?'

'হ্যাঁ, তাই আসুন।'

ধন্যবাদ... আসছি। কিসের জন্য তা সাক্ষাতেই বলব। ততক্ষণ পর্যন্ত সাস্‌পেন্‌স্‌। আশ্চর্য হচ্ছেন! র. কু. ব. পর্যন্ত সাসপেন্স সৃষ্টি করছেন? অপেক্ষা করুন। কেবল গল্পেই নয়, জীবনেও সাসপেন্স আছে। গু. কে.।'

ব্যাপার কিছুই বোঝা গেল না। ভাবছি কী হতে পারে। যাহোক, কিছুক্ষণ পরেই তো জানা যাবে।

৪১

আমার থেকে থেকে হাসি আসছে। আমি বাইরে হাসির আভাসমাত্র না দেখিয়ে মনের মধ্যেই হেসে চলেছি। মনের মধ্যে একটা দুষ্টুমি করার ঝোঁক আসছে। আমার ভারি ইচ্ছে করে আয়নার সামনে গিয়ে আমার নিজের মুখখানা দেখতে। একটি লাজুক প্রকৃতির পুরুষ মাথা নীচু ক'রে খুবই শান্ত ভাবে বসে আছেন আমার উল্টো দিকে লেখক র. কু. ব.।

'আপনি তো সেদিন আমাদের বাড়ী থেকে চলে এলেন। তারপর আমার মা আপনার বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন। দেখুন কত লোকই তো আমাকে খুঁজতে আসে। মা কিন্তু কখনও কারও সম্বন্ধে জিগ্যেস করে না। কিন্তু কেবল আপনার সম্পর্কেই জিগ্যেস করছেন, খুব প্রশংসা করছেন আপনার। এত লেখাপড়া শিখে এত বড় চাকরী করছে অথচ কী সরল! আপনি কেন বিয়ে

কারণ কি মা সে বিষয়ে আমাকে জিগ্যেস করেন, আমি কি উত্তর দিই বলুন। শেষে একদিন বলে ফেললাম— 'তোমার যদি দরকার থাকে মা তার কাছে গিয়েই জিগ্যেস করো।' আজও আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি, আমার মাকে নিয়ে আপনাদের বাড়ীতে এসে আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে কথা বলবে— এই ছিল প্ল্যান। আমি আবার আপনার বাড়ী চিনি না। আপনি বোধ হয় মায়ের কাছে বলেছিলেন পঞ্চবটী সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে কি বের করা যায়। আমার কি অন্য কোনো কাজ নেই দেখুন। এখন তার এক সময় এসেছে। এর পরে আপনার সঙ্গে কথা বলা ঠিক হবে না। বাড়ীতে গিয়ে আমি মায়ের কাছে বলব।' এই বলে তিনি একটু হাসলেন।

আমি বললাম— 'আপনার 'সাসপেন্স' খুবই দুর্বল মনে হচ্ছে।'

তিনি বললেন— 'সেই জন্যই তো আমি কোনো সাসপেন্স রাখি নি।'

'সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছেই বলতে পারেন।'

'আচ্ছা বেশ! বলছি, বলতে বাধা কী? আমি ভেবেছিলাম পরিবারের মধ্যে যারা বড় তাদের মধ্যে কথাবার্তাটা হলেই ঠিক হত। অবশ্য ফাইনাল ডিসিশন করতে হবে আপনাকেই। এই অফিসের আবহাওয়ায় এই ব্যাপারে কথা বলা তেমন সুবিধের হবে বলে মনে হয় না।' এই বলে যেন চুরি করেছেন এইভাবে চারদিকে তাকাতে লাগলেন।

'কোনো চিন্তা নেই, বলুন। এখনও লাঞ্চ টাইম শেষ হয় নি।' মাথা তুলে লেখকের মুখের দিকে তাকাতে ভারি একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতি। মুখ থেকে হাসি না বেরিয়ে আসে সেজন্য ভয়ও আছে। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। এত এত গল্প রচনা করেন এই প্রতিভাশালী ব্যক্তি! মনে হয় যেন একটি নির্বোধ ব্যক্তি বসে আছে। ব্যাপারটা যে ওঁর নিজের চেষ্টা ফলে হয় নি তা স্পষ্টই বোঝা গেল। ওঁর নয়, ওঁর মায়ের আগ্রহ। স্বজাতির মধ্যে এমন একটি মেয়ে এখনও বিয়ে-থা না ক'রে আছে! বরও খুঁজে এনেছেন বলে মনে হল।

'আসুন স্যার আসুন।'

লেখক মহাশয় বলেই চলেছেন— এই আগন্তুক ভদ্রলোক তাঁর 'কাসিন্' নাম রামস্বামী। ওঁর চেয়ে দু বছরের ছোট। তাহলে চল্লিশের মতো হবে? বিপত্নীক। দু বছর হল স্ত্রী মারা গেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আর বিবাহের দরকার নেই বলেছিল। ছেলেমেয়ে নাকি নেই। থাকে নাকি বেংগলুরে। এইচ. এম. টি. কোম্পানীর নাকি বড় অফিসার। খুব আইডিয়ালিস্ট। প্রথম বিবাহে বর-দক্ষিণা ইত্যাদি কিছুই নেয় নি। এই তো গেল মাসে এখানে এসেছে। লেখকের মা-ই নাকি আম'র বিষয়ে অনেক গল্প করেছেন, সেই সব শুনে লেখকের মন নাকি আনচান করছিল। ভাবছিল 'রামস্বামী এর বিবাহ দেওয়ার জন্য মায়ের মন কেন এত আঁকুপাকু করছে।' তারপরে মনে হল— না, এতে কোনো দোষ

নেই। কাজটা তো ভালোই, যাকে বলে শুভ কার্য। দেখা যাক জিজ্ঞেস ক'রে। দৈবযোগ থাকলে হবে— এই ভেবে নাকি এসেছেন।

দৈবযোগ? অদৃষ্ট? কার? ওঁর কাসিন্ ভদ্রলোকের, না আমার? কোনো উত্তর না দিয়ে ধৈর্য সহকারে শুনে যাচ্ছি। বিবাহের বিষয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হতেই লেখকের মনে যেন এই চিন্তার উদয় হল— আমার এখন লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে থাকা উচিত কি না। তিনি বললেন: 'আপনি তো আর ছোট শিশু নন। বর্তমান যুগের মেয়েরা পড়াশুনো, চাকরী বাকরী ইত্যাদির পরে বিয়ের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবার অবকাশই পায় না, আপনারও তো সেই অবস্থা।' এইভাবে কত কী বলতে আরম্ভ করলেন। আমি বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম। এই বিবাহ ব্যাপার এবং তদ্‌বিষয়ক কথাবার্তা আমার পক্ষে লজ্জাকর হলেও এই সমস্ত সামলানো যায় কী ক'রে? এ সব কি আমাকেই সামলাতে হবে নাকি? অথবা কোনো কথা না বলে চুপচাপ মায়ের ওপর সব দায়িত্বের কথা বলে ছেড়ে দিই? মা-ই বা কী করবে? মা হয়তো বলে বসবে— 'আমার মেয়ে তো নষ্ট হয়ে গেছে। ওর আর বিয়ে-টিয়ের দরকার নেই।' অথবা সকলের মতো একথাও বলতে পারে —'যা জিজ্ঞেস করতে হয় মেয়েকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি কে?' তখন আমিও সকলের মতো আঁচলটাকে আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলব 'দেখুন, আমার এখন বিবাহে ইচ্ছা নেই।' বেশ মজার ব্যাপার হবে।

অথবা গঙ্গার মামার কথামতো বলতে পারে যে গঙ্গার বিবাহ করার কোনো যোগ্যতাই নেই এবং মামার সিদ্ধান্ত মতো গঙ্গারই একথা সেকথা বলে বিবাহ পরিহার করা উচিত। যাই হোক না দেখি।

লেখক মহাশয় বললেন— 'আপনার দাদার বাড়ীর ঠিকানাটা চাই।' 'ও! সে আর এমন কী? এক্ষুনি দিচ্ছি' বলে একখানা কাগজে ঠিকানাটা লিখে ফেললাম। সেই কাগজখানি তাঁর হাতে দেবার সময়ে বললাম— 'স্যার! আপনি আমার দাদার ঠিকানা চেয়েছিলেন। দিয়েছিলাম। ওদের ঠিকানা দিয়েছি, কাজেই ফাইনাল ডিসিশান করার কর্তা আমিই আগে থেকেই সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছি একথা যেন মনে না করেন। এ বিষয়ে আমার অনেক ভাববার আছে।' মেয়েরা স্বভাবত যে রকম বলে, আমি সেই রকম বলে দিলাম।

তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। আমার নীরবতা, পেন্‌সিল কাটা, ঠিকানা দেওয়া, এই হাসি— সমস্ত কিছু লেখক মহাশয়কে বিভ্রান্ত করেছে বলে আমার মনে হল।

'অতঃপর আপনার সঙ্গে আর কথার প্রয়োজন নেই। যা-কিছু বলবার সব আপনার মায়ের কাছেই বলব। সন্ধ্যাবেলায় আপনি সেখানে থাকবেন তো? আপনার দাদাও সেই সময়ে অফিস থেকে ফিরবে। তাঁর সঙ্গেই কথা বলা যাবে। তার ঠিকানাটা নিতেই এসেছিলাম। আমি বাড়ী গিয়ে মাকে নিয়ে যাব। হাফ্-ডে

ছুটি নিতে হবে।' এইভাবে খুব উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিবাহের আধাআধি কাজ শেষ হয়েছে এমন ভাবে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

র. কু. ব. চলে যাওয়ার পরে আমি প্রভাকরকে ফোন ক'রে বললাম—'সন্ধ্যাবেলায় আমি সোজা বাড়ী চলে যাব। আপনার এখানে আসার দরকার নেই। তবে আপনি আজ আমাদের বাড়ীতে অবশ্যই আসবেন। আসবেন কিন্তু। একটা ইন্টারেস্টিং খবর আছে।' আমিও একটা সাসপেন্স সৃষ্টি করলাম।

'মঞ্জুর বিষয়ে কোনো কিছু?'

'না না, খবরটা আমারই বিষয়ে।' উনি বোধহয় কিছুই বুঝলেন না।

'চাকরীতে পদোন্নতি হয়েছে নাকি?'

না, না। আন্দাজ করবার চেষ্টা করবেন না। করলেও সফল হবেন না। সময়মতো আসুন। বলব। এ রকম একটা খবর শোনার মতো আনন্দটুকুও অন্তত পাওয়া যাক, কি বলেন?' এই বলে হাসলাম।

'আচ্ছা, আচ্ছা, মুখোমুখি বসে জানালেই হল। আর কী খবর?'

'নাথিং।'

'খুব ব্যস্ত?'

'উহুঁ...আপনি?'

'এই একখানা চিঠির ওপর টিকেট লাগাচ্ছিলাম'

'ডিস্টারব করলাম নাকি?'

'উহুঁ...চিঠিটা বন্ধ করা হয়ে গেছে।'

'ইচ্ছে হয় কি জানেন? আপনার অফিসে বসে আপনি খুব ব্যস্ত হয়ে কাজ করছেন, তখন আপনাকে দেখতে চাই। আমি এখান থেকেই কল্পনা ক'রে দেখছি। তবু সামনাসামনি তো দেখিনি। একদিন আমি আপনার অফিসে আসব।'

'ও। তুমি এখানে একদিনও আসো নি, না? এটা কেমন হল? আমার তো মনেই হয় নি। আচ্ছা, আজই কেন এসে যাও-না? এখন ফ্রী আছ? তাহলে গাড়ী পাঠিয়ে দিই।'

'আজ নয়। আর একদিন। আপনাকে না ব'লে ক'য়ে হঠাৎ গিয়ে সামনে হাজির হবো দেখবেন।

'ও। ইয়েস'। 'ও. কে.' বলে কথা শেষ করলাম।

উনিও বললেন, 'ও. কে.।'

রিসিভার কিন্তু কেউ রাখলাম না— না উনি, না আমি। উনি আগে রাখবেন বলে আমি অপেক্ষা ক'রে আছি। আবার উনি হয়তো ভাবছেন, আমি রাখলে উনি রাখবেন।

আমি বললাম— 'কই, রিসিভারটা রাখুন।'

'না, তুমিই কল্ করেছ। কাট করতে হবে তোমাকেই।'

পুনরায় শুরু করলাম— 'কোন্ পোশাক পরে আছেন ?

'ড্রেস ?...দাঁড়াও, দেখে বলছি, কারণ তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলে গেছি... 'হ্যাঁ গ্রে রঙের ডেক্রান স্যুট ক্রীম কালার টেরিকট শার্ট...গ্রে ও লাল রঙ মেশানো টাই...ব্ল্যাক্ শু...' এইভাবে খুব সিনসিয়ার ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন।

'আপনি এই ড্রেস পরেই আসবেন... আমি আপনার জন্য লুঙ্গি কিনে রেখেছি।'

'কবে কিনলে ? কোথেকে কিনলে ?' শিশুর মতো উৎফুল্ল হয়ে প্রশ্ন করলেন। আমি কথাটা এড়িয়ে গেলাম— 'এই কোনো জায়গা থেকে কোনো একদিন।'

'এখন বুঝতে পেরেছি তোমার সাস্পেন্স। আমার জন্য কিছু প্রেজেন্টেশন্ কিনে রেখেছো, না ? অ্যাম্ আই রাইট্ ?'

'মোটেই না। বলেছি তো আন্দাজ করবেন না।'

'আচ্ছা আচ্ছা। এখন ক'টা ? আড়াইটে। তার মানে, আরও তিন ঘণ্টা পর জানা যাবে ?'

'ও. কে.' শেষ পর্যন্ত আমিই রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

সন্ধ্যাবেলা। এখন গণেশের বাড়ীতে কী কী সব আলোচনা হচ্ছে কল্পনা করতে করতে একটা ট্যাক্সিতে উঠে দোকানে গিয়ে ওঁর জন্য তিনটে লুঙ্গি কিনে আনলাম। বেশ ভালো লুঙ্গি। আচ্ছা লুঙ্গি বাইরে পরে না কেন। মুসলমানদের মতো দেখায়। তাই কি ? যাকগে। বেশ ঝলমলে লুঙ্গি। ওঁর পছন্দ হবে কি ? আমি যাই করি না-কেন, ওঁর খুব পছন্দ হয়। এখন ছটা বাজে। এখনও তো উনি এলেন না।

রাতে কী খাওয়া যায় ? আমার প্রতিটি বেলার ভোজনের ভার যেন নিজেই বহন করে চলেছি। ওঁর কাছে বলে একজন রাঁধুনীর ব্যবস্থা করা দরকার। খুব একঘেয়ে লাগছে। খিদে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি খাওয়া যায় ? খিদে লাগলে পরে উনোন ধরাবার কথা মনে হয়।... আচ্ছা উনি যখন খাবেন তখন নন-ভেজিটেরিয়ান খাবার কোথায় পাওয়া যাবে। ছি ! এসব কী ! খাওয়া নিয়ে এত-সব চিন্তা ? এখনও উনি এলেন না। ইতিমধ্যে নৈশভোজনের কিছু একটা ব্যবস্থা করে রাখি। সুজি আছে...কিছু সবজি আছে। উপ্‌মা তৈরী করলে কেমন হয় ? যথেষ্ট ! কিছু হালুয়া করলেও ভালো হবে। হালুয়া তৈরী করাটা খুব সোজা।

উনোন ধরেছে। ঘিয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে উনি এসে পড়েছেন। গাড়ীর শব্দ শুনে হাতা-হাতে নিয়েই উঁকি মেরে দেখলাম। যেমন বলেছিলেন সেই ড্রেসেই এসেছেন। হাতে ওঁর 'মিনিবার'।

একটু বসুন। আসছি আমি। আপনার আমার আগেই যাতে শেষ হয়ে যায় সেই ভেবে রান্না আরম্ভ করে দিয়েছি।' উনোনের জিনিসটা নাড়তে নাড়তে রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে বললাম।

'কিছুমাত্র তাড়া নেই আমার। টেক ইওর ওন টাইম, ধীরেসুস্থে করো।' এই বলে উনি পেপার খুললেন।

সমস্ত কাজ শেষ ক'রে এসে ওঁকে ভালো করে দেখলাম। ঠিক, বাড়ীতে গিয়ে স্নান ক'রে আবার সেই ড্রেস পরেই এসেছেন। দাড়ি 'ট্রিম' করেছেন বলে দেখতে ভালোই লাগছে। লুঙ্গি নিয়ে এসে ওঁর হাতে দিলাম। দেখে বলতে লাগলেন— 'ভেরি গুড, ভেরি গুড।'

'একটু সুইট খাবেন? ঘরে তৈরী করেছি। কেমন হয়েছে কে জানে?' এই বলে ছোট্ট একটি প্লেটে মিষ্টি ও চামচ রেখে এগিয়ে দিলাম।

'তোমার জন্য কোথায়?'

'আপনি খেয়ে কেমন হয়েছে বলুন। তারপরে আমি খাব।' স্পুন দিয়ে তুলে একটুখানি খেয়ে বললেন— 'বেশ, বেশ···রিয়েলি গুড।'

'আচ্ছা, মিষ্টি তো খাওয়ালে। এখন বল সুখবরটা কী?

আই আইয়ো! আমি কি সেই সুখবরের জন্য মিষ্টি খাইয়েছি নাকি? আমি তক্ষুনি তাঁর মনোভাব অস্বীকার ক'রে বললাম— 'মিষ্টি দেওয়া আর সুখবরের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই।'

'আমি একটা সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে দিলুম।'

'আজকে লাঞ্চ আওয়ারে র. কু. ব. আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। প্রথমে ফোন ক'রে বলে যে সাক্ষাতে কথাবার্তা হবে। মায়ের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলতে চায়। বললাম 'মা এখানে নেই।' গণেশের ঠিকানা চাইল। তারপর ব্যাপারটা আমার কাছেও বলল। এর পরেই মজা।' এই বলে ভিতরে গিয়ে গেলাসে ক'রে জল নিয়ে এসে ওঁর কাছে রাখলাম।

গলাটা একটু বদলে নিয়ে বিদ্রূপ করার ভঙ্গীতে বললাম— 'র. কু. ব. মহাশয়ের কে একজন নাকি 'কাসিন্' আছে—বিপত্নীক। খুব নাকি আইডিয়ালিস্ট। লেখকের মা নাকি আমার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা বলেছেন। এই মজাটা দেখবার জন্য ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরা এতক্ষণে গিয়ে সেখানে পৌঁছেছে। কালকে মজাটা আরও ভালো জমবে।'

উনি বেশ গম্ভীরভাবে বললেন— 'এর মধ্যে মজার ব্যাপার কী আছে?' শুনে আমার হাসি একদম বন্ধ হয়ে গেল। কী যে এই প্রশ্নের উত্তর দেব জানি না। আবার উনি বললেন— 'এর মধ্যে হাসবার কী আছে?' এই প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেওয়া যায় তাই ভাবছি। উনি এই প্রশ্নটা করেছেন বলেই আমার চিন্তা করে উত্তর দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে।

আমার দিকে না তাকিয়ে উনি চামচ দিয়ে প্লেটের খাদ্য তুলে খেতে খেতে কী গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন : 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, সুখবর বটে।'

আমি উপেক্ষার ভঙ্গীতে ঠোঁট ওল্টালাম। কিন্তু আমি যে ব্যাপারটাকে এত উদাসীনভাবে সরিয়ে দিলাম তা ওঁর ভালো লাগল মনে হয় না।

'গঙ্গা। আমি মনে করি এটি একটি সুসংবাদ।' ওঁর কথার মাঝখানেই আমি বলে উঠলাম— 'আপনি করতে পারেন, আমি করি না।'

উনি ইংরেজীতেই বলতে লাগলেন : 'ব্যস্ত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত কোরো না লেখক র. কু. ব.-র সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। সেই সম্পর্কবিহীন লোকটির ভূমিকা তোমার জীবনে খুব রিমার্কেব্‌ল্।'

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উনি কথাই বলেন না। কথা বলা বা চিন্তা করা কিছুই করবেন না এই বিশ্বাসে থেকে এখন এইভাবে এসে ফাঁদে পড়ে গেলাম। এই ব্যাপারে উনি যে উৎসাহ ও দৃঢ়তা দেখাচ্ছেন তা বিবেচনা করলে আমার কেবল এই ভয়ই হতে থাকে যে আমি একে কীভাবে অস্বীকার করে কথা বলব। কিন্তু একথা ঠিক যে আমি অস্বীকৃতিই জানাব :

আমরা দুজনেই মৌন হয়ে আছি— কে জানে কিসের জন্য আমরা যেন তৈরী হবার জন্য শক্তি সংগ্রহ করছি। আমার মনে হল আর কোনো কথাবার্তা না বলে এই ব্যাপারটাকে এখানে ছেড়ে দিলেই কেমন হয়। কিন্তু উনি ছাড়বেন না বলে মনে হচ্ছে। আমি ওকে যেন একটু বশে আনার জন্য বললাম 'আপনি যে এ নিয়ে ভেবেছেন সেই তো যথেষ্ট। এসব আপনার হাতেও নেই, আমার হাতেও নেই। ওরা সম্বন্ধ স্থির করতে এসেছে ও-বাড়ীতে। গণেশ, আমার বৌদি কেন সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার গল্প তাদের কাছে বলবে না। জিজ্ঞেস করবে এর মধ্যে মজাটা কোথায় ? তা তারা জানে। আমার সম্বন্ধ দেখতে এসে 'তামাশা' বুঝতে পেরে— এখন তারা সকলেই হাসতে থাকবে।' আমি এইভাবে বলে যাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি আমার কথাগুলি ওঁর কাছে খুব কটু কথা বলে মনে হচ্ছে।

'না না, ..সেরকম কিছু হবে না, হতে পারে না। শেষকালে তোমার কাছে এলে পরে তুমি কেবল সম্মতি দিলেই এটা নিশ্চয়ই হবে।'

'বেশ, সব শেষ হয়ে তবে আমার কাছে আসবে। আসুক। তখন দেখা যাবে।' এই বলে এই ব্যাপারটাকে এখানেই শেষ ক'রে দিলাম। কিন্তু আমি জানি এটা আমার কাছে আসবে না। আর যদি আসেও আমি তাতে সম্মত হব না।

82

কী ঘটেছে না ঘটেছে আমি তার কিছুই জানি না। র. কু. ব. মহাশয় যে আমাদের অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে তা প্রায় চার-পাঁচ দিন হবে। সে তার মাকে সঙ্গে নিয়ে গণেশের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করেছে কি না তাও আমি জানি না। সে বলেছিল যে সেদিন সন্ধ্যাকালেই যাবে। তারা নিশ্চয়ই গিয়ে থাকবে। তারপরে কী ঘটেছে আমার জানা নেই। মা খুব সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে। গণেশ নিশ্চয়ই মাকে খুব ধমক-টমক দিয়েছে, বৌদি খুব হাসাহাসি করেছে। ওরা কী স্থির করল আর এরাই বা কী বলল?

গণেশ বলে থাকবে— 'আমরা দেখেশুনে সম্বন্ধ স্থির ক'রে দিলে গঙ্গা কি শুনবে? সে কোনোদিন আমাদের কথা শোনার মতো মেয়ে নয়। ওর বিয়ে হবে না। সেও করবে না। আপনারা ভুল বুঝবেন না। কেন বৃথা চেষ্টা করছেন? সব কথা কি আমরা আমাদের মুখে বলতে পারি? ও মেয়ের বিয়ে হবে না স্যার। আপনারা সৎ লোক, ভদ্র লোক, অন্য চেষ্টা করুন। আমি শুধু বলতে জানি। আপনি তো কতবড় রাইটার— বিশ্বজোড়া খ্যাতি। এর বেশি আর কী বলব?'

ছি! এই সব বলতে পারে কি? তাও একজন আগন্তুকের কাছে। তবে গণেশ সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। সে যে-কোনো কথা যে-কোনো স্থানে বলতে পারে। আহা, মা বড় কান্নাকাটি করেছে বোধ হয়। তার ওপর হয়তো কিছু ফোড়ন কেটেছে বৌদি।

আমি কি ভুল করেছি নাকি? র. কু. ব. মহাশয়কে ওদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ে? কেন আমি এভাবে করতে গেলাম? অন্য লোককে, বিশেষ ক'রে ঐ জননী ভদ্রমহিলাকে এইভাবে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেলে আমার কি কোনো আনন্দ হয়েছে নাকি? ভেবেছিলাম পরদিন কোনো খবর পাব। কোনো খবর পেলাম না। কী ঘটেছে জানবার জন্য মনটা ভারি কৌতূহলে নড়ে উঠেছে। আচ্ছা কাউকে ওখানে পাঠিয়ে দেব নাকি? কাকে পাঠাব? কে কি জানতে যাবে? সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওদিকে যাব বলে স্থির করেছিলাম। গেলে ভালোই হত?

'কা হয়েছে না হয়েছে তাতে আমার কী?' এই ভাব নিয়ে আমি চুপচাপ বসে থাকলেও উনি আমাকে ছাড়বেন না। সেদিন থেকে রোজ উনি জিগ্যেস করছেন এই বিষয়ে। বিষয়টা নিয়ে উনি খুব সীরিয়াস ভাবে ভাবছেন। ব্যাপারটা আমিই তাকে প্রথম বলেছিলাম। তখন কীভাবে সমস্ত ব্যাপারটার একটা ফয়সালা হতে পারে সেইটা জেনে ওঁর কাছে বলতে হবে।

যদি আমার কথা বলো. আমার ফয়সালা ইতিপূর্বেই হয়ে গেছে। কাজেই আবার সেই খবরটাকে আমার কানে পৌঁছতে দিই নি। র. কু. ব.-কে একবার ফোন করে দেখব নাকি ? ছি ! কী উদ্দেশ্যে ফোন করব ? আমি যদি ফোন করি তবে তার অর্থ হবে অন্য রকম। সে নিশ্চয়ই ভাববে যে এই ব্যাপারে আমি বুঝি খুব ইন্টারেস্টেড্। বার বার ভেবে দেখতে গেলে আমার একটা কথা মনে হয়। এই সব আজেবাজে কথা আমার মূল্য দিয়ে কেনা উচিত হয় নি। আমার প্রথম ভুল— গণেশের ঠিকানা দেওয়া। দ্বিতীয় ভুল— ওঁর কাছে সেই ব্যাপারটা প্রকাশ করা। তৃতীয় ভুল হল— কিছুরই দরকার নেই, তার পরে আমি কিছুই করব না এই কথা ভাবছি। ওঁর যা বলার সব শুনেছি। আমার মনে হয় উনি আমায় যত উপদেশ দিয়েছেন. মঞ্জুকেও তত উপদেশ দেবেন না। বিয়ের পরে মেয়ে যখন শ্বশুর বাড়ী যায় তখন তার মাও বোধ করি এত উপদেশ দেয় না।

বিবাহের পরে উনি মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসবেন নাকি ? আমিও আর ওঁকে দেখতে পারব না, ফোন করতে পারব না ! তবে সেই যে আমার তিনি, মানে আমার ভাবী পতি দেবতা. তাঁর যদি ওঁকে (মানে প্রভাকরকে) ভালো লেগে যায়, তবে বন্ধুভাবে আমরা দুই বরবধূ যখন খুশী গিয়ে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি. উনিও এসে দেখা করতে পারেন। ওঁর ধারণা যে সেই সম্ভাব্য ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন সজ্জন হবেন। কিন্তু 'কেন ওঁর সেরকম একটা ধারণা হল' তা আমি জিজ্ঞাসা করি নি. আমি একথাও জানতে চাই নি সজ্জন কথাটার অর্থ কী। ওঁর উদ্‌ভট কল্পনা এবং অসংলগ্ন কথা শুনতে বেশ মজা লাগে। সেই যে আমার ভাবী স্বামীটি তাঁর কানে যদি আমার অতীতের বৃত্তান্ত গিয়ে পৌঁছয়, যদি সে বিষয়ে তিনি কিছু প্রশ্ন করেন. যদি আমার মনে হয় তিনি ওভাবে জিজ্ঞেস ক'রে জানতে অভিলাষী. তবে আমি কিছুই না লুকিয়ে সমস্ত কাহিনী নাকি তাঁকে শোনাব। সেইটেই নাকি কর্তব্য। কিন্তু যদি জানতে চান কে সেই প্রণয়ীটি তাহলে তা বলা যাবে না। সেকথা বলে দিলে পরে প্রভাকর আর আমাকে দেখতে আসতে পারবেন না। আমাদের পারিবারিক জীবন খুব সমৃদ্ধিমান হয়ে উঠবে। আমার স্বামী নাকি তাঁর পুণ্যের জোরে আমার মতো স্ত্রী পেয়েছেন।...

এইভাবে দিনের পর দিন আমার বিবাহের আয়োজন করে উনি খুব আনন্দ লাভ করছেন।

মর্নিং ওয়াক শেষ করে ফিরলাম। আজ রবিবার বলে আসার পথে কফি খেয়েটেয়ে আসতে কিছু দেরীই হয়ে গেল। নটা বাজতে চলেছে। গাড়ী থেকে নামবার সময়ে দেখলাম হাতে একটা পুঁটুলী নিয়ে সদর দরজায় মা বসে আছে। আমাকে দেখেই মা আনন্দের হাসি হাসল। অনেক দিন পরে আজ মাকে দেখলাম। মনটা খুশীই হল। কিন্তু প্রভাকর আমার মাকে দেখা মাত্রই ভয় পেয়ে বলল— 'আচ্ছা আমি আসি' এই বলে গাড়ী নিয়ে চলে গেলেন। মা কিন্তু এমন

ভাব দেখাল যে সে গাড়ী ও গাড়ীর মালিক প্রভাকরকে দেখে নি। 'আয় আয়' বলে আমাকেই মাত্র ডাকল।

'অনেকক্ষণ হল এসেছ নাকি?'

'এই কিছুক্ষণ আগে এলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা ভয় এসে গেল। আজ তো রবিবার— তুই যদি কোথাও বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিস! এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে কী করা যায় বলে বসে পড়লাম।'

আমি দরজা খুললাম। ভিতরে এসে মা বলল : 'তুই যখনই আসিস-না কেন, তোর আসা পর্যন্ত আমি বসে থাকব বলে মনস্থ করেছিলাম। ফিরে গেলে তো তোর বৌদি হাসবে, বাড়ীতে তালা দেখে আমি ফিরে এসেছি— ভাববে না একথা। সে ভেবে বসবে না যে তুই তাড়িয়ে দিয়েছিস বলেই ফিরে গেলাম?'

বারান্দার দড়িতে লুঙ্গি ঝুলছে। ভাগ্যিস, মা সেদিকে দৃষ্টি দেবার আগেই আমি লুঙ্গিটাকে গোল ক'রে পাকিয়ে ফেললাম। মা আর কী জানে? হয়তো শাড়ী-টাড়ী ভাববে।

বড় ঘরে আর একটি বস্তু রয়ে গেছে, সেটি হল 'মিনিবার'। কাল রাতে এটি উনি নিয়ে যান নি। বোতলের মদ ফুরিয়ে গেলে বোতল সব সময়েই নিয়ে যান, কেবল বাকী থাকলে এখানেই রেখে যান। আজ সন্ধ্যাবেলায় উনি কী করবেন? কী আর করবেন? এটা নেই বলে কি আর জুটবে না ওঁর। বাড়ীতে কত কেস মদ তাঁর ঠিক আছে? উনি মাকে দেখে গেছেন, কাজেই আজ সন্ধ্যাকালে উনি এখানে আসবেন না। হয়তো কাল সকালে বেড়াবার সময়ে এখানে আসবেন। তাও মা বাড়ীতে থাকায় বাইরে বসে হর্ন বাজাবেন।

মা যদি এই মদের কেস দেখে জিজ্ঞেস করে বসে 'এটা কী' সেই ভয়ে আমি ওটাকে নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে রেখে দিলাম।

এই বাড়ীতে বসে মদ খান, নন-ভেজিটেরিয়ান খান— এই সমস্ত কথা মনে পড়তে লজ্জায় জিব কেটে দিলাম।

মা বড় ঘরের থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পুঁটুলী খুলল, তাতে নানাবিধ লোহার কৌটো, বোতল, কাগজের ছোট টোট পুঁটুলী। তার মধ্যে আমসী এবং আরও কত কী শুকনো খাবার, আচার ইত্যাদি।

'আমি এখানেই থাকব। আমার মন চায় এখানেই থাকতে। প্রত্যেক দিন খেতে বসে ভাবি— তুই কী রান্না করিস, কী খাস। ভাবতেই পারি, মুখ খুলে কি বলতে পারি? তোর নাম বললে— আর তা যদি আমি বলি তবে তো সকলে আমায় বকাবকি করবে। অদৃষ্টের লিখন বলে মুখ বন্ধ করে থাকি। রাজস্বামী যখন টাকা দিতে আসে, সেই তখন একটু তার কাছে তোর কথা জিজ্ঞেস করি। আশি টাকা গণেশের হাতে দিই, কুড়ি টাকা হাতে রাখি। আমার

হাতে রেখে কী হবে? সেই সংসারের জন্যই খরচ করি। ছেলেমেয়েগুলিকে কিছু একটা কিনে দিই। রাস্তায় কোনো কিছু বিক্রী করতে এলে আমার ইচ্ছামতো কিনি-কাটি। তাই তো আমার ইচ্ছামতো নিয়ে আসতে পারি। এই সমস্ত সত্ত্বেও গণেশটার ঝগড়া লেগেই আছে।' এই সমস্ত কত কী কথা কেঁদে কেঁদে বলতে বলতে একবার বড় ঘরে একবার রান্না ঘরে হাঁটাহাঁটি ক'রে যে সমস্ত জিনিস নিয়ে এসেছে সেগুলিকে সাজিয়ে রাখছে।

আমি বড় ঘরে চুপচাপ বসে থেকে মায়ের সব সাজানো-গোছানো দেখছি।

'এই ছাখ এটা কী রকম হয়েছে' এই বলে চামচের মধ্যে কী একটা জিনিস এনে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি বললাম— 'কী?'

'হাত বাড়িয়ে ছাখ। কী আছে তুইই বল' এই বলে কী কী সব জিনিস হাতের তালুতে রাখল। কী অদ্ভুত পদার্থ! খেয়ে বললাম— 'বাদাম হালুয়া?'

'না রে না' এই বলে মা হাততালি দিয়ে হাসল। 'ভেবে ভেবে বল দেখি' এই বলে আর এক চামচ দিল। এতে আর ভাববার কী আছে?

'আমি তো কিছুই বুঝলাম না, যাও। তবে খেতে বেশ ভালো।' এই বলে হাত ধুয়ে এলাম। আমি যে মাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করি নি— এটা কী, ওটা কী. তাতে মায়ের মন বড় নিরাশ হয়ে পড়ল। চাইলে আরও চার চামচ দিয়ে বলত 'ভালো ক'রে ভেবে বল. ভালো ক'রে ভেবে বল,' আর আমি না পারলে মা হাততালি দিয়ে হাসত। আমি বোকার মতো গিয়ে হাত ধুয়ে আসতেই মা গোপন কথাটা ফাঁস ক'রে দিল— 'আলুর হালুয়া! খানিকটা বাদামের এফেক্ট মিশিয়ে দিয়েছি। কেউ ধরতে পারবে না। খেতে একেবারে বাদাম হালুয়ার মতো। তফাৎ কী? এইজন্য কেন এত বাদাম কিনে ভাঙো রে, তারপরে তার বীজগুলোকে জলের মধ্যে না হয় দুধের মধ্যে রাখো রে…' এইভাবে মা কত কথা সবিস্তারে বলতে আরম্ভ করল। আমি আমার ঘরে চলে গেলাম।

আমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মা জিজ্ঞেস করল—'একটু কফি তৈরী করে দেব?' আমার এখন কফির দরকার নেই, বোধ করি মায়ের দরকার আছে। একটু ভেবে বললাম— 'ঠিক আছে, করো।'

রান্নাঘরে গিয়ে কফি তৈরী করতে করতে নিজের মনে কথা বলতে লাগল। মা যেভাবে যে জিনিস রেখে গিয়েছিল, কিছুই আর তেমনটি নেই। সমস্ত বাসন-পত্র কালো নোংরা হয়ে গেছে, সমস্ত ঘরদোর সপ্তাহে একবার ক'রে ধোয়াতে হবে। নইলে পায়ে এত ধুলো লাগে! মা আবার স্নেহ প্রকাশ করে বলতে লাগল— 'আহা! গঙ্গা কি করবে? এতদিন পর্যন্ত হোটেলে না খেয়ে ঘরে রান্না করে খেয়ে থাকবে মনে হচ্ছে।' কফি এনে রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল— 'কী রান্না করব!'

কফি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম— 'তোমার কফি?'

'আছে, আছে' বলতে বলতে মা রান্নাঘরের মধ্যে চলে গেল।

অনেকদিন যেন ভাত খাওয়া হয় নি আমার। মা এখন ঘরে ফিরে এসেছে বলে মনের মধ্যে ভারি একটা স্বস্তি পেলাম। কিন্তু একটি জিনিস বুঝতে পারলাম না। এতদিন পরে ও-ব্যাপারের খবর কী? মনে হয় মা কখন বলবে সেই সুযোগের অপেক্ষা করছে।

এদিকে আমি স্নানের জন্য বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

আমার বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা চলার সময়ে মা ও গণেশের মধ্যে যে ঝগড়া লড়াই হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বিয়ের প্রপোজালটা সমর্থন করল কে এখন সেই কথাটাই ভেবে দেখছি।

মা আর যাই করুক, বিরোধিতা করবে না। মনে হয় গণেশই মাঝখানে পড়ে ঝামেলা সৃষ্টি করেছে। বৌদিও বলে থাকবে। সেইজন্যই মা চলে এসেছে। নইলে কি মা এই কথাই বলতে এসেছে যে আলুর কালুয়া কীভাবে তৈরী হয়?

মা এসেই কত স্বাভাবিকভাবে রান্নাঘরের চার্জ নিয়ে নিয়েছে। প্রথমে ঐ জায়গাটা ধুয়ে ফেলতে হবে।...

আমি বাথরুম থেকে বাইরে এলাম। এসে দেখি মা ঝুপঝাপ ক'রে জল ঢেলে ধুয়ে ফেলেছে জায়গাটা। আহা! এইভাবে হাত ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে ম কি ওখানে কাজ করতে পেরেছে? প্রথমত ওখানে জল ঢাললে বিপরীত দিকের অন্য ভাড়াটের ঘরে চলে যায়। তাছাড়া, ওখানে ঢালাঢালির জন্য এত জলই বা কোথায় পাবে মা? এতদিন ধ'রে মা এখানে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল!

আজই মাত্র আমি একটু শান্তিমতো স্নান ক'রে জামাকাপড় পরে খাটের ওপর ভেজা চুল মেলে দিয়ে সটান শুয়ে পড়ে অনেক দিন পরে বই পড়লাম। নইলে এতদিন একচোখ রান্নাঘরে একচোখ বই-এ রেখে ঘরে ও রান্নাঘরে ছুটোছুটি করে রান্না করতাম।

রান্নার গন্ধ আসছে। আমি রান্না করলে এত সুন্দর গন্ধ আসে না। অন্য কেউ রান্না করলেই বুঝি গন্ধ পাওয়া যায়।

ভেজাহাত মুছতে মুছতে মা বড় ঘরে এল। এসে সোফার ওপর বসল ভিতরে তাকিয়ে দেখল আমি বই পড়ছি।

'তুই যে বলতি র. কু. ব., র. কু. ব.— সেই ভদ্রলোক এসেছিল। তুইও নাকি তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলি! গণেশের ঠিকানাও নাকি তুই দিয়েছিস. তাই তো বলল ওরা। তারপরে কী হয়েছে তা না'কি তু জানিস নে। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর মাও এসেছিল। খুব ভালো লোক তারা...' আমি বইখানা বন্ধ ক'রে উঠে বসলাম।

'বেহুদাদা ঠিক বলে নি... বলেছে কি না লোকটা বাজে. অসভ্য... না. না. কত ভালো লোক জানিস কি? সেই এইসব গল্প টল্প লিখেছে শুনে কত লোক

এসে ভীড় করেছিল গণেশের বাড়ীতে ! ভদ্রলোক ও তার মা হয়তো ভেবে থাকবে বৌদি-ননদের ঝগড়ার ফলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন থাকি। তারা যে গণেশের ওখানে এসেছিল তুই শুনিস নি ?' এই পর্যন্ত বলে, এর পরেও সেই সম্বন্ধের কথাটা বলা সংগত কি না আমার মুখ দেখে সেইটে আঁচ করার উদ্দেশ্যে মা আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি হাসলাম।

83

যেমন যেমন ভেবেছি ঠিক সেইটেই ঘটনা ঘটেছে। তবে গণেশ ও মায়ের ঝগড়াটা শুরু হয়েছিল অতিথিরা চলে যাওয়ার পরে। 'আচ্ছা আমরা ভেবে বলব, তাছ'ড়া মেয়েকেও একবার জিগ্যেস করতে হবে' এই সব কত কী বলে তাদের বিদায় দেওয়া হয়েছে।

ওরা চলে যাওয়ার পরে গণেশ নাকি আমার বিষয়ে নানা কুৎসিত কথা বলেছে। একজন লোককে বিয়ে ক'রে গৃহস্থ জীবন যাপনের যোগ্যতা ওর আছে নাকি ? ওরা না-হয় গঙ্গার পুরোনো দিনের কথা না জেনে সম্বন্ধ করবার জন্য এসেছে. তাই বলে মা তোমার এত আনন্দ কিসের ?— এইসব কথা গণেশটা বলেছে। আরও কত কী বলেছে মা এখন সে সব কথা বলতে পারছে না। গণেশের সামনে মা আর মুখ খুলে দ্বিতীয় কথাটি বলতে পারে নি। আমাকে এই সব কথা শোনাতে শোনাতে চোখে তার জল এসে গেল। আমার দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে থেকে বলল : 'শোন্ মা, আমি যা বলছি শোন্। এই একটা বিষয়ে আমার কথাটা শোন্। এই যে মড়াটা গাড়ী নিয়ে আসে যায়, ওর সঙ্গ ছাড়্। দুনিয়া সুদ্ধু সকলেই বলে, লোকটা খুব শয়তান। তোর আমার এমন কলঙ্ক ? এই রকম একটা তোর— সম্বন্ধ করবার জন্য আসবে বলে অপেক্ষা ক'রে ছিল। ঐ যে গল্প-লেখক মানুষটি বয়স কম হলে হবে কি, খুব বড় মানুষ। এসে একটা কথা যে বলল, মনে হল কি জানিস ? যেন আমি যা যা মনে ভেবে রেখেছি সেইগুলোরই উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। আর ঐ যে বেংগলূরের ছেলেটি খুবই ভালো। এই যে দেখি আমাদের এখানকার ছোঁড়াগুলি, এক-একটা যেন শয়তান, ধরাকে সরা জ্ঞান করে, সে রকম নয় ' এই বলে আমার কাছে এগিয়ে এসে গলা খাটো ক'রে আমার মনটা যাতে একটু গলে এই রকম অন্তরঙ্গ-ভঙ্গীতে বলল :

'ছেলেটির স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সকলেই তাকে একটি কুমারী মেয়ে বিয়ে করবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। কিন্তু নতুন বউ যে আসবে সে কি ভাববে না যে এই লোকটি অন্য স্ত্রীলোকের সহবাস করেছে ? কাজেই বিয়ে যদি করতে হয়,

তবে অল্প বয়সে যারা বিধবা হয়েছে এমন অনেক মেয়ের মধ্যে একজনকেই বিয়ে করতে হবে— এই কথা নাকি বলেছে সেই রামরত্নম্ ছেলেটি। এখন ঐ যে লেখক ভদ্রলোক, সে এই সব গল্প ক'রে বলল কি জানো? রামরত্নম্ তো বিধবা বিবাহের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু সেরকম কোনো পছন্দমতো খুঁজে পাওয়া গেল না বলে ঐ লেখক বলল যে এখন কী করা যায়? কাজেই মা, আমি বলি কি তুই কোনো চিন্তা করিস নে। আমাকে জিগ্যেস করলে কিছুই গোপন না ক'রে— সমস্ত বলে এই ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলি। কাউকে ঠকাতে হবে না. খারাপ কোনো কাজও হবে না। আমি দু-তিন দিন ধ'রে ভেবেছি। এর চেয়ে ভালো আমার তো আর একটাও জানা নেই... হাসছিস কেন লা?'

মা জিজ্ঞেস করার পরেই বুঝতে পারলাম যে আমি হেসেছি। আচ্ছা. মায়ের যুক্তিতে কি না হেসে পারা যায়? আমি যে এতদিন বিয়ে করি নি তার কারণ কি এই যে কেউ আমাকে বিয়ে করতে চায় নি? মা যে সেই রকম কিছু একটা চিন্তা ক'রে থাকবে. তা বুঝতে পেরেই আমার হাসি এসে গেল। কত সহজে এরা বিয়ের বিষয়ে কথা বলে? আমিও কি সমস্ত ঘটনা ভুলে যেতে পারি? ঘটনা মানে কেবল সেই বারো বছর আগেকার গাড়ীর মধ্যে অনুষ্ঠিত ঘটনাই নয়। তারপরে এখন যে ইনি সকালে গাড়ীতে করে নামিয়ে দিয়ে গেলেন— এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল ঘটনাই ভুলে গিয়ে— যে-কোনো লোকের কাছে 'আমি তোমার আপনজন' এই রকম অধিকার ও আত্মীয়তা দেখিয়ে, সেই নতুন স্বামীর সেবা ক'রে, সেই অন্য পুরুষের সাহচর্যে বাস করা— একথা ভাবাও আমার পক্ষে ঘৃণাকর। কী ক'রে তা সম্ভব? তাই যদি সম্ভব হয় তবে গণেশ যে আমার সম্বন্ধে বলেছে আমি আর গার্হস্থ্য জীবনের উপযুক্ত মেয়ে নই তাই তো আমার পক্ষে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে তো বেঙ্গু মামাকেও আমার 'না' বলা উচিত হয় নি। বাসের মধ্যে যেতে যেতে কারও সঙ্গে যখন ধাক্কা লেগে যেত, তখনও ভয়ে ভয়ে আমার সরে যাওয়া উচিত হয় নি। বাসের কণ্ডাক্টার যখন টিকিট দেওয়ার সময়ে ইচ্ছে ক'রেই আঙুলটা ছুঁইয়ে দিত. তখনও তো আমার সংকুচিত হওয়ার কারণ ছিল না। যারা আমার মনের এই সব কথা জানে ও বোঝে. তারাই ঠিক ধরতে পারবে কেন আমি বিয়েতে সম্মতি দিতে পারি না। এই সমস্ত লোকের স্পর্শ যদি আমি সহ্য করতে না পারি. তাহলে আমার মন কী করে কেবল সেই বেংগলুরের ছেলেটিকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারে? আমি ব্যাপারটাকে খুব লজিক্যালভাবে বুঝেছি. এখন যদি এরা সেই বিষয়টা না বুঝতে পারে. তবে আমি হাসব না তো কী করব?

আমি মনে মনে একথা ভালো করেই জানি যে আমি যে-কোনো পুরুষকে সম্মতি সহকারে গ্রহণ করলেও সেই সম্বন্ধকে যতই মঙ্গলজনক নামে ভূষিত করা যাক-না কেন, তার পরে আমি ব্যভিচারের জন্য প্রস্তুত হতে থাকব। আমি কেন

ওভাবে চিন্তা করি? কারণ আমার ভিতরে ভিতরে কেমন একটা বোধ এই যে এই ঘটনাই হবে সেই ব্যভিচারের সূচনা। আমার এতে ভয় লাগে। নইলে যে প্রভাকরকে আমার মন সমস্ত দিক থেকে গ্রহণ করে নিয়েছে, তার কাছ থেকে আমি এভাবে আলাদা হয়ে থাকতাম না। এমন অন্য কোনো পুরুষ হতেই পারে না যে প্রভাকরের চেয়েও বেশি আকৃষ্ট করবে আমাকে। আমি খুব সাহস ক'রে এবং দৃঢ়ভাবে এই প্রথম বার আমার মনে মনে ভাবছি আমি প্রভাকরকে ভালোবাসি। আমি কোনো অবস্থাতেই ওঁকে ছাড়তে বা হারাতে সম্মত হব না। উনি যদি চান, ওঁর জন্য আমার যে-কোনো জিনিস দিতে প্রস্তুত। হ্যাঁ, আমার দেহটাও। কিন্তু উনি যদি চান যে আমি ওঁকে ছেড়ে, ওঁর থেকে আলাদা হয়ে থাকব, তাহলে ওঁর শত যুক্তি সত্ত্বেও তাতে আমি সম্মত হব না। কিন্তু সেই উনিও যে এটা বুঝতে পারেন না এই কথা ভেবেই আমি হাসি। এই সমস্ত কথা আমি কেমন ক'রে আমার মাকে বোঝাব? আমি তাকে বললাম— 'গণেশ বলছে বলুক··· আকাঙ্ক্ষা আমাদের বুদ্ধিকে ঢাকা দিতে পারে না। এই সমস্ত একটাও সম্ভবযোগ্য কাজ নয়। এই নিয়ে কথা বলে বলে কত কী উদ্ভট কল্পনা ক'রে কষ্ট পেয়ো না।'

আমার এই উত্তর শুনে মায়ের মনটা যে কী ছটপট করছে তা আমি বুঝতে পারছি। এর পরে যদি আর কিছু বলে তবে আমি রেগে যেতে পারি বলে মায়ের মনে আশঙ্কাও রয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলল— 'তুই যা বললি, তার পরে আর মুখ খুলে কী লাভ?' এই বলে ভিতরে চলে গেল।

আমি আগের মতোই পড়তে শুরু করলাম। রান্নাঘরে মা নিজে নিজেই কত কথা বলে বলে কাঁদছে। আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে পড়ে যাচ্ছি।

খেতে দেবার সময়ে পুনরায় আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করল: 'ভালো ক'রে ভেবে দ্যাখ। যারা দেখবার তারা তো দেখলেই নানা কথা বলবে। বিয়েটা হলে তুইও মানসম্মান নিয়ে থাকবি— সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তো এত কথা বলছি। তা না হলে কী?' এই বলে মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছল।

আমি নিঃশব্দে খেয়ে চলেছি। মনকে এই বলে দৃঢ় করলাম যে মাকে রাগিয়ে কোনো কথা বলব না। এ ব্যাপারে আমি রাগ করলে সেটা আমার দুর্বলতাই হবে। আমার মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা। কোনো-একটা সিদ্ধান্তে আমাকে আসতেই হবে বলে মনে মনে একটা ভয়ের অবস্থা থাকলেও ক্রোধও এসে যায়। তা না হলে কেন আমি মাকে রাগিয়ে কথা বলব? আমিই তো একটা তামাশা দেখব বলে র. কু. ব.-কে ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখন এই তামাশায় মজা না পেয়ে রাগ করলে চলবে কেন?

সন্ধ্যাবেলায় গণেশ এল। আমার কেবলই ভয় ও আমাকে কী-না-কী জিজ্ঞেস ক'রে ফেলে। ওর সঙ্গে আজ বহু বছর ধ'রে কথা বন্ধ। ও এসে

আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দিতে হবে বুঝতে না পেরে আমি একরকম শূন্যমনা হয়ে রইলাম। এসে বড় ঘরের মধ্যে বসেছে। মা বোধহয় কফি নিয়ে আসছে।

গণেশ মাকে জিজ্ঞেস করল— 'কী বলল তোমার মেয়ে?' মা কী জবাব দিল বুঝলাম না। কোনো ইঙ্গিত-টিঙ্গিত করেছে নাকি। আমার কাছে এসে যাতে পৌঁছয় এমনি উচ্চস্বরে গণেশ বলল :

'সবই কপালের লেখা! আমাদের বংশে যা কোনোদিন হয় নি তাও হল! তাই বুঝি জিদ ক'রে খারাপ হতে হবে, অ্যাঁ? নষ্ট হওয়ার সময় এলে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই নষ্ট হওয়ার পথে যাবে?...'

আমি তখন এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম যেন গণেশের এই সমস্ত কথার জবাব দিতে যাচ্ছি। আমি কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে গণেশই আমার ঘরের দরজার মুখে এসে দাঁড়াল। আমি বইগুলিকে সার ক'রে সাজাচ্ছিলাম। গণেশ যে এসে দাঁড়িয়েছে তা টের পেলাম। কিন্তু আমি কী জানি কেন ফিরে তাকাতে পারলাম না। একে যেন আমি কত না বছর আগে দেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে। এ কতবার এখানে এসেছে, ঝগড়া করেছে। কিন্তু একে দেখেছি সেই কবে? না দেখে থাকা এক, কিন্তু বিমুখ হয়ে থাকা ভিন্ন। আমি এই গণেশের প্রতি বিমুখ হয়ে আছি।

গণেশ গঙ্গাকে ডাক দিয়ে বলল— 'ইদিখ গঙ্গা'। এই হল ডাকার ভঙ্গী। 'ইদিখ' কথাটার মানে হল 'এই ছাখ'। কিন্তু ওর এই ডাকে আমি ফিরেও তাকালাম না। গণেশই কথা বলে চলেছে। মুখের মধ্যে যেন পানের খিলি ভরা। সব সময়েই পান খাচ্ছে। এত বেশি খাচ্ছে যে যখনই গণেশের মুখের দিকে তাকানো যায়, মুখটা ভিজে ভিজে লাগে। আমি এখনও ওর দিকে ফিরে তাকাই নি।

'তোর যাতে মঙ্গল হয় তারই চেষ্টা করছি। এখনও তোর ভালোর জন্য বলছি। যা হবার হয়ে গেছে। তুই যদি এমনি ধারায় একগুঁয়ে হয়ে থাকিস, তবে আর কী হবে দশজন লোক দেখে হাসবে। তুই কি শিশু নাকি? মায়ের কত আশা-ভরসা! তোর গুণ তো আমি জানি। আমার কি স্নেহ-মমতা নেই তোর জন্য? কাজেই আমাদের সকলকে তুই শ্রদ্ধাভক্তি করিস নে একথা জেনেও এসে বলছি। এই তোর লাস্ট চান্স! তুই যদি এখনও আমাদের কথা না শুনে চলিস, তাহলে মনে রাখবি এ জন্মের মতো তোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘুচে গেল। আমার কী? তোর যে গর্ভধারিণী মা সেও মৃত্যু পর্যন্ত কষ্টে অশান্তিতে ভাঙা ভাঙা হয়ে যাচ্ছে। ইদিখ...আমার কথা কি কানে যায়?...'

আমি ওর দিকে ফিরে তাকালাম। কিছুই বলার ইচ্ছা হল না। তাছাড়া ওর সঙ্গে কীভাবে যে কথা বলতে হবে তাও বুঝতে পারছিলাম না। মা বোধ

করি বড় ঘরের মধ্যে বসে আছে।

'নো...' আমি বলে ফেললাম। গলাটা আটকে আসছে। শিশুসুলভ একটা অদ্ভুত কল্পনা আমার মাথায় এলো— সেই আগেকার দিনের মতো গণেশ আমায় প্রহার করবে নাকি? তবু বলে ফেললাম— 'নো... তোমার কথা ভেবে দেখা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'তোর যে বিয়ে হবে একথা আমরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি নি। তবে কিনা মানুষের চিন্তার বাইরে কল্পনার বাইরে ঘটনা ঘটে না কি? এরকম একটা সুন্দর গার্হস্থ্য জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে তবে এই সুযোগ হেলায় হারাস নে।'... গণেশ খানিকটা কঠোর খানিকটা অধিকারের সুরে বলল।

আচ্ছা, এই ব্যাপারে গণেশের এত আগ্রহ কিসের? মায়ের না-হয় মেয়ের ওপর একটা স্নেহ-মমতা আছে। কিন্তু গণেশের কী? যতদূর জানি ও তো আমার সম্পর্কে নানা দিকে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ওকে কোনো প্রশ্ন করতে আমার সাহস নেই। আমি কেবল ভাবছি— ও কিসের জন্য এই ব্যাপারে এতদূর আগ্রহ দেখাচ্ছে?

যে ছোটবোনকে মেরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন বুঝি সেই বোনের জন্য বিবেক যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে? সেদিন যখন বোনকে তাড়িয়ে দেওয়াটা 'খুব নেয্য' 'খুব নেয্য' বলে মনে হয়েছিল, তখন কি একথাটা মনে হয় নি যে ন্যায় বিচারের একটা ভিত্তি থাকা দরকার? সে কথাটা মনে হয় নি বলেই নানারকম গুজবকে সত্য বলে বিশ্বাস ক'রে আমাকে কলঙ্কিত ক'রে রেখেছে।

'বেশ তো, এ বিয়েতে যদি রাজী না হোস, তবে তোকে যে গাড়ীতে করে ঘুরে বেড়ায়, সেই প্রভাকরকে বলে দেখিস তো সে তোকে বিয়ে করতে চায় কি না... চালাক লোক তোর দিকে ফিরেও তাকাবে না, একবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেবে, বুঝলি... হা হা হা'— এইভাবে গণেশ আমাকে ভয় দেখাতেও কসুর করল না।

আমি জবাব দিলাম— 'কবে? বিয়ে করার পরেই তো?' বলেই জিব কাটলাম।

গণেশ গর্জে উঠল— 'এই যে এতবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কিছু বলছে কি? বিয়ে করবি কি না এই তো কথাটা।' আমি মনে মনে হাসলাম।

'গণেশ, কেন মিছিমিছি গঙ্গাকে বকছিস? ও সকলের বিরুদ্ধে একগুঁয়ে হয়ে থাকবে, সকলের বিরুদ্ধে সাহস ক'রে দাঁড়াবে। জন্ম দেওয়ার কষ্ট আমি সয়েছিলাম। তুই কেন ওর সঙ্গে তকরার করছিস?— সবই আমার কপালের লেখন। পাড়ার লোক যা বলে তাই তো তবে সত্য'— এইভাবে মা কাঁদতে লাগল।

'আমার কাউকেই বিয়ে করতে ভালো লাগছে না, সেজন্য তোমরা সকলে

মিলে কিসের জন্ম জ্বালাতন করছ? ভালো না লাগলে ছেড়ে দিতে হবে কি? তোমরা যে আমার ওপর এত আগ্রহ দেখাচ্ছ তাতে আমি খুশী হলাম। অশেষ ধন্যবাদ। ব্যাপারটা ওখানেই ছেড়ে দাও।'— বড় ঘরে এসে গণেশ ও মায়ের উদ্দেশ্যে কথাগুলি বললাম. কিন্তু তাদের মুখের দিকে না তাকিয়ে, খবরের কাগজ দিয়ে আমার মুখটা আড়াল ক'রে দুজনের কথার উত্তর দিয়ে দিলাম।

'কাকে তুই বিয়ে করবি কি না তা নিয়ে আমরা জ্বালাতন করছি না। কে-না-কে একটা লোকের রক্ষিতা হয়ে ঘুরে বেড়াও. সেইটেই দূর করবার চেষ্টা করছি।' দাঁতে দাঁত চেপে গণেশ চিৎকার করে উঠল।

মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে আমি গণেশের দিকে তাকালাম— 'ঠিক বলেছ। সেইটেই কারণ। আমি যে কাউকে বিয়ে করতে পারি না তার কারণ আমি এই রকম একটা দুর্নাম. অপবাদ মাথায় তুলেছি। ওরা বলেছিল যে বিধবা হলেও আপত্তি নেই, কিন্তু এখন আমি যেভাবে যে অবস্থায় আছি তাতে বেংগলুরের রামস্বামী আমার সহবাস করতে পারবে না। আমি আমার পছন্দমতো একটা লাইফ খুঁজছিলাম।...'

গণেশ গর্জে উঠল— 'বন্ধ কর্. বন্ধ কর্ মুখ। আমার কথা আমি থামিয়ে দিলাম। বেহায়ার মতো আবার ন্যায়ের কথা বলছে...'

আমি কিছু উত্তর দিলাম না. শুধু ভাবলাম 'এই হল আমার সঙ্গে ন্যায় বিচার?'

এরপরে সকলেই আমরা মৌন হয়ে আছি। কোনো রকমেই আমাকে বুঝিয়ে ওদের সেই বিবাহের ব্যাপারে রাজী করানো যাবে না একথা ওরা— মা ও গণেশ বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয়। আর আমি 'এখানেই এই ব্যাপার সাঙ্গ করো' এই কথা বলতে-না-বলতেই ব্যালকনিতে উঠে গেলাম। কিছুক্ষণ বেড়াচ্ছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে মনে জাগল— সান্ধ্যভ্রমণে বেরুবো নাকি? গণেশ বোধ হয় চলে গেছে।

আমার খুব ইচ্ছে করছে একবার প্রভাকরের সঙ্গে দেখা করতে। সকাল বেলায় বলে দিলে এসে যেত। কাল মর্নিং ওয়াকের সময়েই দেখা হবে— এই-রকম একটা চিন্তায় মনটা যেন দমে গেল।

আমার এখন ওঁকে খুব দরকার। ওঁর দিকে তাকিয়ে, ওঁর পাশে বসে কথা বলতে পারলে আমার জীবনটা পূর্ণ হবে... সেইটেই আমার যথেষ্ট...

এখন আমি বেড়াতে যাব।

34

প্রভাকরের অফিস ম্যানেজার রাও প্রভাকরের সামনে এক টুকরো কাগজ এনে এগিয়ে দিল. তাতে ইংরেজীতে লেখা ছিল : গঙ্গার ভাই টি. এস. গণেশন্।

'আসতে বলুন' বলে রাওকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রভাকর বা প্রভু টাইটাকে ঠিক ক'রে নিল।

গণেশ তার নিজের অফিসের উচ্চপদস্থ অফিসারের ঘরে যে ভয়ভক্তির সঙ্গে প্রবেশ করে— এখানেও প্রভু গণেশকে অনেকটা সেই সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখল। ইতিপূর্বে কখনো গণেশকে দেখে নি। তবে সে গঙ্গার কাছে শুনেছে যে তার এক দাদা আছে. সেই দাদাই গঙ্গাকে মারধোর ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, এখনও কিছু একটা হলে গঙ্গার ওপর অপবাদ চাপিয়ে দেয়, এবং অনেকবার গঙ্গার বাড়ীতে এসে তাকে বকাবকি ক'রে যায়।

গণেশের বিষয়ে গঙ্গা যে-সব কথা বলেছে যেমন গণেশের রাগ ও ঘৃণা এবং গণেশের যে বর্ণনা দিয়েছে তার থেকে প্রভুর মনে গণেশের যে চিত্র তৈরি হয়ে ছিল এবং এখন সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকা গণেশের যে চেহারা— এই দুয়ের মধ্যে প্রভু আকাশ পাতাল ব্যবধান লক্ষ্য করল।

গণেশকে এখন মুখোমুখি দেখতে পেয়ে তার ওপর প্রভুর মনে এক রকম করুণার ভাব সৃষ্টি হল। প্রভুর সমান বয়স কি ? না, তার চেয়ে দু'এক বছরের ছোটো ?— মনে মনে প্রভু একটা বয়সের হিসাব করল। দেখলে মনে হয় জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জরিত। মাথার চুল আধাআধি কাঁচা-পাকা। গালের মধ্যে সব সময়েই পান রাখার ফলে গাল দুটো চোয়ালের সঙ্গে লেগে গেছে, কপালে ভস্মমাখা (বিভূতি), গায়ে হাতে কাচা ইস্ত্রি-না করা শার্ট, পরনে ঢোলা প্যাণ্ট, হাতে একটা খাকি ব্যাগ আর সেই ব্যাগের মধ্য থেকে মাথা তুলে আছে আজকের খবরের কাগজ। টিফিন বক্সের ভারে ব্যাগের একটা কোণ একটু বেশি ঝোলা।

আসামাত্রই গণেশ 'গুড মর্নিং সাব' বলে প্রভুকে নমস্কার ক'রে— একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। প্রভু তার সামনেকার চেয়ারগুলির একখানার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল— 'প্লীজ...সিট ডাউন।'

গণেশ খুবই বিনীতভাবে হাঁটু দুটো একত্র করে সেই চেয়ারের ওপর বসল। হাতের খাকি ব্যাগটি পাশেই মেঝের ওপর রাখবার সময় 'ঢন্' ক'রে টিফিন বাক্সের আওয়াজ শোনা গেল।

'আপনাকে কী দেবে ? কফি ? চা ? কোল্ড ড্রিঙ্ক্স্ ?' প্রভু বেশ মর্যাদার

সঙ্গেই গণেশকে অভ্যর্থনা করল। গণেশও অনুরূপ ভদ্রতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান ক'রে বললে— 'নো, থ্যাঙ্কস্... কিছুই চাই না।'

'ভাট ইজ অলরাইট! জাস্ট্ এ কোল্ড ড্রিঙ্ক্' এই বলে কলিং বেল টিপতে বাইরে যে ঘণ্টার শব্দ বেজে উঠল তা গণেশের কানে গেল। ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে হাজির।

'কোল্ড ড্রিঙ্ক্স্...' হুকুম হতেই সে চলে গেল। প্রভু সিগারেট নিয়ে জ্বালাবার আগে গণেশের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'নো...থ্যাঙ্কস্'— প্রভু তখন সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। ঘরের মধ্যে একটা নীরবতা। কারণ কী কথা দিয়ে কীভাবে আরম্ভ করতে হবে গণেশ তা জানে না। নীরবতাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল এয়ার কণ্ডিশন করার সেই 'কিররর্' শব্দটা।

সিগারেটের ধোঁয়ার ফলে প্রভুর বুকে খানিকটা কাসির চাপ দেখা দিল। বেশ খানিকটা কেসে নিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ দুটি মুছে নিয়ে বলল— 'আই অ্যাম সরি...কোল্ড্...।'

গণেশ বলল— 'সকালে রোজ ঠাণ্ডায় বেড়ানো কি...?'

'সেরকম কিছু ঠাণ্ডা নেই। এখনও একমাস গেলে তবে স্কার্ফ ছাড়া চলবে না।'

পৌনে এক ফুট উঁচু দুটি গ্লাসে স্ট্র সমেত কুল্ ড্রিঙ্কস্ এনে এদের সামনে রেখে বেয়ারা চলে গেল।

প্রভু এক চুমুক দিয়ে গণেশকে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল: 'আপনি কোথায় কাজ করেন?'

'রেলওয়ে অফিসে...।' গণেশ একটু হেসে উত্তর দিয়ে স্ট্র দিয়ে কুল ড্রিঙ্ক পান করতে লাগল। পরে একসময়ে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল যে আর আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে তার আসার বিবরণ জানিয়ে এখান থেকে অফিসে গিয়ে পৌঁছতে হবে। অন্য দিকে প্রভু কিন্তু 'এই লোকটি কিসের জন্য এসেছে' সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে ভাবতে লাগল অন্য কথা: লোকটির আয় কত হবে, এবং পরিবার-পরিজন, ছেলেপেলে, পড়াশুনো, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি।

গণেশ যখন এইভাবে আরম্ভ করল— 'আমি এখন কেন এসেছি...' তখনই প্রভু বুঝে গেল 'লোকটি এখন কেন এসেছে।' ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করল— 'ও! আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?'

গণেশও ইংরেজীতে বলল— 'এতদিন পরে অবশেষে আমার ছোট বোনের জন্য একটি বর পাওয়া গেছে। মায়েরও একান্ত ইচ্ছা এখানেই যে কোনো রকমে কাজটি হয়ে যায়। এই বিয়েটা হওয়া-না-হওয়া আপনার হাতে।' গণেশ এই

পর্যন্ত বলতেই প্রভু আনন্দের সঙ্গে প্রাণ ভরে হাসল, তারপর ইংরেজীতে বলল— 'তাই যদি হয়, তাহলে জেনে রাখুন এই বিয়ে হয়ে গেছে। আপনাদের সকলের তুলনায় আমিই সবচেয়ে বেশি এই বিবাহ কামনা করি। এ বিষয়ে গঙ্গার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করছি। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বিয়ের ওপর গঙ্গার একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আপনারা সব ব্যবস্থা করুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। গঙ্গা এ বিষয়ে আমাকে যেদিন বলেছে সেই দিন থেকেই আমি তার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছি। ইউ নো, সি ইজ অ্যান্ এন্জেল্। তাকে বোন হিসেবে পেয়েছেন বলে আপনার খুশী হওয়া উচিত।' এই পর্যন্ত বলে প্রভু যখন গঙ্গার প্রশংসা করতে আরম্ভ করল, তখন গণেশের ভিতরটা খলবল হাসিতে ভরে গেল। তবুও সন্দেহ করা গেল না যে লোকটা মিথ্যে ক'রে ইচ্ছা ক'রে এই সমস্ত কথা বলছে।

প্রভু সমানে বলে চলল : 'আমি গঙ্গার বন্ধু হওয়ার পর থেকে সে আমাকে কত রকমে রূপদান করেছে জানেন? আমার পরিবারের একজন বন্ধু হওয়ার পর থেকে সে আমার মেয়ে মঞ্জুকে যে কত রকমের সাহায্য করেছে জানেন কি? এই সমস্ত বিষয়ে বলার বা প্রশংসা করার সুযোগই এল না। সেই গঙ্গার শুভ-জীবনের জন্য আমাকে যা কিছু করতে হয় করব।'

গঙ্গার 'ববাহের জন্য প্রভু যে বলেছে সে সব-কিছুই করতে পারে, একথা কতদূর সত্য সে সম্পর্কে গণেশ কিছু বুঝতে না পারলেও এটা কিন্তু গণেশ বুঝেছে যে লোকটা খুব ভালো, এত ভালো যে তার সম্পর্কে অন্য লোকজন কী বলাবলি করছে তাও সে জানে না। এই যে লোকটার সামনে বসে আছি আমি— আমি ওর সম্পর্কে কী ভাবি-না-ভাবি সেটুকুও না জেনে আমার সমস্ত কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে ফেলেছে, এতই ভালো।

প্রভুর জন্য যেন দুঃখবোধ হয়েছে এইভাবে একটু সামান্য হাসি হেসে গণেশ বলল, 'আমি কিছু বললে ভুল বুঝবেন না তো?'

'নট্ অ্যাট্ অল্। বলুন'— এই বলে প্রভু আর একটি সিগারেট ধরালেন।

'আমার বোন ও আপনার সম্পর্কে অন্য লোকেরা কী বলাবলি করে জানেন কি? সত্য যাই হোক না, সাধারণভাবে লোকে কে কী বলে কিছু জানেন কি?' গণেশ যখন এই কথাগুলি বলছিল, তখন প্রভু খুব জোরে সিগারেটের ধোঁয়া টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে চিন্তা করল, তারপর চোখ খোলার সময়ে প্রভুর মুখ থেকে নিঃসৃত ধূম্রপুঞ্জ সামনে উপবিষ্ট ঐ গণেশকে আড়াল ক'রে ফেলল। প্রভু হাত দিয়ে সেই ধোঁয়া সরিয়ে বলল : 'ইয়েস আই নো, আই অ্যাম সরি।... ইউ নো...' প্রভু এইভাবে কিছু একটা বলতে আরম্ভ করলে গণেশ বুঝতে পারল যে লোকটি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং সেইজন্য তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল :

'নো, নো ! আপনি ও বিষয়ে আর কিছু বলবেন না, আমাদের মেয়ে সম্পর্কে কি আমরা জানি না যে সে কেমন-না-কেমন ? আমি যেটা বলতে চাই তাহল এই যে এত কাণ্ডের পরে গঙ্গারও একটি বর পাওয়া গেল। সেই বর সম্পর্কে সব কথা শোনার সময়ে আমরা কিন্তু জানতে পারিনি যে গঙ্গার অতীত জীবন নিয়ে সে মাথা ঘামাবে কি না। সে চেয়েছিল একটি বিধবাকে বিয়ে করবে। তাহলে ভেবে দেখুন...' গণেশ আর অগ্রসর হওয়ার সাহস না পেয়ে একটু করতে লাগল।

'হঁ...বলে যান...বলে যান' গণেশের মুখের দিকে না তাকিয়ে 'অ্যাশ্‌ট্রে'র মধ্যে প্রভু ছাই ঝেড়ে ফেলল। কিন্তু গণেশকে নীরব দেখে তার বক্তব্য বিষয়ের সামান্য আঁচ করতে পেরেই প্রভু মুখ তুলে গণেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল— 'আপনি কি বলতে চান যে... আপনাদের গঙ্গার সঙ্গে যদি আমি দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দিই সেইটেই হবে এই বিবাহে আমার সাহায্য ?'

এই মুহূর্তেই প্রভু অন্যলোকের কাছে সর্বপ্রথম 'আপনাদের গঙ্গা' বলার মতো দুঃখের ব্যবধান অনুভব করল। গণেশের মুখের দিকে তাকিয়েই ছিল সে। সেইভাবেই তার মনের কথা পুনরায় একবার বলল— 'ইয়েস, সী ইজ্‌ ইওর্‌স্‌... গঙ্গা তো আপনাদেরই...'

'কারণ...' এইভাবে গণেশ কী একটা বলবার চেষ্টা করতেই প্রভু মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল – 'না, না। আমাকে আর বোঝাতে হবে না। কথাটা সত্য। আমার সংসর্গে থেকে আপনাদের মেয়ের যে বদনাম হয়েছে তা আর বলতে ! আপনাদের মেয়েকে আপনারাই বুঝবেন। সেই ভাবেই যে আগন্তুক অন্য মানুষ বুঝতে পারবে এরকম প্রত্যাশা করা যায় কি ? আমি আপনাদের মতাত হলে কোনো একটা সম্পর্কের কথা বলা ব'লে আপনার লোক বলা যেত। কাজেই আমার পক্ষে সরে যাওয়াটাই ভালো। আমার সঙ্গে মেলামেশা করার সময়ে সে আমার যে মঙ্গল করেছে তার কি প্রতিদান হবে তার হাত থেকে আমার সরে যাওয়া ! কী মজার ব্যাপার দেখুন তো ! কিন্তু না, এতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই। বরং আমি এতে সত্যি অত্যন্ত গর্বিত। আমি আর একটা কথাও বলতে চাই। সম্প্রতি আপনাদের গঙ্গার সঙ্গে একত্র কথাবার্তা না হওয়াতে আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। এই ব্যাপারে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললে যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব তাও মনে হয় না। কাজেই আমি নিজেই সব স্থির ক'রে ফেলেছি। আমার পক্ষ থেকে আপনারাই তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবেন। আর একথাও বলবেন যে এই বিবাহে গঙ্গা সম্মতি দেবার পরেই আমি তার সঙ্গে দেখা করব, তার আগে নয়। আর বলবেন— সে পর্যন্ত আমি এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকব যে গঙ্গার বিবাহে আমি কী কী যৌতুক উপহার দিতে পারি। আমার বিশ্বাস তার জীবন খুব সার্থক হবে। আমি শুভাকাঙ্ক্ষী

হয়ে তার যাতে শুভ হয় তাই করব। উইশ্‌ ইউ গুড্‌ লাক্‌।' এই ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে প্রভু গণেশের সঙ্গে করমর্দন করল।

পুনরায় সে গণেশকে বলল— 'আর-একটি কথা বলবেন যে বিবাহে সে সম্মতি না দিলে আমি আর তার সঙ্গে দেখা করব না।'

গণেশ খুব বিহ্বল হয়ে পড়ল। গণেশ যে পরিণতির কথা ভেবে এসেছিল তা এই : গণেশ এসে প্রভুকে বলবে— 'আমার বোনের সঙ্গে আর দেখা করবেন না মশাই,' আর এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ প্রভু বলে উঠবে— 'ওসব কথা গিয়ে তোমার বোনের কাছে বোলো। ইউ গেট্‌ আউট।' এই রকম একটা 'সীন'-এর জন্যই গণেশ তৈরি হয়ে এসেছিল। কিন্তু যে-সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল তাতে সে খুব খুশী না হয়ে পারল না। একটা লোককে ভালো বলে বুঝতে পারলে সকলের মনেই আনন্দ হয়। প্রভু নামক লোকটি যে কত ভালো সেই বিষয়টি তার পরিবারস্থ সকলের কাছে গিয়ে বলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল গণেশ।

এতক্ষণ ইংরেজীতেই কথাবার্তা হ'চ্ছিল। গণেশ এবার আবেগের অভিশপ্ত মন খুলে তামিলেই বলল— 'স্যার আপনি খুব সজ্জন। আমিও আপনার সম্বন্ধে নানা অন্যায় কথা বলেছি, সে সব ভাবলে আমারই লজ্জা হয়। মাফ করবেন। আপনি অতি মহান। আমি পরে এসে একদিন দেখা করব স্যার।' এই ব'লে গণেশ বিদায় নিল।

প্রভু একমুহূর্ত চোখ বুজে প্রার্থনা করল— 'গঙ্গার সমস্ত ব্যাপারগুলি যেন শুভমতো সম্পূর্ণ হয়।'

ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা! এই বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রে কীভাবে যে প্রভাকরকেও যুক্ত করল জানি না। এই গণেশ শয়তানটা গিয়েই কি ওঁর সঙ্গে দেখা করেছে? কী বলেছে? কীভাবে ও প্রভুর মনকে ভেঙে বদলে দিয়েছে? হায়! ওঁর মন তো শিশুর মতো— যে যা বলে তাতেই বিশ্বাস ক'রে বসে। ওঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। দেখা করতেই হবে। তিনদিন ধ'রে কতরকম ক'রে চেষ্টা করলাম, কিছুতেই পাওয়া গেল না। বাড়ীতেও নেই, অফিসেও নেই। যখনই ফোন করি, নেই। এই গণেশ প্রভৃতি শয়তানগুলির খুব আনন্দ। ওরা কি ওঁর ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালো? আমি কি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব না? আমাকে না দেখেও কি উনি থাকতে পারবেন? থাকতে পারবেন কি? আমাকে কি একলা ক'রে দিলেন? কেউ নেই আমার এ পৃথিবীতে?

মা ওঁর প্রশংসা করছে। গণেশও মুখ ভরে প্রশংসা করছে। অতঃপর উনি আর নাকি আমাকে দেখতে আসবেন না। গণেশ এমনভাবে কথা বলছে যেন সে অনেক কিছুই জানে। এই গণেশ আর এই আমার মা— এরা এখান থেকে

চলে গেলে উনি নিশ্চয়ই আসবেন। সেদিন মা বলেছিল 'ভাখ, আমি যদি তোর বাড়ী থেকে ফিরে যাই বলবে না কি যে বাড়ীতে তালা ঝুলছে তাই চলে এসেছে: তুই আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিস একথা বলবে না কি?' হ্যাঁ, আজ সেই মাকে তাড়াতেই যাচ্ছি। আমার সমস্ত আনন্দ, সমস্ত শান্তি নষ্ট করবার জন্য এরা ষড়যন্ত্র ক'রেছে। আমি কি এসব সহ্য ক'রে থাকব?

বিয়ে করতে হবে নাকি! বিয়ে, বিয়ে না শ্রাদ্ধ? থু...

আমার খুব রাগ হয়ে যাচ্ছে। আমি এই রাগের মাথায় কার কী করব জানি না, আমাকে নিয়ে আমি কী করব জানি না। এমন রাগ এর আগে কখনও আমার হয় নি।

আজ তিন দিন হল ওঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তিন দিন হল মর্নিং ওয়াক নেই। তিন দিন হল আমি ঘুমোতে পারছি না, আমি খেতে পারছি না। আমি অফিসে বসে কাজ করতে পারছি না। আজকে যেমন ক'রে হোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে স্থির ক'রে— সকালবেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ক'রে ওঁর বাড়ীতে গেলাম। আজ কত মাস পরে ওঁর বাড়ীতে এসেছি।

ট্যাক্সিতে বসেই হাতব্যাগ থেকে আয়না বের ক'রে আমার মুখের দিকে তাকালাম। সেই মুখ দেখে আমার নিজেরই ভয় হচ্ছে।

কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে যে ট্যাক্সি এসেছে সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না। এই যে ওঁর বাংলো এসে গেছে। যেমন ক'রে হোক তিন দিন পরে এখন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ওই যে ওঁর গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে। ওঁকে দেখে যাতে আমি কেঁদে না ফেলি সেইজন্য মনকে দৃঢ় করলাম। মিনতি ক'রে ওঁকে শুধু একটি কথাই বলব—এরপরে আর আপনি আমায় এভাবে কষ্ট দেবেন না। ট্যাক্সিওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আমি ভিতরের দিকে ছুটে গেলাম।

মঞ্জু হাতে একখানা বই নিয়ে লনে বেড়াতে বেড়াতে পড়ছে। আমি যে এসেছি সেদিকে খেয়াল নেই। আমার ব্যাকুলতা মঞ্জুর চোখে ধরা না পড়ে সেইজন্য খুব স্বাভাবিক ভাবে নিজেকে তৈরি করে বাগানের এক পেরমু চেয়ারে বসে মঞ্জুর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বললাম, 'গুড মর্নিং মঞ্জু।' আমাকে দেখেই তার চোখেমুখে আনন্দ ও আশ্চর্যের প্রকাশ দেখা গেল। ছুটে এসে আমার পাশেই বসল।

আমার হাত ধ'রে জিজ্ঞেস করল— 'শরীরের কী হয়েছে বলুন তো। খুব রোগাটে. কালো হয়ে গেছেন, মুখখানা শুকনো। আর ইউ ওয়েল্? বাবা তো কিছুই বলেন নি।'

মাথার চুলটা সরিয়ে একটু হাসবার মতো মুখ ক'রে বললাম, 'ও কিছুই নয়। তুমি অনেক দিন হল আমার সঙ্গে দেখা করোনি, তাই।' তারপরে যথা-সম্ভব নির্বিকার কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম— 'তোমার বাবা কোথায়?'

'ও, আপনার কাছে না বলেই চলে গেছেন? বেংগলুর চলে গেছেন... আজ তিন দিন হল।'

'বলেছিলেন যে আজ ফিরে আসবেন। আমি ভেবেছিলাম এতক্ষণে বোধহয় ফিরে এসেছেন!' নিজেকে সামলে নিয়ে মথো তুলে বসলাম।

'এগারোটার সময়ে প্লেন' এই বলে মঞ্জু বইএর পাতা ওল্টালো। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'কফি এনে দিই? টিফিন খেয়েছেন কি?'

'না না, কিছুরই দরকার নেই'— আমি এখন মঞ্জুর বিষয়ে ভাবছি। সেই সামজীর সঙ্গে মঞ্জু খুব ঘুরে বেড়াত, সেই কথাটা মনে এল। সেই প্রসঙ্গে কথা হতে হতে মঞ্জু এক সময়ে চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখে বলল— 'কে বলেছেন আপনাকে? বাবা বুঝি? আমি জানি। সেই একদিন— একটি দিনই মাত্র— যাওয়ার সময়ে বাবার গাড়ীখানিকে ক্রশ করে ফেলল। ইস্ হী ওরিড? ...ঘটনাটা কী সেসব বিষয়ে আমি যা বলেছি মিথ্যা নয়— সব সত্য। কিন্তু কী মুশকিল দেখুন, ঐ সামজী না— একদম বোকা। একমুখ দাড়ি নিয়ে এসে এই বলে কাঁদতে লাগল— 'কাল আমার বার্থ্‌ডে, তুমি না গেলে আমি কিছু করব না।' অগত্যা রাজী হলাম। পার্টিতে গেলাম। বাট্ হী ইজ গুড্— সামজী ছেলেটা খুব ভালো।...' এইভাবে মঞ্জু আরও কত কী কথা বলে যাচ্ছিল।

অনেক কথা আমার মনেই জাগেনি।

'আমিও তোমার বাবার কাছে সেই কথাই বলেছিলাম। বলেছিলাম যে মঞ্জুকে বিশ্বাস করুন; সে কখনও মিছে কথা বলবে না।'

কতক্ষণ হল এসেছি, ওঁকে এখনও না দেখতে পেয়ে মনটা কেমন ভেঙে পড়ছে। ভিতরকার নৈরাশ্য যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় এইভাবে মঞ্জুর সঙ্গে গল্প করতে করতে কফি খেয়ে রওনা হওয়ার জন্য বাইরে এলাম।

আজ লাঞ্চ আওয়ারে ওঁকে টেলিফোন করতে হবে। আই গুড টক্ টু হিম— ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। আমি যদি একবার কথা বলতে পারি, তাহলে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য এই যে ষড়যন্ত্র, তা ভেঙে চুরমার ক'রে দেব। আমি বললে উনি শুনবেন, হি ইজ মাই ম্যান।

35

'হ্যাঁ, প্রভু কথা বলছি।'

ওঁর গলা শোনামাত্রই আমার চোখ দুটো ভিজে এল। কেন জানি না আমি কাঁদছি। কথা বলার জন্য আওয়াজ আসছে না। এ কী বিপদ! ভাগ্যিস্ লাঞ্চ আওয়ার বলে কেউ নেই এখানে। আমার ডিপার্টমেন্ট একদম খালি।

ইতিমধ্যে উনি দু'বার হ্যালো হ্যালো করলেন। আমি গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিলাম। সেই শব্দ শুনেই উনি চিনতে পারলেন।

'গঙ্গা! এসব কী হচ্ছে? কাঁদছ কেন তুমি?'

আমি চোখ মুছতে মুছতে বললাম, 'না তো, আমার তো হয় নি কিছু, আমি কাঁদছি না তো। আমি এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার কাছে না বলে আপনি দেশে চলে গিয়েছিলেন? আমার দাদা গণেশ গিয়ে আপনার সঙ্গে নাকি দেখা করেছে? সে এসে কত কী বলেছে জানেন? আপনি নাকি বলেছেন যে আপনি আর আমার সঙ্গে দেখা করবেন না? সে বলল বটে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। ওর সব কু-বুদ্ধি। আপনি ওরকম বলবেন না আর। চুপ ক'রে আছেন কেন? বলুন। আপনি ও কথা বলেন নি, তাই না? হ্যালো...হ্যালো...।'

উনি যে চুপ ক'রে আছেন তাতে আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করছে। তাহলে কি উনি ওই সব কথা বলেছেন নাকি? বললেই কি হবে? সেই সময়ে সেই দুষ্ট গণেশটাকে কোনো কিছু একটা বলতে হবে বলে বলে দিয়েছেন। উনি আমার— ভালো, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করবেন না, করতে পারেন না।

'চুপ করে আছেন যে? কিছু একটা বলুন। আপনার গলা শোনার পর আমি শান্তি পেয়েছি। তিনদিন ধ'রে আমি যে কী কষ্ট পেয়েছি জানেন কি? আমরা 'মীট্' না করলেও চিন্তা নেই। কত কতদিন আমরা একে অপরকে না দেখে থাকি নি কি? আমাদের আবার দেখা হবে এই ভরসায় যতদিন দরকার হয় দেখা না ক'রে থাকব। কিন্তু এর পরে আর দেখাই হবে না এই কথা সত্য হলেও এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না। আমি আর সহ্য করতে না পেরে সকালে উঠেই আপনার বাড়ীতে ছুটে যাই। আপনি শহরে নেই শুনে মনটা একটু শান্ত হল। মঞ্জুর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হল। বলে নি সে? সেদিন আমি যেমন বলেছিলাম ঠিক সেইভাবে ও সামজীর বিষয়টা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছিল। মঞ্জুর কাছেই সব শুনলাম। সেদিন ছিল সামজীর 'বার্থ-ডে'। মঞ্জু না গেলে নাকি উৎসব হবে না বলে ছেলেটা এসে দুঃখ করছিল। সেইজন্য সেদিন মঞ্জু পার্টিতে গিয়েছিল। ব্যস, সেখানেই শেষ।...কী ব্যাপার? আমিই যে কথা বলছি। আপনি তো কিছুই না বলে চুপ করে রয়েছেন। কিছু বলুন।'

এখন একটু কাশলেন। আমি ইচ্ছা করেই হাল্‌কাভাবে ওঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম: 'আপনি কি কাঁদছেন নাকি?' হাসতে হাসতেই বললাম কথা। ক্ষণিক নীরবতা। তারপরে বললেন— 'হ্যাঁ।'

আমি ওঁর মুখখানা দেখতে পাচ্ছি না। খুব কষ্ট পাচ্ছেন উনি। মনটা হয়তো ভেঙে গেছে।

'কী ব্যাপার বলুন। গণেশ গিয়ে আপনার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছে?

বকাবকি করেছে, তাই না ? আপনি কেন দুঃখ করবেন ?'

'না না... সেরকম কিছু নয়। তোমার দাদা এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। এই বিবাহে তুমি সম্মতি দিলে পরেই তোমার সঙ্গে আমি দেখা করব বলেছিলাম। তোমার দাদা বলল যে আমরা যদি দেখাসাক্ষাৎ করি. যদি তোমাদের বাড়ীতে আমি যাতায়াত করি. তাহলে হয়তো এই বিয়েটা ভেঙে যাবে। আমার কাছে সেটা ঠিকই বলে মনে হল। সেইজন্যই আমি ওই সব কথা বলেছিলাম। আমি কি এখনও তোমার জীবনটা নষ্ট ক'রে দেব বলো। তুমি ঐ বিয়েতে সম্মতি দাও. সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাক। তার পরে এসে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। আমরা যদি এখন দেখা করি তাহলে আমার মনে হয় তুমিই বলবে যে এই বিয়ে তোমার দরকার নেই। তুমি এমন বুদ্ধিশালী মেয়ে। এত জ্ঞান তোমার। আমি যা বলছি ভালোমনে বোঝার চেষ্টা করো।'

কী সব আজে বাজে কথা বলছেন উনি। আমার কান্না ও ক্রোধ এসে গেল। আমি বেশ জোরেই বলে উঠলাম— 'বন্ধ করুন এই সব কথা।' তারপরে কেঁদে ফেললাম। কিছু না বলে শুধু কাঁদছিলাম। উনি যেন ফোনের প্রান্তে এই ভাব নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন— 'ঠিক আছে, কাঁদুক।' ওঁর সাহচর্য আমার যে কী পরিমাণ দরকার তা উনিও পর্যন্ত বোঝেন নি এই কথাটা ভাবতে গিয়ে আমার সমস্ত বুকটা ব্যথা করছে। হঠাৎ উনি আমার হাত থেকে ফস্কে গিয়ে কোনো অপরিচিত লোকের মতো এতখানি দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একথা আমি ভাবতেই পারি না।

আমি বললাম. 'আমার বিয়ে-টিয়ে কিছুই হবে না। আমি কাউকেই বিয়ে করতে পারব না। আপনি বরাবরের মতো আমার বাড়ীতে এসে দেখা করবেন। তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার দাদা, মা, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। কতকাল হল আমি তাদের সকলকে ত্যাগ করেছি। আমার আপন জন বলতে এখন কেবল আপনিই। আমি আপনার, আপনি আমার। আই অ্যাম্ ইওরস্, ইউ আর মাই ম্যান্। আগে একবার আপনিই বলেছিলেন 'এই জীবন এইখানেই ত্যাগ ক'রে কোথাও গিয়ে অপরিচিত মানুষের মধ্যে নতুন ভাবে যাপন করি... যদি ঐভাবে ডাকেন তবে এই মুহূর্তে একবস্ত্রে আমি আপনার সঙ্গে আসার জন্য তৈরি। রিয়লি উই লাভ ইচ্ আদার। আমি ওদেরকে জ্বালাতন করবার জন্য র. কু. ব.-র কাছে ঠিকানা দিয়েছিলাম বলে আপনি যে এইভাবে জিদ ধরে আছেন এটা কি ভালো ? প্লীজ...প্লীজ... আপনার সঙ্গে আমি এখনই দেখা করতে চাই। অনেক কথা বলার আছে। প্লীজ মীট্ মী।' এতক্ষণ ধ'রে চোখের জল মুছে ফেলেছি। আমি কী ক'রে এই রকম হয়ে গেলাম! আমি তাঁকে কাতর মিনতি জানালাম।

উনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, ডাকলেন—'গঙ্গা।' উনি যে আমাকে

এইভাবে ডাকলেন তাতে যে আমার কী সুখ হল বলা যায় না। উনি যদি সর্বদা আমাকে এইভাবেই ডাকতে থাকেন তবে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

উনি ইংরেজীতে বললেন। আমি নাকি খুব ইমোশনাল হয়ে আবেগের বশীভূত হয়ে— কী-না-কী কথা বলেছি। আমি নাকি কোনোমতেই ওঁর আপন নই। আমি নাকি এক ভদ্রমহিলার কন্যা, এক ভদ্রলোকের ছোট বোন। এক গৌরবান্বিত বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে আমি সৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আমার নাকি রীতি অনুযায়ী একটি সৎ স্বামী ও সৎ জীবন লাভ করা উচিত। সেই সব ব্যবস্থা করতে না পারার ফলে নাকি উনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে ওঁর মেয়ের ব্যাপারেও এই রকম একটা উপদ্রবের সৃষ্টি হবে বলে ওঁর আশঙ্কা। উনি নাকি আমাকে ওঁর দ্বিতীয় মেয়ের মতো দেখেন, আমাদের পরস্পরের ভালোবাসা নাকি সেই ধরনের। অন্য কোনো রকমের ভালোবাসা আমাদের মধ্যে নাকি হ'তেই পারে না। উনি এইসব কথা বললেন। আমি কেবল বেদনায় অভিভূত হয়ে ভাবলাম, 'কালের কি এভাবে পরিবর্তন ঘটে?'

উনি দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারি না— একথা তুমি নিজেই কতবার বলেছ মনে পড়ে? তোমার ঐ কথাটিই সত্য।'

হ্যাঁ, আমিই ওই রকম খুব দৃঢ়ভাবে কোনো-এক সময়ে বলেছিলাম। কিন্তু বলবার সময়েই বুঝেছিলাম— কথাটা মিথ্যা। সেই সমস্ত কথা এখন একে একে ভেবে দেখছি।

প্রথম প্রথম আমি ওঁকে ফোনে ডাকলে উনি আসতেন— আরল্যাণ্ড গ্রাউণ্ডে এসে গাড়ী রেখে আমার জন্য অপেক্ষা করতেন। তখন উনি কী ভাবতেন মনে মনে? ওঁর গায়ে নানা সুগন্ধি, ওঁর সাজসজ্জার বাহুল্য, তারপরে ওঁর চোখের দৃষ্টি যে দৃষ্টিতে উনি আমার দিকে তাকাতেন— এই সব নিয়ে সেই মায়াবী সন্ধ্যাবেলায় এই লোকটি কোন চিন্তা নিয়ে আসতেন তা তো বুঝেছি। কিন্তু আমার চিন্তাধারার কোনো ক্রম রইল না। একটা বিষয়ের চিন্তার মধ্যে আরেকটা বিষয় মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেইমতো কত মানুষের মুখ, তাদের কত কথা, বাড়ী, হস্টেল, ফ্রেণ্ড্স্, লেক্চারস্... সমস্তই কানে-শোনা শব্দ হয়ে, চোখে-দেখা দৃশ্য হয়ে—অন্তর ও বাহিরকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি একদিকে একটু কাৎ হলাম। তখন তিনি 'কী ব্যাপার' এই বলে কী একটু জিজ্ঞেস ক'রে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। সেই সময়ে আমি যে কথা না বলে চুপ ক'রে ছিলাম বলেই আজ আমাদের দুজনের মধ্যেকার এই সম্পর্ক অন্যরকম হয়ে যেত।

আমি কেন তখন 'ছি' বলে জেগে উঠলাম? হায়! কেন ওঁর হাত ও পা কেঁপে উঠল? তার পরে উনি আত্মহারা অবস্থায়ও আমাকে স্পর্শ করেন নি। সেদিন যে আমি ঐভাবে ব্যবহার করেছিলাম, এই কি তার শাস্তি?

উনি কোনে কথা বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কত কী

আকাশ পাতাল ভাবছি। তখন, এই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পেরেছি যে এত বছর ধ'রে ওর ও আমার মধ্যে মিথ্যারূপে যে পর্দা ফেলা ছিল সেই পর্দা ছিন্ন ক'রে আজ আমার মন শুধু নর ও নারীরূপে মিলিত হওয়ার জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ইজ দিস্ টু লেট? তার সময় কি চলে গেছে? বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে নাকি? উনি কি আমার সঙ্গে দেখা করবেন না? নিমন্ত্রণ পত্র হাতে নিয়ে তবে এসে দাঁড়াবেন। একি পাগলামি?

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, বিয়ে করব। কেন জানেন? আপনার সম্পত্তির জন্য নয়, আপনার পদমর্যাদার জন্যও নয়'— এইটুকু বলে আমি হেসে ফেললাম। ওসব যে পাওয়া যাবে না তা আমি জানতুম। 'আপনাকে খালি একজন পুরুষরূপেই পেয়েছিলাম. সেইভাবেই আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আপনার সঙ্গে আমার ঐ ভাবেই পরিচয়। শুধু একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য আমি আপনাকে বিবাহ করব। এর পরেও এই-ভাবেই পরস্পরের পরিচিত হয়ে আমরা আমাদের ঠকাব না। আপনার কাছে আমার কোনো লজ্জা নেই। আই উইল শেয়ার মাই ফেট উইথ ইউ।' কানে-কানে গোপন কথা বলার মতো আমি এই কথাগুলি ফোনে বলেছি। আমার চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'স্টপ দিস ননসেন্স্' বলে ঠক ক'রে রিসিভারটা রেখে দিলেন।

আমি ওখানেই টেবিলের ওপর মাথা নীচু ক'রে দু'খানা হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে খুব ক'রে কাঁদলাম। আঙুলের ফাঁক দিয়ে কি জল গড়িয়ে পড়ছে? অশ্রু অর্থাৎ মনের অশুদ্ধ জল।

হঠাৎ মনে পড়ল, লাঞ্চ যারা গিয়েছিল তারা কি ফিরেছে; কেউ আমাকে দেখে ফেলেছে নাকি? মুখ মুছে ফেলে বসে বসেই আমার চার দিকটা একবার দেখে নিলাম। এখনও কেউ আসে নি. সময় হয় নি।

পুনরায় ওঁকে টেলিফোন করলাম।

'হ্যাঁ. প্রভু বলছি।'

'আমি গঙ্গা'—গলা আমার রুদ্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

'বলো'—কণ্ঠস্বরে কিছুমাত্র স্নেহ নেই।

'আমার যা বলবার ছিল আমি তো সবই বলে দিয়েছি।'

'আমারও যা বলবার ছিল বলে দিয়েছি'—একটু দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

'আপনি না থাকলে আমি বাঁচব না'—শিশুর মতো কেঁদে উঠলাম। বাপ যেমন সন্তানের পিঠে হাত বোলায় সেইমতো, বললেন,

'চেষ্টা করে ভাখো। বাঁচবে।'

'আপনি পারবেন?'

'পারব ভাবছি। পারতে হবে।'

'কেন অমন ভাবছেন ? ওরকম করে ভাববেন না।'

'গঙ্গা, এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, সত্যিই তুমি কথা বলছ কিনা। এই কি তুমি ? কী হয়েছে তোমার ? তুমি এরকম হ'তে পার না। আমি এত জোর দিয়ে বলছি সেটা তোমার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। কাজেই তুমি এমন হবে কেন ?' ওর প্রশ্নগুলির মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম,

'আই হ্যাভ লস্‌ট্ মাই সেল্‌ফ— আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, একথা কি আপনি জানেন না ?'

'না, তুমি নিজেকে হারাও নি। একবার আমি যে ভেবেছিলাম সেটা যে কত বড় ভুল বুঝতে আর বাকী নেই। আবার সেই কথা ভেবে আর একটা ভুল করতে আমি চাই না। অ্যাণ্ড ইট ইজ নট রাইট ফর অ্যান এনজেল লাইক ইউ। আমি এই সব কথা বলছি বলে আমাকে ক্ষমা কোরো গঙ্গা। এই বিবাহ অথবা অন্য কোনো বিবাহকে স্বীকার করে নিয়ে অন্য একজনের স্ত্রী-রূপেই তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা না করলেই বিয়েটা সহজসাধ্য হবে। তুমিই আমাকে এই জ্ঞান ও বল দিয়েছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আবার এই বিয়ের ব্যাপারে জোর দিচ্ছি। তুমি আমাকে যে-সব প্রস্তাব দিয়েছ তা আমি শুনেছি। আমার এই একটা অনুরোধ তুমি শুনবে আশা ক'র। একথা শোনার অযোগ্য বলে তুমি যদি জিদ ধরতে থাক, তাহলে আমাদের চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই। ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন। মে আই সে গুড্ বাই।'

আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে গেল রাগে। রিসিভারটাকে ছুঁড়ে মারার মতো ফোনের ওপর রেখে দিয়ে তারপরে আমি নিজেই নিজেকে বললাম, 'গুড-বাই'।

আমার মাথা ঘুরছে। এখন আর কান্না-টান্না আসছে না। সব শূন্য হয়ে গেছে। আর কোনো বিষয়েই কোনো চিন্তা নেই। সমস্ত চিন্তা ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে। আমিই আমার কাছে খুব নতুন বলে বোধ হলাম। আমি যেন আমি নই, অন্য কেউ। আমার চারিদিককার এই জগৎ আমার কেমন অর্থহীন হয়ে গেল। জীবিতকে যেন নিষ্প্রাণ বলে মনে হচ্ছে।

টেবিলের ওপর থেকে ফাইল তুলে নিয়ে ওল্‌টালাম। খস্‌খস্ করে সবগুলোর ওপর সই ক'রে দিলাম। বুকটা খালি হয়ে গেল। ঐ যে জলভরা গেলাসের ওপর প্লাস্টিকের ঢাকনী সেই ঢাকনীটা সরিয়ে ঢক্‌ঢক্ ক'রে জল খেয়ে ফেললাম।

চুপচাপ ছুটি নিয়ে গেলে কেমন হয় ? খুব একটা ঘোরের মতো লাগছে। বাড়ীতে গিয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমোনো দরকার। শুয়ে পড়লে ভালো ঘুম আসবে মনে হচ্ছে। এই আমি রওনা হলাম... অফিস থেকে বাড়ী।

যাক সব নষ্ট হয়ে। কোনো কিছু দরকার হলে এবং কোনোখানে দরকার হলে যাক সব খারাপ হয়ে। রঙ্গস্বামী এলো। তার কাছে বললাম, 'শরীরটা ভালো নেই বলে আমি বাড়ী চলে যাচ্ছি বোলো।' চলে গেল রঙ্গস্বামী। ওকে আবার ডাকলাম, 'আমায় একটা ট্যাক্সি এনে দাও তো।'

রঙ্গস্বামীও আমার সঙ্গে লিফ্‌ট্‌-এ নেমে এল, আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হচ্ছে যেন ও জিজ্ঞেস করতে চায় আমার জন্য ও কিছু করবে কি না, কিন্তু কী একটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস না ক'রে চুপ ক'রেই রইল।

নীচে আসা মাত্রই 'এখানেই দাঁড়ান, দিদিমণি' এই বলে ও ট্যাক্‌সি ধরতে গেল। মিসেস ম্যানুয়েল সিগারেট খেতে খেতে এসে সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'গোইং হোম্?'

'ইয়েস'। মিসেস ম্যানুয়েলের সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধটা ওঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

'শরীরটা খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

ট্যাক্‌সি এসে গেছে। মিসেস ম্যানুয়েলের কাছে হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম। যখন মাউণ্ট রোড ধ'রে ট্যাক্‌সি যাচ্ছে, আমি তখন চোখ বন্ধ ক'রে চিন্তা করতে লাগলাম। আমি যেন ওঁর সঙ্গেই যাচ্ছি। কাছে বসে উনিই গাড়ী চালাচ্ছেন। আজ টেলিফোনে যে সব কথাবার্তা হল সবই স্বপ্ন।

বাড়ীতে এলাম। মা বড় ঘরের মেঝেতে। বাড়ীতে কেউ নেই বলে বেশ স্বাধীন ভঙ্গীতে সটান শুয়ে পড়ে বই পড়ছিল। আমার পায়ের শব্দ শুনতেই কাপড়চোপড় সামলে নিয়ে উঠে বসে তাকাল। মা আমায় কিছু একটা জিজ্ঞেস করবে বলে ভাবছিল, তার আগেই আমি আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। হ্যাণ্ডব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, কোথায় গিয়ে পড়ল ফিরেও দেখলাম না। ফর্‌ফর্‌ করে শাড়ীটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপরে খাটের উপর ধপ ক'রে শুয়ে পড়লাম। সমস্ত শরীর ব্যথা-ব্যথা করছে। খুব গড়াগড়ি দিচ্ছি বিছানায়। পা-দুটো ঘষছি বিছানার ওপর।

মা অনেকক্ষণে ধ'রে আশা করে ছিল যে আমি বাইরে বেরুবো, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই দেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, শরীরটা কেমন লাগছে? আজ তো শনিবারও নয়... ছুটি নিয়ে এসেছিস? দরজাটা খোল। কফি তৈরি ক'রে দেবো?

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। আমার উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে মা বলল, 'কী হয়েছে রে মা? মুখ খুলে বললে তো জানব? এভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে থাকলে আমি কী বুঝব? ঘোল ভাত নিয়ে গিয়েছিলি, খেয়েছিস?'

আমি এরও উত্তর দিলাম না। উত্তর জোগাচ্ছে না মুখে। মুখ খুললে কী-না-কী কথা বলে ফেলি তাও তো এক ভয়। হঠাৎ ওঁর মিনিবার'টা আমার চোখে পড়ল। কেন জানি না আমার চোখদুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেদিন এসে রেখে গেছেন উনি।

ঐ কেস্‌টা তুলে খাটের ওপর রেখে খুললাম। তিনপোয়া পরিমাণ হুইস্কি সেই ভাবেই রয়েছে। দু'দিকে এক জোড়া সুন্দর গেলাস। সেই হুইস্কির বোতলটাকে হাতে তুলে দেখলাম।

মনে পড়ল, সেদিন বলেছিলাম যে এই মদ খাওয়ার উপলক্ষ যেন আমার কোনো দিনই না ঘটে। আজ, এখন সেই উপলক্ষ আসে নি কি?

বোতলটাকে খুললাম। 'এই হলুদ রঙের তরল পদার্থটি কী গন্ধ বিকীর্ণ করে? এই ভেবে একটু গন্ধ শুঁকে দেখলাম। একটা গেলাস তুলে গব্‌গব্‌ ক'রে তিনপোয়া গেলাস ভরে ফেললাম। এক হাতে বোতল, এক হাতে গেলাস। শাড়ী-বিহীন খালি পেটিকোট-পরিহিত আমার বেশটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম। আজ পর্যন্ত যে গঙ্গা জীবিত ছিল আমি তো তাকে নিজেই কতক্ষণ হল 'গুডবাই' জানিয়ে এসেছি।

ওষুধ খাওয়ার মতো এক ঢোকে শেষ।

হায়! সারা গলা, সারা বুক, সারা পেট ও নাড়ী-ভুঁড়ি যে জ্বলে যাচ্ছে...

জ্বলুক!...

শেষ কথা

কত কী ঘটনাই তো ঘটে গেল। কিন্তু গঙ্গার জীবনে আজ পর্যন্ত অসম্ভব নতুন কিছুই ঘটে নি। যখন সে এমন একটা ঘটনার কথা ভাবছিল যা এখনও তার জীবনে ঘটে নি, তখন গঙ্গা তার নিজের ওপর, তার দেহের ওপর, এই পরিবেশের ওপর, তার ওপর নির্ভরশীল আত্মীয়-স্বজনদের ওপর এমন একটা ক্রোধ ও শত্রুতা অনুভব করতে লাগল যা আজ পর্যন্ত সে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে করে নি। ক্রোধে জ্বলে যাচ্ছে তার দেহ মন, উন্মাদনার প্রকোপে তার একমাত্র চিন্তা হল 'কীভাবে এবং কী ক'রে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়!' ক্রোধে কুঞ্চিত-ভুরু ও ক্ষিপ্ত চোখ নিয়ে সে মাঝে মাঝেই দাঁত কড়মড় করে।

এখন তার মুখখানা আর সেরকম নেই, একেবারে বদলে গেছে। কেবল তার মুখই নয়, বদলে গেছে তার কথাবার্তা, তার চোখের দৃষ্টি। অফিসে কিংবা অফিসের বাইরে এমন-কি ট্যাক্সিওয়ালাদের মধ্যে সেই নিঃসঙ্গ মেয়েটির পরিচয়ের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে।

সেই যে রজবালী— যে মাঝেমাঝেই অফিসে কাজ-করা মেয়েদের ঠিকভাবে চলাফেরা করা উচিত এই কথা বোঝাতে দৃষ্টান্ত হিসাবে গঙ্গার-কথাই বলত, সেই রজবালী পর্যন্ত গঙ্গার এই চরিত্র-পরিবর্তনের জন্য অন্যের কাছে গঙ্গা সম্পর্কে অপবাদ রটাতে আরম্ভ করেছে।

মিসেস ম্যানুয়েল্ ও গঙ্গা লাঞ্চ আওয়ারে ভিন্ন ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা বলে। আজকাল এটা একটা দৈনিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। মিসেস ম্যানুয়েলের ঘরে গঙ্গা এক ঘণ্টারও বেশি সময় বসে থাকে। মিসেস ম্যানুয়েল যে সিগারেট খায় সে কথা সকলেই জানে। এখন ওর সঙ্গে মিশে মিশে গঙ্গাও যে সিগারেট খেতে আরম্ভ করেছে সে ব্যাপার রজবালীই প্রথম দেখে। এখন তো অফিসসুদ্ধ লোক সকলেই জানে। ম্যানুয়েলের ঠোঁটের মতো গঙ্গার ঠোঁটেও কালো দাগ ধরতে শুরু করেছে।

কোনো কোনো সময়ে গঙ্গার কাসিতে অফিসসুদ্ধ কেঁপে ওঠে। অনেকদিন পর্যন্ত রজবালীর যে জল-ভরা গেলাস টেবিলের ওপর সাজানো থাকলে গঙ্গা স্পর্শ ক'রেও দেখে নি, আজকাল কাসি আসতেই একদিনে দু-তিনবার ক'রে রজবালীকে ডাকবার জন্য কলিং বেল বাজাতে হয়। রজবালী সকলকে যেমন গালমন্দ করে, আজকাল গঙ্গাকেও সেইরূপ গালমন্দ করতে শুরু করেছে।

মাঝে মাঝে মিসেস ম্যানুয়েল ও গঙ্গা দুজনে মিলে সিনেমা দেখতেও যায়। ম্যানুয়েলের বাড়ীতে পর্যন্ত গঙ্গা মাঝে মাঝেই যায়। কখনো আবার ম্যানুয়েল-দম্পতী গঙ্গার বাড়ীতে এসে চমৎকার সন্ধ্যাবেলাটাকে জঘন্য রাত্রিতে রূপান্তরিত ক'রে টলতে টলতে, ঢাক পিটিয়ে মানুষকে উত্ত্যক্ত করার মতো, মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে চলে যায়।

গত সপ্তাহে একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। মিস্টার ম্যানুয়েলের জন্ম-দিবসে আয়োজিত পার্টিতে যোগ দিয়ে অনেক রাতে গঙ্গা যখন বাড়ী ফেরে, তখন ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে এমন বচসা শুরু হয়ে যায় যে পাড়া সুদ্ধ লোক জেগে ওঠে। ট্যাক্সিওয়ালা সকলের সামনে গঙ্গার বিরুদ্ধে নানা কথা বলতে থাকে, তখন গঙ্গা ট্যাক্সিওয়ালার মুখের ওপর একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে মেরে তাকে বিদায় ক'রে দেয়। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ী নিয়ে চলে যাওয়ার পরেও মিনিট দশেক ধ'রে গঙ্গা মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে ইংরেজীতে বক্‌বক্ করতে থাকে। তার বেশির ভাগই গালিগালাজ— ট্যাক্সিওয়ালাদের বিরুদ্ধে, মদ্য পান নিয়ে আইনের বিরুদ্ধে, ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত জীবনের বিরুদ্ধে এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা মজা দেখছে তাদের শিক্ষাদীক্ষাহীন আচরণের বিরুদ্ধে।

এই রাস্তায় অবশ্য এরকম চেঁচামেচি যে ঘটে না তা নয়। তবে তা ঘটে দিনের বেলায়। আর তার জন্য দায়ী হল— ঐ যে পঞ্চবটী এলাকার বস্তিগুলো থেকে মেয়েছেলেরা রুজি-রোজগারের জন্য এ পাড়ায় আসে, তারাই। তবে

তারা পাড়া মাতিয়ে তোলে তাদের তামিল ভাষায় শকার-বকারে, গঙ্গাও সেই কাজ করে ইংরেজী-ভাষায়। পাড়ার লোক যেমন বস্তিবাসী মেয়েগুলোকে ভয় করে, গঙ্গাকেও এখন তারা তেমনি ভয় করতে আরম্ভ করেছে। গঙ্গা সেদিন একথা বলতেও কসুর করে নি যে সে মাইনে পায় চায়ের ঘরে, কেউ তার কিছু করতে পারবে না কারণ মদের পারমিট তার আছে।

আসলে কিন্তু পারমিট তার ছিল না। তবে সেইদিনকার ঘটনার পরেই গঙ্গা তার নিজের মত্তপানের প্রয়োজনীয় পারমিট সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করে ফেলে। মিসেস ম্যানুয়েল এই ব্যাপারে গঙ্গাকে খুব সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই।

সকলেই গঙ্গার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে— তার মা, তার দাদা ও পরিবার-পরিজন, প্রভু, মঞ্জু সকলেই। গঙ্গা সে-সমস্ত আর ভেবেও দেখে না বোধ হয়। তবে অতীতের সেই ভুল করার স্মৃতিগুলি যখন তার মনে জেগে ওঠে, সে নিজেই নিজেকে থুথু দেয়।

এখন সে সামান্য তুচ্ছ বিষয় নিয়েও চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। দুধওয়ালা, সব্জীওয়ালা, খবরের কাগজের হকার— এক-একদিন এক-একজনের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে গঙ্গা যেন পাড়া সুদ্ধু সকলকে তার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিতে চায়। আর যখন সে চুপচাপ থাকে, তখন তার ট্রানজিসটার থেকে উচ্চ-নিনাদে সিনেমার গান উৎসব জমিয়ে তোলে। এখন সে খুব সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে বলতে হবে।

এখন মাঝে মাঝে গঙ্গাকে শাসাতে আসে তার মা। গত সপ্তাহেও এসেছিল। বরাবর মাইনে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গা তার বেয়ারা রঙ্গস্বামীর মারফৎ একশোটি টাকা পাঠিয়ে দেয়। এ মাসে কেমন ভুল হয়ে গেল তার। কিন্তু গঙ্গার মায়ের কাছে এ একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এক সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে— গঙ্গার মা মেয়ের সঙ্গে বচসার জন্য তৈরি হয়েই এসেছিল।

সেদিন আর গঙ্গা অফিসে গেল না। ছুটি নিয়ে গঙ্গাও মায়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। মাকে সে আর নাকি টাকা দিতে পারবে না। ছেলের বাড়ীতে থেকে মাসে মাসে গঙ্গার কাছে এসে টাকা চাইতে সেই পরিবারের এখন নাকি আর লজ্জাশরম নেই। টাকা দরকার হলে নত হয়ে এসে চাইতে হবে নাকি। তার ওপর জুলুম করবার অধিকার কারও নেই নাকি। 'এর পরে আর টাকার জন্য আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকো না। টাকা তোমার মুখে আপনা থেকে এসেই পড়বে'— এই বলে গঙ্গা একশো টাকার বদলে হাজার-খানা এক টাকার নোট সারা ঘরে ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিল।

গঙ্গার মা পেট-মুখ চাপড়ে কাঁদছিল। এখন সেই কান্না বন্ধ ক'রে— ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নোটগুলি ভিখিরির মতো কুড়োতে লাগল। অবশেষে কান্নাকাটি শাপশাপান্ত করতে করতে চলে গেল। যাওয়ার সময়ে, মজা দেখবার

জন্য ঐ রাস্তার আশেপাশের বাড়ীর যে-সব মেয়েরা এসে জমা হয়েছিল, তাদের সকলের সামনে গঙ্গাকে শাপ দিতে লাগল। 'লবণের হাঁড়ি ক'দিন থাকে? গঙ্গারও দুর্গতি হবে তেমনি দেখে নিও! এই রাস্তার লোক একজোট হয়ে ওকে এখান থেকে যেন মেরে পিটিয়ে দূর ক'রে দেয়। ওর বড় পয়সার দেমাক, ভগবান যেন দেখে।' গঙ্গার মা চলে যাওয়ার পরেও সেই শাপগুলি যেন এখনও চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে— এমনি ভয়ে লোক বাইরে আসতে ভয় পেল।

কিন্তু গঙ্গা সেই পথে সটান মাথা উঁচু ক'রে যাতায়াত করে। তার কাঁধে হ্যাণ্ডব্যাগ, পিঠে হাওয়ায় উড়ছে আধখানা আঁচল, টকটক্ ক'রে যখন সে রাস্তা দিয়ে চলে, সেই অঞ্চলের মানুষ প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে কাসি দিয়ে থুথু ফেলে। ওখানকার যুব-সম্প্রদায় গঙ্গার নতুন নামকরণ করেছে— 'অশ্ব-নটিনী'। কিন্তু সকলেই তাকে দেখলে এখন ভয় পায়, কারণ গঙ্গাও কারও সঙ্গে ঝগড়া-কলহে পিছপা নয়।

সারাটা দিন যে শহরময় চষে বেড়ায়, এখনও তার মর্নিং ওয়াক ও ঈভনিং ওয়াকটুকু বজায় আছে। সকালে না বেরোলেও বিকেলের বেড়ানোতে বাধা নেই। কখনও কখনও সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে অনেক রাত কাটিয়ে বাড়ী ফেরে।

স্পার্টাং রোডে অন্ধকার। দূরে একটা অতিকায় বাস চলে যাচ্ছে। রাস্তার আলো জ্বালবার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু কর্পোরেশনের মহিমায় অনেকগুলি পিলারে এখনও আলো জ্বলে নি। গাছে-ঢাকা সেই রাস্তায় জ্বালানো বাতিগুলির নীচেও জমাটবাঁধা ছায়ার অন্ধকার।

গঙ্গা হেঁটে চলেছে। তার পিছন থেকে আসা একটা গাড়ীর আলোয় বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গঙ্গাকে। সেই ছোট্ট গাড়ীটা একটা ক্রসিং থেকে ঘুরে আবার আসছে। গঙ্গা ফিরে তাকাতেই গাড়ীর লোক যেন গঙ্গার ফোটো তুলে নেবে এই ভঙ্গীতেই গঙ্গা সেই আলোয় সুদৃশ্য হয়ে উঠলো। গাড়ীর বেগ একটু কমিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে গঙ্গাকে ছাড়িয়ে যায়।

গঙ্গাকে ছাড়িয়ে কয়েক ফুট যেতেই সেই গাড়ী থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে আসা আগুনের ফুলকি, নীচে পড়ে যাওয়া সিগারেটের টুকরো গঙ্গার কাছে কী একটা খবর যেন নিয়ে আসে। সিগারেটের সেই জ্বলন্ত টুকরো হাওয়ায় গড়িয়ে গড়িয়ে তার পায়ের কাছে আসতেই সে তারই ওপর চাপ দিয়ে দাঁড়ায়। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় একবার পিছন দিকে। সেই গাড়ীটা তখন ডান দিক ঘুরে খাজা মেজর রোডে যাওয়ার মাঝখানে অবস্থিত চত্তরটাকে প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরতেই স্পার্টাং রোডে আবার গঙ্গার মুখোমুখি।

পায়ের নীচে সেই সিগারেটের টুকরো, চলমান গাড়ীর ওপর গঙ্গার নিবদ্ধ দৃষ্টি... কিছুক্ষণ মাত্র, আবার সে চলতে শুরু করে। এবারে তার সামনের দিক থেকে আলো ফেলে সেই গাড়ীখানি আবার এসে আস্তে আস্তে তার পাশ ঘেঁষে

চলে গেল। গাড়ীর আলোয় যেন তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে এমনি একটা ভান ক'রে গঙ্গা তার মুখখানি সুঁচলো ক'রে, ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসি ফোটাল। কিছুক্ষণ আগে গাড়ী থেকে ছিটকে এসে পড়া সিগারেটের মতো গঙ্গার এই হাসিটুকুও যেন একটা খবর জানিয়ে দিল।

যে গাড়ীখানি বারবার তার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল, গঙ্গা সেই গাড়ীখানিকে আর সেদিন দেখল না। কিন্তু আবার সে ফিরে আসবে। ফিরে আসবে। সেই কল্পনায়, সেই চিন্তায়, সেই উল্লাসে গঙ্গা যেন হাওয়ার ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে গেল।

গঙ্গা সম্পর্কে এখন সকলেই অনেক বলাবলি করে। গঙ্গাও এখন সকলের সঙ্গে প্রচুর কথা বলে। সম্প্রতি তার চাকরিতে একটা প্রমোশন হয়েছে। এখন তাকে বাড়ী থেকে অফিসে নিয়ে যাওয়া এবং অফিস থেকে বাড়ীতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে। কখনো সখনো সেই গাড়ীতে পুরুষ অফিসারও আসে। গঙ্গার বাড়ীতে তাদের পার্টিও বেশ জমে ওঠে।

সামনের বাড়ীর ব্যালকনি থেকে, পাশের বাড়ীর জানালা থেকে সকলেই এই পার্টির মজা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে :

গঙ্গাদের বাড়ীর ব্যালকনিতে উপবিষ্ট অতিথিদের গোটা চেহারাটা সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর না হলেও, তাদের উত্তোলিত হাত, সেই হাতে সুরার পাত্র, গঙ্গার উদ্দেশ্যে অফিসারদের উচ্চারিত 'চিয়ারস্‌' ধ্বনি পাশের বাড়ীর লোকেরা প্রায়ই শুনতে পায়।

গণেশ কখনো কখনো এসে প্রভুর সঙ্গে দেখা করে এবং গঙ্গার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলে। প্রভু সে-সমস্ত কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে বসে বসে এমনিভাবে সিগারেট টানতে থাকে যেন সে কবেকার কোন্‌ এক দুঃখজনক গল্পের বিবরণ শুনছে।

প্রভুর মন চায় না যে সে গঙ্গার সঙ্গে দেখা করবে অথবা তার সঙ্গে কথা বলবে। এখন সে সত্যই ভয় পায়— তার জীবনে গঙ্গা এসে মাথা গলাবে অথবা গঙ্গার জীবনে প্রভু।

সেই যে টেলিফোনে কথাবার্তা হল তার পরে গঙ্গা বলত— কে যেন তাকে 'রেপ্‌' করতে আসছে এরকম একটা ভয় ভয় তার মনে। ঠিক সেই রকম গঙ্গাকে দেখতে গেলে প্রভুরও ঘটবে নাকি — এই ধরনের একটা ছেলেমানুষী ভয় প্রভুকে পেয়ে বসেছে। প্রভুর আরও বিরক্তি এইজন্য তার অনুরোধ-মতো গঙ্গা তার নিজের জীবনটাকে ঠিক পথে চালায় নি।

প্রভু তার জীবনে যে-সমস্ত মেয়েকে দেখেছে ও যাদের সঙ্গে মিশেছে, গঙ্গা তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এইজন্যই গঙ্গা সম্পর্কে প্রভুর মনে একটা অপরাধ-বোধ, স্নেহ ও সহানুভূতি। গঙ্গা সঙ্গে থাকাতে তাকে মনে হত একটা মস্ত

অবলম্বন, প্রভুর জীবনের সীমাহীন একাকিত্বের সুখী। গঙ্গার শক্তি যেন প্রভুর সমস্ত দুর্বলতাকে ঢেকে রেখেছিল। গঙ্গার এই গুণগুলি ছিল তাদের দাম্পত্য জীবনের মূল আধার।

এখন তো সেই আধার নষ্ট হয়ে গেছে। এখনকার এই পরিবর্তিত গঙ্গার মতো মেয়ে প্রভু দেখেছে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে।

এখন প্রভুর যে দুঃখ তা কেবল একা গঙ্গার জন্য নয়। গঙ্গা তো স্নেহ-ভালোবাসার যোগ্য অধিকারী সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রভু যখন ভাবে আগেকার সেই অনেক মেয়েদের কথা, যাদের প্রতি সে দুর্ব্যবহার করেছে, অথচ কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখায় নি, তখন তার মনে হয় যে তারাও বোধহয় গঙ্গারই মতো সুব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত ছিল। এই-সব ভাবতে ভাবতে প্রভুর মন বেদনায় অনুতাপে ভরে ওঠে।

গঙ্গাও অন্য সব মেয়েদের মতো হয়ে যাওয়ার পরে প্রভুর এই পরিবর্তন ঘটেছে। যে স্নেহমর্যাদা সে গঙ্গার প্রতি দেখিয়েছে, অন্য কোনো রমণীর প্রতি দেখালে সেও এই গঙ্গার সামনে অবস্থিত সেই পবিত্র অবস্থায় পরিবর্তিত হয় কি না এই কথাই মাঝে মাঝে মনে হয় তার।

প্রভুর জীবন এখন খুবই বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। সে মাঝে মাঝে মঞ্জুর কথা ভেবে চমকে ওঠে। সকলের ওপর যে সবল বিশ্বাস ছিল তার, প্রভু সেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। প্রভু গঙ্গাকে বলেছিল বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি জানাতে। সে তো জানায় নি। তবে কি গঙ্গাও প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল? এর পরে স্ত্রী পদ্মা প্রভুর কাছে যেন দেবীমূর্তি হয়ে দেখা দিল। পদ্মা যে মঞ্জুকে এবং ছেলে দুটোকে ঠিকমতো লালনপালন রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে, সেজন্য প্রভু প্রায়ই কৃতজ্ঞচিত্তে পদ্মার কথা ভাবে। আর প্রভু নিজেও যাতে ছেলেমেয়েদের মতো রক্ষা পেয়ে যায় সেইভাবে পদ্মার কাছে খুব জোরের সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

বাইরের কাজকর্ম না থাকলে প্রভু এসে শান্ত সংযত হয়ে পদ্মার কাছে বসে। পদ্মা খুব খুশী হয় তাতে। প্রভুর আগের মতো আর সাজ পোশাকেরও কোনো ঘটা নেই।

পদ্মার প্রত্যাশা-মতো প্রভু অফিসে যায়, অফিস থেকে বাড়ী ফেরে। বাড়ীতেই বসে একা একা মদ খায়। নতুন করে ছাঁটা প্রভুর দাড়ি এখন অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে। কালো কালো দাড়ির মধ্যে মাঝে মাঝে পাকা পাকা দাড়ি প্রভুর পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে।

প্রভু যখন অল্প বয়সে বখাটে হয়ে যায় তখন তার বাবা মৃত্যুকালে অনেক চোখের জল ফেলে গেছেন। প্রভু এখন মাঝে মাঝে স্মরণ করে বাবার সেই মূর্তি। ঠিক সেইমতোই প্রভু যখন আজ দেখছে তার সন্তানেরা বড় হচ্ছে তখন কি সে না কেঁদে পারে? প্রভু নিজেকে কঠিন করবার চেষ্টা করল।

প্রভু নিজেকে কঠিন করবার চেষ্টা করল।

কিন্তু প্রভু বিশ্বাস করে সকলেই নষ্ট হয়ে যাবে। তার সামনেই জলন্ত উদাহরণ গঙ্গার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রভু।

ব্যালকনির ওপর মঙ্গলদীপ জলছে। মন্টু তার ঘরে বসে পড়াশুনো করছে। চাকরবাকরের দল প্রভুর মদ্যপানের সময়ে আহার্য বস্তুসামগ্রী নিয়ে এসে ব্যালকনিতে রেখে দেয়। প্রভুর পাশে একটা চেয়ারে বসে তার আদর-আপ্যায়ন করতে থাকে পদ্মা। আর তারই কাছে ট্রানজিস্টার থেকে অস্বচ্ছ ধ্বনিতে শোনা যাচ্ছে হিন্দী সিনেমার গান।

পদ্মা বলল, "আজ দুপুর বেলায় থিয়েটার হলে গঙ্গাকে দেখলাম। চেহারাটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। আমাকে যেন ঠিক চিনতে পারল না বলে মনে হয়। গঙ্গার সঙ্গে এক অ্যাংলো মেমসাহেব। আজকাল কি গঙ্গার সঙ্গে দেখা হয় আপনার? দেখে আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। 'ঠিক আছে, ও যখন আমাকে চিনতে পারল না, আমিই বা ওকে চিনব কেন।' এই ভেবে চলে এলাম।" পদ্মা এইভাবে দুর্গতির বর্ণনা শুরু ক'রে দিলে প্রভু একদৃষ্টে পদ্মার দিকে তাকিয়ে রইল। কে জানে প্রভুর মনে কেমন ক্রোধ এসে গেল। বলল, "কোন্ মেয়ে কী রকম কী হয়ে গেল তাতে আমার কী? ডোন্ট স্পয়েল মাই ইভনিং। আমার এই সন্ধ্যাবেলাটা নষ্ট কোরো না বলে দিচ্ছি।" এইভাবে প্রভুকে হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচাতে দেখে পদ্মা ভয় পেয়ে গেল। স্বামীকে শান্ত করবার জন্য পদ্মা প্রভুর গেলাসে হুইস্কি ঢেলে দিল।

আজকাল পদ্মারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে

Printed at Modern Printes, K-30, Naveen Shahdara Delhi-110032

একটি মধ্যবিত্ত ধর্মভীরু পরিবারের মেয়ে গঙ্গা। এক সন্ধ্যায় এক পুরুষের হাতে গঙ্গা ধর্ষিতা হল। অজ্ঞতাবশে গঙ্গার মা সমাজের আর সবার সামনেই গঙ্গার নিন্দা করলেন, তাকে অপমানিত করলেন। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তার ভবিষ্যৎ। এমন জীবন নিয়েই কাটতে লাগল গঙ্গার বছরের পর বছর। কিন্তু হঠাৎই সে খোঁজ পেল সেই পুরুষটির। সে তখন বিবাহিত, তার ঘরে আদুরে মেয়ে আর প্রেমহীন স্ত্রী। গঙ্গা তাকে ভালোবেসে ফেলে, তা প্রকাশও করে। কিন্তু···নারী-পুরুষের এমনই কখনো মূল্যবান কখনো মূল্যহীন এক সম্পর্ক নিয়ে বিশিষ্ট তামিল কথাকার জয়কান্তনের এই উপন্যাস 'কখনো কোনো মানুষ।' জয়কান্তন রাজনৈতিক ভাষ্যকার, চিত্র-পরিচালক এবং সুবক্তা। তাঁর লেখনীতে তাঁর মেধার সবক'টা দিকই এক আশ্চর্য সমন্বয়ে উপস্থাপিত। এ উপন্যাস তাই এত জনপ্রিয়।



22.00 টাকা

ন্যাশনাল বুক